বঙ্কিম-উপন্যাসের উপাদান বিচার

॥ অশোককুমার কুণ্ডু ॥



॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীঅশোককুমার কুণ্ডু
গ্রাম—বোড়হল
পোঃ—জাঙ্গিপাড়া
জেলা—হুগলী

প্রথম প্রকাশ—
১লা বৈশাখ ১৩৬৬

মূল্য—কুড়ি টাকা মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী স্বপ্না কুণ্ডু, এম. এ., বি. এড্. কে

সূচীপত্র

॥ এক ॥

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য বাঙ্গালীকে প্রায় একশো বছর ধরে যে আনন্দ উপভোগের সুযোগ দিয়েছে তা আজও জীর্ণ হয়নি একটুও। মহৎসাহিত্যের যা লক্ষণ,—নতুন কালের কাছে নতুনতর অর্থসঞ্চারের ক্ষমতা—তা বঙ্কিম-সাহিত্যকে চিহ্নিত করেছে। পাঠক হিসাবে আর দশজন বাঙালীর মত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যপাঠের আনন্দের আমিও অধিকারী।

কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত সাহিত্যরসসম্ভোগই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে পাবার একমাত্র পথ নয়। জীবনের কোন্ উপকরণ, পূর্ববর্তী সাহিত্যের কোন্ উপাদান, পারি-পার্শ্বিকের কোন্ অভিজ্ঞতা লেখকের মনের মাটি গড়েছে সে খবর জানাও সাহিত্যসম্ভোগের সীমানাবহির্ভূত নয়। কোন্ শক্তির রসায়নে নানা বিচিত্র বস্তু এক অভূতপূর্ব শিল্প বস্তুতে পরিণত হয় তা বোধহয় চিরদিনই মানুষের জ্ঞানেব অগোচর থেকে যাবে। কিন্তু সেই উপাদানগুলি কি তা জানলেও কবির মন, কবির পছন্দ, কবির প্রবণতার একটা ছবি পাওয়া যাবে।

বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক—তাঁর উপন্যাসগুলির কাহিনী নানা সূত্র থেকে গৃহীত। সেই সূত্রগুলির বিচার করলে দেখা যাবে তাঁর শিল্পীসত্তা বাস্তবের কতটা গ্রহণ কবেছে, কতটা বর্জন কবেছে, 'সত্যরক্ষাপূর্বক' কতটা বাড়িয়ে তুলেছে। অর্থাৎ সাহিত্যসত্যকে জানবার জন্যেই প্রাকৃতসত্যকে জানতে হবে। সেই বঙ্কিমপ্রতিভার ভিত্তিভূমিতে প্রাকৃতসত্যের স্থানটুকু আবিষ্কার করার জন্যই এই প্রচেষ্টা।

শিশু যেমন মাতৃস্তন্যপানে পালিত হয়, তাব দেহের পুষ্টি জন্মায়, তেমনি তার মনের পুষ্টি হয় শিক্ষায়। সেই শিক্ষা দ্বিবিধ উপায়ে লাভ করা যায়—(ক) পাঠ্যগ্রন্থের মাধ্যমে (খ) দেশ ও কাল থেকে আহৃত সচেতন প্রবর্তনায়। বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও এই দু'টি দিকের পর্যালোচনা করা দরকার।

বঙ্কিম-মানস গঠনে যে উপাদানগুলি ছিল সেগুলির সঠিক তথ্য জানা গেলে বোঝা সহজ হবে শিল্পী বঙ্কিম তাদের উপর কি কারিগরী করেছেন—কল্পনার কোন পরশমণি দিয়ে তাদের রূপ সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত—এই তিন সাহিত্যের প্রবাহ থেকে বঙ্কিম প্রাণরসধারা আহরণ করেছিলেন। তাঁর গভীর অধ্যয়নের চিহ্ন উপন্যাসগুলির ও প্রবন্ধাবলীর সর্বাঙ্গে

ছড়িয়ে আছে। প্রাচীন সাহিত্য বঙ্কিমমানসে কোন্ আবর্তের সৃষ্টি করলো তার হিসাব রাখা এই লেখকের অন্যতম প্রচেষ্টা।

তাছাড়া এতো অতিপরিচিত কথা যে নিজের দেশকালকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বোধ আর বুদ্ধি দিয়ে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছিলেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক—বহু সমকালীন চিন্তাকে কখনো অঙ্গীকার করেছেন, কখনো তিরস্কার করেছেন। দেশ তাঁকে শ্রেষ্ঠ মনীষী ব'লে স্বীকার করেছে। সেই সমাজ ও দেশ সচেতন বঙ্কিমকে গুরুর আসনে বসিয়েছে। জাতির হৃদয়ের বিচিত্র স্পন্দন তাঁরই রচনায় কম্পন জাগিয়েছে। সেগুলিও আমার আলোচনার গণ্ডীবহির্ভূত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের প্রতি যে আনুগত্য দেখিয়েছেন, তা নিতান্ত অমূলক নয়। ইতিহাসের কাহিনীগুলিকে তিনি নির্বিচারে গ্রহণ বা পরিবেশন করেন নি। এগুলির মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশেষ মানসিকতা কার্যকর হয়েছে, তা' দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য অনেক লেখকের তুলনায় অনেক বেশি আত্মসচেতন ছিলেন। নিজের রচনাকে সুন্দর করে তোলবার জন্য তাঁর নিরন্তর প্রয়াস ছিল। সংস্করণ থেকে অন্য সংস্করণে যাবার পথে শুধু শিল্পকর্মজনিত পরিবর্তনই ঘটতো না, বিষয়বস্তুর বিন্যাসে, ভাববিবর্তনে, চরিত্ররচনায়ও পরিবর্তন ঘটতো। সেই নবরূপরচনার প্রয়াসে আহৃত উপকরণের ভূমিকা কি ছিল এ রচনায় তা আলোচনা করেছি।

কিন্তু শুধু তথ্য নিয়ে তো শিল্পীর বিচার হয় না, ফলে স্থানে স্থানে বঙ্কিমের শিল্পরীতি সম্বন্ধেও মন্তব্য আছে। শিল্পরীতি যে নিছক কাকতালীয় ব্যাপার নয়, তার মধ্য দিয়েও যে লেখকের বিশেষ মানসিকতাটি প্রতিফলিত হয় তাও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি।

বর্তমানে কেবলমাত্র উপন্যাসগুলির ভিত্তিতেই বঙ্কিম-মানসের স্বরূপনির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্য থেকেও এর সমর্থনে উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাছাড়া 'Rajmohan's wife' 'কমলাকান্ত' ও 'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত' এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আকর। কিন্তু আমি সেগুলিকে বর্তমান গ্রন্থের আলোচনার সীমানার বাইরে রেখেছি।

॥ দুই ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন ও উপন্যাসে তার প্রভাব

বঙ্কিমচন্দ্রই বোধ হয় বাংলাসাহিত্যের আধুনিককালের একমাত্র শিল্পী যিনি সাম্প্রতিককালের হয়েও অনেক দূরবর্তী কালসম্ভব গবেষণার বিষয়। কালের হিসাবে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন (১৩ই আষাঢ় ১২৪৫ সাল এমন কিছু দূরবর্তী নয়। কিন্তু তবুও আজ বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদের পদে পদে বাধা পেতে হয়।

এর কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের জীবন সম্বন্ধে আশ্চর্য নীরবতা। তিনি আত্মজীবনীও রচনা করেননি, বা সমসাময়িক মানুষের কাছে এমন সহজভাবে মেশেননি যাতে সমকালে বা পরবর্তীকালে কেউ তাঁর ব্যক্তিজীবনের স্মৃতিচারণ করবেন এবং তা থেকে আমরা তাঁর জীবনীরচনার উপাদান সংগ্রহ করতে পারব। এদিক থেকে তিনি বিচারকের স্বভাব-গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাই যথার্থভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়ণ করেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য তাহার চাপা অধরোষ্ঠে, যে অধরোষ্ঠের উপরে ডিমোক্লিসের খড়্গের মত নাকটা ঝুলিতেছে। ওই চাপা ওষ্ঠ ভেদ করিয়া নিজের একটি কথাও তিনি বলেন নাই— বহু লোকের কথা বলিয়াছেন, কেবল নিজের ছাড়া।" (মাইকেল মধুসূদন)

ঔপন্যাসিক জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা জীবনধর্মী শিল্প রূপেই এমনটি ঘটা সম্ভব। জীবনধর্মী উপন্যাস বলতে সাধারণত: সামাজিক উপন্যাসকেই বোঝান হয়ে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য সামাজিক উপন্যাস অপেক্ষা ঐতিহাসিক রোমান্সের জগতেই স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসেও আত্ম-প্রক্ষেপের সুযোগ কম। তবুও কখন্ কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে ব্যক্তিজীবনের প্রকাশ ঘটে গেছে, সেটি আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

হাতের কাছে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকেই আপাতত: বঙ্কিমের ব্যক্তিজীবনের একটি খসড়া নির্মাণ করতে হবে।

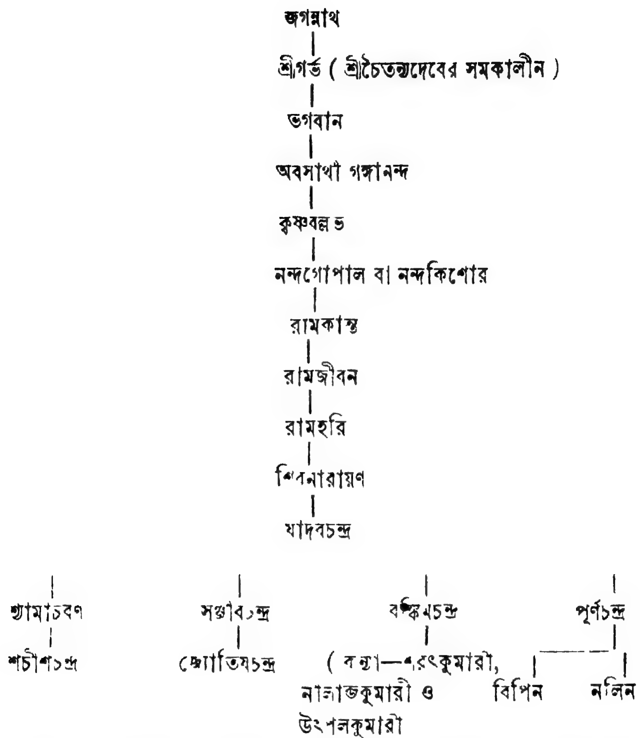
১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন (১৩ই আষাঢ় ১২৪৫ সাল) রাত্রি নটার সময়

কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাতা দুর্গাদেবীর তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান।

ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে বংশ পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। "অবসাথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় একশ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন।"

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্কিমজীবনী"তে যে বিস্তারিত বংশপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উর্দ্ধতন বেশ কয়েকপুরুষ ও পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের তালিকা পাওয়া যায়। সেটি উদ্ধৃত করা হল—

দক্ষ
|
সুলোচন
|
বাসুদেব
|
নায়ি
|
নরো (মতান্তরে কৃষ্ণদেব)
|
বরাহ
|
শ্রীকর অধ্বর্য্যু (মতান্তরে শ্রীধর)
|
বহুরূপ
|
গাহী
|
অবসথী সর্বেশ্বর
|
তেকড়ি
|
সিদ্ধেশ্বর
|
লক্ষ্মীধর
|
দিগম্বর
|



বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা "যাদবচন্দ্র ১১৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হইয়াছিলেন।

যাদবচন্দ্র চতুর্দশ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে বাজপুরে গমন করেন। সেখানে তাঁহার অগ্রজ সহোদর কাশীনাথ, দারোগাগিরি করিতেন। পুলিশের দারোগা নহে, নিমকির দারোগা। যাদবচন্দ্র সেখানে ভাইয়ের কাছে থাকিয়া আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।"

যাদবচন্দ্রও প্রথমে নিমকির দারোগা ছিলেন। শচীশচন্দ্রের মতে, তারপর —"তিনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই নভেম্বর তারিখে রিকেটস্ সাহেবের অনুগ্রহে ডেপুটি কালেক্টরের পদ পাইয়াছিলেন।" কিন্তু 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' অনুসারে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যাদবচন্দ্র ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত হন। "১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে (১৩ই মাঘ ১২৮৭) ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।"

"বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা তপ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ—দীর্ঘকায়—তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন—মহিমা-মণ্ডিত—তেজঃপুঞ্জ পুরুষ ছিলেন।" বঙ্কিমচন্দ্র পিতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে পিতার প্রতি তাঁর আস্থা শিথিল হলেও বঙ্কিমচন্দ্র কোনদিন পিতার অসম্মান করেননি।

"বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা সাতিশয় স্থূলাঙ্গী ও কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। কিন্তু এমন করুণাময়ী শান্ত মূর্তি জগতে অল্পই দৃষ্ট হয়।" (বঙ্কিমজীবনী)

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ছিলেন, তখন তাঁর মাতা পরলোকগমন করেন। মাতাকে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট ভক্তি করতেন।

পাঁচ বছর বয়সে, কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। তারপর তিনি গ্রামেরই পাঠশালার রামপ্রাণ সরকার নামক জনৈক গুরুমশায়ের কাছে আট-দশ মাস পড়াশোনা করেন। শচীশচন্দ্র এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—"গুরুমহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য; যাদবচন্দ্রের অনুগ্রহের উপর তাঁহার জীবিকা কতকটা নির্ভর করিত। পাঠশালা-গৃহ যাদবচন্দ্রের সম্পত্তি। পাঠশালার ইতরজাতীয় বালকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে গৃহীত হইলেন।"

এঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এমন মনে হয় না, তাই সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের (রামপ্রাণ সরকার) শুভাগমন; কেননা আমাকে ক, খ শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ্ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট-দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম।"

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন ছয় বছর, তখন তিনি তাঁর পিতার কর্মস্থান মেদিনীপুরে যান এবং সেখানে এক ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন এবং পড়াশোনায় অত্যন্ত দক্ষতা দেখান। মেদিনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্র পাঁচ বছর পড়াশোনা করেন। সেখান থেকে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করার পর ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এক পঞ্চমবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যার সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়। বঙ্কিমের বয়স তখন এগার বছর।

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষার জন্য কমলাপতি ঘোষাল নামে এক ভদ্রলোকের সাহায্য পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীকালীনাথ দত্তের স্মৃতিচারণ "বঙ্কিমচন্দ্র"-এ আছে—"বাইসহটার ও হাটপাড়ার দুর্ভিক্ষ ও

তাহাতে অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের অনুসন্ধানান্তে বঙ্কিমবাবু সেদিন মধ্যাহ্নে এখানকার রেজিষ্ট্রার রায় কমলাপতি ঘোষালবাহাদুরের বাসায় স্নান আহারাদি করেন। আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ করি। ঘোষাল মহাশয়ের নিবাস—বঙ্কিমবাবুর স্বগ্রামে—কাঁঠালপাড়ায়। উভয়ের মধ্যে কুটুম্ব সম্বন্ধ আছে। উভয়ের কথাবার্তার মধ্যে জানিতে পারিলাম, বঙ্কিমবাবু বাল্যকালে কমলাপতিবাবুর নিকট ইংরাজী পড়িতেন।"

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাব কিরূপ ছিল, সে সম্পর্কে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে খেলার মধ্যে কেবল তাস খেলিতেন···। বালকদিগের দৌড়াদৌড়ি এবং অন্যান্য খেলা শরীরের পুষ্টিসাধন করে—তাহা খেলিতেন না। খেলিতে ভাল লাগিত না, সেইজন্য দুর্বল ও ক্ষীণদেহ ছিলেন। ····বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাল্যকালে দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতেছিল, উহার প্রভাবে অন্যান্য বালকেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত, সকলে তাঁহার নিকট ঘেঁসিতে পারিত না। তিনি কাহাকেও ভাল বলিলে তাহার আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধিত হইত।"

সাড়ে এগার বছর বয়সে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে ভর্তি হন। তখন কলেজের স্কুল বিভাগ ছিল। স্কুলের দুটি ভাগ—সিনিয়র ডিভিশনে তিনটি শ্রেণী এবং জুনিয়র ডিভিশনে চারটি শ্রেণী। বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র ডিভিশনের প্রথম শ্রেণীর 'এ' সেকশনে ভর্তি হন। মাসিক দু'টাকা বেতন দিয়ে পড়তেন। প্রথম বছরেই বঙ্কিমচন্দ্র বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাবার জন্য পুরস্কার পান। তখন জুনিয়র বিভাগের ফাইন্যাল পরীক্ষা জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা নামে প্রচলিত ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ পরীক্ষা দেন এবং হুগলী কলেজ ও তার অধীনে ৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ষোল বছরেরও কম।

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র মাসিক ৮ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দেন এবং দু'বছর মাসিক ২০ টাকা হিসাবে বৃত্তি লাভ করেন। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন, হুগলী কলেজ থেকে ট্রান্সফারের দরখাস্ত করেন ও ১২ই জুলাই এই কলেজ ত্যাগ করেন।

হুগলী কলেজে থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চা প্রকাশ্যে স্বীকৃতিলাভ

করে। "সংবাদপ্রভাকরে" কবিতা রচনা ক'রে তিনি কুড়ি টাকা পুরস্কার লাভ করেন। দীনবন্ধু মিত্র এবং দ্বারকানাথ অধিকারী নামে অন্য কলেজের দু'জন ছাত্রের সংগে কবিতাযুদ্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হন। এই যুদ্ধ সংবাদপ্রভাকরে "কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ" নামে খ্যাত।

হুগলী কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ক'লকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হলেন। কাঁটালপাড়া থেকে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য ক'লকাতায় বাড়ীভাড়া করলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্তন হল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনবিভাগ থেকে এই পরীক্ষা দিলেন। সেবার ২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দেন। তার মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১৫ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

পরবৎসর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বি.এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হল। সেবার ১০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু কেউ সববিষয়ে পাশ করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু নামে অন্য একজন পরীক্ষার্থী ৫টি বিষয়ে কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু Mental and Moral Sciences'-এ অনধিক সাত নম্বর কম পেয়ে ফেল করেন। এই বিষয়ের পরীক্ষক ছিলেন The Revd. A. Duff, D. D। কিন্তু সিনেটের অধিবেশনে এঁদের সাত নম্বর অতিরিক্ত দিয়ে পাশ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

বি.এ. পরীক্ষার পরও ৭ই আগস্ট পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়েছিলেন। তারপর চাকুরীলাভ করে তিনি অন্যত্র গমন করেন। কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বি এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট তারিখে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘ চাকুরীজীবনে যে বিভিন্নস্থানে নিযুক্ত হয়েছিলেন তার তালিকা "সাহিত্যসাধক চরিতমালা" থেকে উদ্ধৃত করা হল।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
যশোহর	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৫৮, ৭ আগস্ট
নেগুঁয়া	ঐ	১৮৬০, ২১ জানুয়ারি

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
(মেদিনীপুর)	ঐ (৫ম শ্রেণী)	১৮৬০, ৭ নভেম্বর
খুলনা	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৬০, ৯ নভেম্বর
ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ হইতে ১৫ দিন।		
	ঐ	১৮৬১, ৫ অক্টোবর
	ঐ (৪র্থ শ্রেণী)	১৮৬৩, ১৩ জানুয়ারি
বারুইপুর (২৪ পরগণা)	ঐ	১৮৬৪, ৫ মার্চ
	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৬৪, ২৪ অক্টোবর
	ডায়মণ্ডহারবার	
	ঐ (৩য় শ্রেণী)	১৮৬৬, ৫ মার্চ
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ২২শে জুন ১৮৬৬ হইতে ১ মাস ১৬ দিন		
	ঐ	১৮৬৬, ৭ আগস্ট
গভর্ণমেণ্ট আমলাদের বেতন-নির্ধারণ জন্য কমিশনের কাজ		১৮৬৭, ৩১ মে
	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৬৭, ১৪ আগস্ট
	আলিপুর, ২৪ পরগণা	
ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ১ জুন ১৮৬৯ হইতে ৬ মাস		
	ঐ	১৮৬৯, ৫ ডিসেম্বর
মুর্শিদাবাদ	ঐ	১৮৬৯, ১৫ ডিসেম্বর
	ঐ (২য় শ্রেণী)	১৮৭০, ২৫ নভেম্বর
বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট (অস্থায়ী)		১৮৭১, ২৫ এপ্রিল
	ঐ	১৮৭১, ২৮ মে
মুর্শিদাবাদে কলেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্তি		১৮৭১, ১০ জুন
ছুটি : বিনা-মঞ্জুরিতে দুই দিন—১৭ ও ১৮ এপ্রিল ১৮৭৩		
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪ হইতে ৩ মাস		
বারাসত (২৪ পরগণা)	ঐ	১৮৭৪, ৪ মে
মালদহে রোড-সেস কার্য্যে (অস্থায়ী)		১৮৭৪, ২৫ অক্টোবর
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ২৪ জুন ১৮৭৫ হইতে ৮ মাস ২৬ দিন		
হুগলী	ঐ	১৮৭৬, ২০ মার্চ

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ হইতে ১১ দিন		
হুগলী	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৭৯, ২৮ ফেব্রুয়ারি
	ঐ এবং বর্ধমান-ডিবিসন কমিশনারের অস্থায়ী পর্সান্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট	১৮৮০, ৬ নবেম্বর
হাবড়া	ঐ	১৮৮১, ১৪ ফেব্রুয়ারি
কলিকাতা	বেঙ্গল গভর্মেণ্টের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী (অস্থায়ী) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৮১, ৪ সেপ্টেম্বর
আলিপুর (২৪ পরগণা)	২য় শ্রেণী (অস্থায়ী)	১৮৮২, ২৬ জানুয়ারি
বারাসত	ঐ („)	১৮৮২, ৪ মে
আলিপুর (২৪ পরগণা)	ঐ („)	১৮৮২, ১৭ মে
জাজপুর (কটক)	ঐ („)	১৮৮২, ৮ আগস্ট
হাবড়া	ঐ	১৮৮৩, ১৪ ফেব্রুয়ারি
ছুটি : প্রিভিলেজ লীভ ২০ নবেম্বর ১৮৮৩ হইতে ১৩ দিন		
	ঐ (১ম শ্রেণী)	১৮৮৪, ১ নবেম্বর
ঝিনাদহ (যশোহর)	ঐ	১৮৮৫, ১ জুলাই
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ হইতে ৩ মাস		
ভদ্রক (কটক)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮৬, ১৭ মে
হাবড়া	ঐ	১৮৮৬, ১০ জুলাই
ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ হইতে ৬ মাস		
মেদিনীপুর	ঐ	১৮৮৭, ১৯ মে
ছুটি : বিনা-বেতনে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ হইতে ৩ মাস ২০ দিন		
আলিপুর (২৪ পরগণা)	ঐ	১৮৮৮, ১৬ এপ্রিল
ছুটি : প্রিভিলেজ লীভ ৩১ মার্চ ১৮৯০ হইতে ১ মাস ১৭ দিন		

অবসরগ্রহণ—:৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সুদীর্ঘ ৩৩ বছরের কর্মজীবন যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি ফলপ্রসূ। এই চাকুরী-জীবনই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার কাল। কর্মময় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা চিন্তার বিষয়। চাকুরী উপলক্ষে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছেন। নিঃসঙ্কোচে তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। কোন কোন উদারচেতা উচ্চপদস্থ ইংরাজের কাছ থেকে তিনি যেমন প্রশংসা অর্জন করেছেন, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধিতাও পেয়েছেন। মোটের উপর বঙ্কিমচন্দ্র ওপর ওয়ালাদের খুব খুশী করতে পারেননি। তাই যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কোনদিন ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারলেন না।

প্রথম কর্মোপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যশোহরে গেলেন। সেখানে থাকাকালীন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় দুঃখিত হন। পুনরায় তাঁর বিবাহ করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পিতা-মাতার অনুরোধে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরী-বাড়ীর কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্ত্রী তাঁর মৃত্যুর পরও বেঁচেছিলেন। এঁর গর্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি কন্যাসন্তান জন্মে। তাঁদের নাম শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী ও উৎপলকুমারী। এর মধ্যে শরৎকুমারীই দীর্ঘজীবি। এঁর সংগে রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিম-পরিবারে সাংসারিক নানা গোলযোগের সূত্রপাত হয়। এই গোলযোগের বিস্তৃত ইতিহাস জানা যায় নি। এই সময় যাদবচন্দ্র উইল ক'রে কাঁটালপাড়ার বাড়ী মধ্যমপুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে দেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে (বৈশাখ ১২৭৯) ক'লকাতার ভবানীপুর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকা শুধু বাংলা-সাহিত্য জগতেই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনাতেও এক যুগান্তর আনয়ন করে।

চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর বঙ্কিমচন্দ্র ক'লকাতার বাড়ীতে অবস্থান করেন।

"১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার বহুমূত্র রোগ অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায়। তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন; ২৩ দিন সংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৫ই এপ্রিল হইতে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। পরে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাক্‌রোধ হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল (২৬

চৈত্র ১৩০০) বেলা তিনটা ২৫ মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) কৃষ্ণবাবু মুখাগ্নি করেন।" (সাহিত্যসাধক চরিতমালা)।

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্বল ছিলেন। যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র দৃপ্ততেজসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। মাথায় চেরা সিঁথি, সুপুষ্ট গোঁফ, চাপা ঠোঁট এবং উদ্যত নাসিকায় দৃঢ়তার ভাব। প্রৌঢ়ের বঙ্কিমচন্দ্র ঋষিতুল্য। তখন তাঁর গোঁফ ছিল না। ফলে সমগ্র মুখমণ্ডলটি সৌম্যতার নিদর্শনরূপে বিরাজ করত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা-বর্ণনায় বঙ্কিমের বিশিষ্ট মূর্তির কথা বলেছেন—"আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন।"

"বঙ্কিমবাবু 'সৌখীন' ছিলেন। তাঁহার আশেপাশে সবই বেশ পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, সাজানো দেখিতাম। আগোছালো, বিশৃঙ্খল কিছু চোখে পড়িত না। বঙ্কিমবাবুর পরিচ্ছদে বিলাসিতা বা বাবুগিরি ছিল না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য ছিল। বাড়িতেও বঙ্কিমবাবুর পিরানের বুকের বোতামের দু' একটা খোলা দেখি নাই। শেষ বয়সে বঙ্কিমবাবু দাড়ী গোঁফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন, প্রত্যহ কামাইতেন। পরামাণিকের অনুপস্থিতির পরিচয় বঙ্কিমবাবুর মুখে কখনও দেখিয়াছি, এমন ত মনে হয় না। সোনার চশমাখানি ঝক্ ঝক চক্ চক্ করিত। খাপখানিও সেইরূপ। ঘরের আসবাব সুবিন্যস্ত পরিচ্ছন্ন। টেবিলে দোয়াত, কলম, কাগজপত্র, কেতাব প্রভৃতি যথাস্থানে সুরক্ষিত, কোথাও এক বিন্দু ধূলি নাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়া কলমটি মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। গুড়গুড়িটি মাজা, নলটি ধোয়া মোছা, মুরলী বড় কলিকায় 'তাওয়া' দিয়া উৎকৃষ্ট সুরভি মিঠে তামাক সাজিয়া দিত। বঙ্কিমবাবু বেশ থিতাইয়া জিরাইয়া, ধীরে ধীরে তামাক টানিবার আয়াস ভোগ করিতেন। বাড়ীতে ঢুকিলে ঘরের চারিদিকে চাহিলে মনে হইত, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নাই।"

সাহিত্যেও বঙ্কিমবাবুর 'সৌখীনতা'র পরিচয় পাই। বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যের কবি ছিলেন। তাঁহার কল্পনায় সৌন্দর্য, রচনায় সৌন্দর্য, বাক্য-বিন্যাসে সৌন্দর্য, শব্দ চয়নে সৌন্দর্য। তাঁহার আদর্শও সৌন্দর্য। তাঁহার অনেক ক্ষুদ্রসৃষ্টির 'রচনারীতি' খুব সৌখীন। (বঙ্কিমচন্দ্রঃ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি)।

"লেখক বঙ্কিমকে অনেকেই জানেন, কিন্তু মানুষ বঙ্কিমটি সকলের পরিচিত নহেন। তাঁহার হৃদয়ের চারু শোভা সকলের বিদিত নহে। মাতাপিতার

প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও ন্যায়ানুরাগ তাঁহার হৃদয়ের উজ্জ্বল অলঙ্কাররূপ ছিল। তোষামোদ ও অযথা স্তুতিবাদে রাজপুরুষগণের মনোরঞ্জনে তিনি চিরকাল সমভাবে ঘৃণা ও অনাস্থা প্রকাশ করিতেন, এজন্য তিনি দুই একবার দুই একজন উদ্ধত-স্বভাব দাম্ভিক রাজকর্মচারীর একান্ত অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহার স্বাধীনতা ও সাহিত্যানুরাগ খর্ব হয় নাই। ন্যায়-বিচার ও কার্য বিচক্ষণতা প্রভাবে তিনি কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, সকলেরই সমানভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হইয়াছিলেন।

তিনি চিরদিন নির্ভয়ে ও অসঙ্কোচে উদার মত প্রকাশে আনন্দ অনুভব করিতেন।· বন্ধুর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ও গভীর ভালবাসা ছিল। ...অপরিচিত লোকের প্রতিও তিনি কখনও বিনয়, নম্রতা ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই। সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন ও গুণীর প্রতি সমাদর ও সম্মান প্রকাশ তাঁহার চরিত্রের আর একটি প্রধান গুণ ছিল।" (বঙ্কিমচন্দ্র : বিজয়লাল দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্র যে রাগী ছিলেন এবং নিয়মের কোন ত্রুটি হলেই রাগে অধীর হয়ে উঠতেন, তার পরিচয় শচীশচন্দ্র "বঙ্কিম-জীবনী"তে দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের এই যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হল, তা থেকে মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাবে না। তবুও এর মধ্য থেকেই আমরা বঙ্কিম-উপন্যাসে লেখকের ব্যক্তিজীবনের প্রক্ষেপ কতখানি ঘটেছে তা নির্ণয় করার চেষ্টা করব।

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসই তাঁর চাকুরী জীবনে রচিত। তাই প্রথমেই আমরা দেখে নিতে চাই কোন্ উপন্যাসটি তিনি কোন স্থানে থাকাকালীন রচনা করেছেন। নীচে এইভাবে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল।

গ্রন্থের নাম	রচনাকালীন স্থান ও কাল	সাময়িকপত্রে প্রকাশকাল ও নাম	গ্রন্থাকারে প্রকাশ কাল
১। দুর্গেশনন্দিনী	খুলনা ও বারুইপুর ১৮৬২-১৮৬৪ খ্রীঃ	×	১৮৬৫ খ্রীঃ
২। কপালকুণ্ডলা	পরিকল্পনা—নেগুয়া ১৮৬০ খ্রীঃ, রচনা —বারুইপুর	×	১৮৬৬ খ্রীঃ

গ্রন্থের নাম	রচনাকালীন স্থান ও কাল	সাময়িকপত্রে প্রকাশকাল ও নাম	গ্রন্থাকারে প্রকাশ কাল
৩। মৃণালিনী	বারুইপুর ও আলিপুর ১৮৬৭ আগস্ট —১৮৬৮ জুন	×	১৮৬৯, ১০ই নভে.
৪। বিষবৃক্ষ	মুর্শিদাবাদ	বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ সালের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন	১৮৭৩, ১লা জুন
৫। ইন্দিরা	ঐ	১২৭৯ সালের চৈত্রের 'বঙ্গদর্শন'	১৮৭৩, ২৫শে আগস্ট
৬। যুগলাঙ্গুরীয়	ঐ	১২৮০ বৈশাখ 'বঙ্গদর্শন'	১৮৭৩, ২৫শে আগস্ট
৭। চন্দ্রশেখর	১৮৭৩ খ্রীঃ-এ রচনা সুরু	শ্রাবণ ১২৮০ থেকে ভাদ্র ১২৮১ 'বঙ্গদর্শন'	১৮৭৫, ১লা জুন
৮। রজনী	১৮৭৪ খ্রীঃ বারাসত ?	আশ্বিন থেকে চৈত্র ১২৮১ বৈশাখ ও ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ ১২৮২ 'বঙ্গদর্শন'	১৮৭৭, ২রা জুন
কৃষ্ণকান্তের উইল	১৮৭৫ খ্রীঃ-এ জুন থেকে ৮ মাস কাঁটালপাড়ায় থাকাকালে	পৌষ থেকে ফাল্গুন ১২৮২ 'বঙ্গদর্শন' বৈশাখ থেকে মাঘ ১২৮৪ 'বঙ্গদর্শন' (সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত)	১৮৭৮, ২৯শে আগস্ট
১০। রাজসিংহ	হুগলী	চৈত্র ১২৮৪ (১৮৭৮ খ্রীঃ) থেকে ভাদ্র ১২৮৫ 'বঙ্গদর্শন'	১৮৮২, ৪ ফেব্রু.
১১। আনন্দমঠ	হুগলী	চৈত্র ১২৮৭ থেকে আশ্বিন ১২৮৮ 'বঙ্গদর্শন', বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ 'বঙ্গদর্শন'	১৮৮২, ১৫ই ডিসে.

গ্রন্থের নাম	রচনাকালীন স্থান ও কাল	সাময়িকপত্রে প্রকাশকাল ও নাম	গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল
১২। দেবী চৌধুরাণী	১৮৮২ খ্রী: ৮ই আগস্টের পর জাজপুর (কটক)	পৌষ থেকে চৈত্র ১২৮৯—'বঙ্গদর্শন', কার্তিক থেকে মাঘ ১২৯০—'বঙ্গদর্শন' (মাত্র ২য় খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত)	১৮৮৪, ২০ মে
১৩। রাধারাণী	১৮৭৫ খ্রী: জুনের পর কাঁটাল-পাড়ায়	২৪শে কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৮৭৫ খ্রী: 'বঙ্গদর্শন'	১৮৮৬, ২৫ জুন
১৪। সীতারাম	১৮৮৬, ১০ই জুলাই থেকে—হাওড়া	শ্রাবণ ১২৯১ থেকে মাঘ ১২৯৩ (মাঝে কয়েক সংখ্যা বাদ) —'প্রচার'।	১৮৮৭, ৪ মার্চ

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৮৬২ খ্রী: থেকে ১৮৬৪ খ্রী: বলে অনুমিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন ২৪ থেকে ২৬ বৎসর। তিনি তখন খুলনা জেলার হাকিম। সেখানে তিনি নববিবাহিতা কিশোরী পত্নীকে সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন। খুলনা তখন যশোহরের অধীনস্থ একটি মহকুমা। সেইখানকার পরিবেশ তখন অশান্ত। একদিকে নীলকর অত্যাচার, অন্যদিকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব। বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ় হাতে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। দুর্ধর্ষ নীলকর মরেল সাহেবকে দমন করলেন। কিন্তু সেখানে 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। মাত্র কয়েকটি পরিচ্ছেদ রচিত হয়। তারপর তিনি ১৮৬৪ খ্রী:-র ৫ই মার্চ ২৪-পরগণার বারুইপুরে বদলী হয়ে এলেন। এইখানে তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' শেষ করলেন। সেই সময়ের বঙ্কিম-মানসের বর্ণনা দিয়েছেন কালীনাথ দত্ত—

দুর্গেশনন্দিনী

"বারুইপুরে বদলী হইয়া আসিবার পর তিনি আবার ঐ অসমাপ্ত রচনায় (দুর্গেশনন্দিনী) হাত দিলেন। এজলাসে আসেন, বসেন, মামলার বিবরণ শোনেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁহাকে সর্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি, সাক্ষীর এজাহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে

অন্যমনা হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে study room—এ প্রস্থান করিতেন, চিহ্নিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না।"

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এরূপ ব্যস্ততা ছিল বলেই বোধ হয় তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে Relief গ্রহণ করবার জন্য একটু বেশি 'রোমান্টিক' হয়ে পড়েছেন।

গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীঃ-র মার্চ মাসে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এরূপ—"দুর্গেশনন্দিনী।/ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস। /শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত/কলিকাতা।/মৃজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮।৫/বিদ্যারত্ন যন্ত্র।/ইং ১৮৬৫/মূল্য—১-এক টাকা।/"

বর্তমান বিজ্ঞান কলেজের পাশে এই প্রেস অবস্থিত ছিল। এর মালিক ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

'দুর্গেশনন্দিনী'র উৎসর্গপত্রটি এরূপ ছিল—"জ্যেষ্ঠাগ্রজ/শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের/শ্রীচরণে এই গ্রন্থ উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলাম।"

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পূর্বে একটু ইতিহাস আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি-জীবনের সংগে ঘটনাটি অঙ্গীভূত বলে আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। পুস্তকখানি প্রকাশ করবেন কিনা তা নিয়ে বঙ্কিমের মনে দ্বিধার অন্ত ছিল না। তাই তিনি প্রথমে কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে কয়েকজনের সম্মুখে পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রে শোনান। এঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর দুই অগ্রজ ও ভাটপাড়ার কয়েকজন পণ্ডিত। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই পাঠের বর্ণনা করেছেন—

"এক সময়ে বড়দিনের কি মহরমের ছুটীতে আমার মনে নাই, অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার হস্তলিখিত 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁহাদের নিকট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন; কেহ ঐ ঘরে প্রবেশ করিলে শ্রোতৃগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন।...শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অহিফেনভোগী ছিলেন; মুহুর্মুহুঃ তাহাদের তামাক আবশ্যক হইত; তাঁহারা তামাক ডাকিতে ভুলিয়া গেলেন।...একজন প্রাচীন ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, 'আ মরি, আ মরি! কি বক্তৃতাই করিতেছেন।' এইরূপে দুইদিনে গল্পপাঠ শেষ হইল।" (বঙ্কিমপ্রসঙ্গ: ৭০-৭১ পৃ)।

এই পাণ্ডুলিপি তিনি সুখ্যাত সমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কেও পড়তে দিয়েছিলেন। ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন—"তোমার লিখবার শক্তি আছে কিন্তু এ বই এখনই ছাপিও না। তবে তুমি লিখে যাও।" বঙ্কিমচন্দ্রের দুই অগ্রজ গ্রন্থখানিকে প্রকাশের অযোগ্য বলে মন্তব্য করেছিলেন।

এমনিভাবে নিন্দা ও প্রশংসার মধ্যে বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' বের হল। এই গ্রন্থ প্রকাশের পরও কম সমালোচনা হল না। মোট কথা, বাংলা সাহিত্যে একটা আলোড়ন পড়ে গেল।

'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনীটি নাকি গল্পাকারে বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছেলেবেলায় এই গল্পটি তাঁর মেজঠাকুরদা জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনা এরূপ :—

"আমাদের খুল্লপিতামহ এক শত আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।···তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা শুনিতাম তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্তর্গত, উহা প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসানের কথা···তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুনিয়াছিলেন, যদিও ঐ ঘটনা আকবর শাহা বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল, তাথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্য স্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজঠাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন, এবং মান্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে, উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুত কুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়াছিলেন।" (বঙ্কিমপ্রসঙ্গ)।

কেবলমাত্র খুল্লপিতামহর নিকট কাহিনী শুনেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র পটভূমি নির্বাচন করেননি, এই স্থানে তিনি নিজে গিয়ে গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখে এসেছিলেন। উপন্যাসের প্রারম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা স্বীকার করেছেন।

এখনো এই গড়-মান্দারণ স্থান আছে। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান কামারপুকুরের অদূরেই গড়-মান্দারণ অবস্থিত। এখানে আসতে হলে হাওড়া স্টেশন থেকে বৈদ্যুতিক ট্রেনে প্রথমে তারকেশ্বর যেতে হবে। তারপর বাসযোগে আরামবাগ হয়ে কামারপুকুর। কামারপুকুর চটীতে নেমে বাঁদিকের পাকা রাস্তা ধবে কিছুটা গেলেই মাঠের মধ্যে দেখা যাবে গড়ের উঁচু মাটির ঢিবি। স্থানটি বর্তমানে বনজঙ্গলে আকীর্ণ হয়ে আছে। গড়ের পাশ দিয়ে আমোদর নদী চলে গেছে এঁকেবেঁকে। গড়ের অদূরেই রয়েছে মান্দারণ গ্রাম। গ্রামটি মুসসমানপ্রধান এবং অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর লোকের বাস। গড়ের মধ্যে ইতস্তত: কিছু ইট-পাথর ছড়ানো থাকলেও, কোন প্রাসাদের চিহ্ন বর্তমান নেই। একটি কবরখানা বা সমাধি আছে। লোকে বলে এ সমাধি বড় খাঁ গাজীর। অদূরে মান্দারণ গ্রামে আর একটি সমাধি আছে। লোকে বলে, সেটা ছোট খাঁ গাজীর। এঁরা যে কে ছিলেন, তাব কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে গড মান্দারণেব এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন—"যে পথে বিষ্ণুপুর প্রদেশ হইতে জগৎসিংহ জাহানাবদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই পথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম। মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। যে রমণীদিগের সহিত জগৎসিংহের মন্দির মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তাহারা মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া এই গ্রামাভিমুখে গমন করেন।

গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গড মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত, এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ এক খণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক বেষ্টিত হইয়াছিল; তৃতীয় দিকে মানবহস্তনিখাত এক গড় ছিল; এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূলশির: পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত; দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্য্যটক গড়মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলঙ্ঘ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন; দুর্গের নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে, অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে; তদুপরি, তিন্তিড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভল্লূকাদি হিংস্র পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটা দুর্গ ছিল।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংগে কল্পনার উপাদান মিশিয়ে 'দুর্গেশনন্দিনী'র এক রোম্যান্টিক পটভূমি গড়ে তুললেন।

শৈলেশ্বরের মন্দিরেরও একটি বাস্তব ভিত্তি আছে ব'লে মনে হয়। গড়মান্দারণের অদূরে কাঁঠালী গ্রামে এখনো একটি মন্দিরের ভিত্তি বর্তমান। লোকে তাকেই শৈলেশ্বরের মন্দির বলে জানে। পাশেই একটি কুঁড়ে ঘরে শিব আছে। শিবলিঙ্গটি কালো পাথরের। সামনে ত্রিশূল পোঁতা। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় শৈলেশ্বর শিবটি শ্বেতবর্ণ।

হারাধন দত্ত মহাশয়ের মতে, মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত নেড়াদেউলের শিবমূর্তিই বঙ্কিম-বর্ণিত শৈলেশ্বর শিব। আবার, শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস লিখেছেন, "তাহা সম্ভব নহে, কেননা নেড়াদেউল মান্দারণ হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে। বিমলা, বীরেন্দ্রসিংহের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দিগগজের সঙ্গে রঙ্গ সমাপন করিয়া, পদব্রজে কি ৮ ক্রোশ যাইয়া আবার ৮ ক্রোশ ফিরিয়া আসিতে পারেন? সম্ভবতঃ সে শিবলিঙ্গ নাই। মুসলমান-দিগের আমলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

(বঙ্কিমবাবুর জীবন কথা—তারকনাথ গ্রন্থাবলী)

'দুর্গেশনন্দিনী'র রোমান্সরসবর্ণনায় বঙ্কিমের নব-বিবাহিত জীবনের রোমান্টিক আবেশ ছায়াপাত করেছে বলে অনুমান হয়।

'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। গ্রন্থটির প্রকাশকাল সংবৎ ১৯২৩ অর্থাৎ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ। কলকাতার নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটি তাঁর মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন।

কপা. কুণ্ডলা

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের পটভূমি মেদিনীপুর। অনেকেই অনুমান করেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন নেগুঁয়াতে কাজ করতেন তখনই এই গ্রন্থ-পরিকল্পনার কারণ ঘটে। সে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন নেগুঁয়াতে ছিলেন তখন মাঝে মাঝে এক কাপালিক সন্ন্যাসী তার সংগে দেখা করতেন। সেই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হয়েছিল যে, তিনি সমুদ্র তীরবর্তী কোন বনে বাস করেন।

মেদিনীপুরে বাসকালে সন্ন্যাসী ও প্রেতের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা নিয়ে বহু কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল। তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নব-পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র ১৩১৮ সালের কার্তিক সংখ্যায়

"বঙ্কিমচরিত (নিশীথে প্রেতিনী দর্শন)" শীর্ষক প্রবন্ধ ও পরে তার বিস্তৃত রূপ ১৩৩১ সালের ২৫শে মাঘ 'সচিত্র শিশিরে' 'নিশীথ রাক্ষসী' নামে প্রকাশিত এবং ১৩৩১ সালের ১০ই শ্রাবণ 'সচিত্র শিশিরে' 'কপালকুণ্ডলার ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

এ সম্বন্ধে প্রচলিত গালগল্পের সারবত্তা বিষয়ে স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে। তবে বঙ্কিমের জীবনে যে সন্ন্যাসীর প্রভাব প্রচুর ছিল, তাঁর উপন্যাসগুলি তার সাক্ষ্য। কোন সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে এসে তাঁদের সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল অস্বাভাবিক নয়। বিশেষভাবে গৃহস্থ বঙ্কিম সন্ন্যাস-জীবনকে গার্হস্থ্য পটভূমিতে স্থাপন ক'রে পরীক্ষা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের বর্ণনায় জানা যায়, তাঁর মনের এই প্রশ্ন তিনি দীনবন্ধু এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে করেছিলেন।

প্রশ্নটি এই—"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?"

দীনবন্ধু কোন উত্তর দেননি। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে রসিকতা করে বলেছিলেন, মেয়েটি গরীবের ঘরে পড়লে চোর হবে। পরে বলেছিলেন—কিছুদিন সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকবে বটে, তবে ক্রমে স্বামী-পুত্রের প্রতি প্রেম ও স্নেহে সংসারী হয়ে পড়বে।

তারপর বোধহয় দীর্ঘকাল ধরে মনের মধ্যে তিনি এই প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান খুঁজছিলেন। বারুইপুরে থাকাকালে তাঁর এই গ্রন্থরচনার সুযোগ ঘটে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের পটভূমি বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থের প্রথমে দুরন্ত কুজ্ঝটিকার বর্ণনায় তিনি বাল্যকালের এক ভয়ানক কুয়াশার স্মৃতিচারণ করেছিলেন, এ সংবাদ দিয়েছেন পূর্ণচন্দ্র। তিনি আরও অনুমান করেন, কোনও কুলত্যাগিনী গৃহস্থবধূর কাহিনী অবলম্বনে 'মতিবিবি' চরিত্রটি রচিত।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সপ্তগ্রাম একটি বিশেষ পটভূমি হিসাবে প্রকাশিত

এই সপ্তগ্রামের বর্ণনায় বঙ্কিম কিভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন তা দেখা যেতে পারে।

সপ্তগ্রাম—"হুগলি জেলার মগরা থানার গ্রাম। হাওড়া হইতে ২৪ মাইল উত্তরে বান্দেল স্টেশনের পরে আদি-সপ্তগ্রাম নামে স্টেশন আছে; পূর্বে ইহার নাম ছিল ত্রিশবিঘা। প্রাচীন সরস্বতী নদীর খাতে পূর্বে ভাগীরথীর প্রধান খাত ছিল। ইহার তীরে ছিল সপ্তগ্রাম, বর্তমান সাতগাঁ। এই সপ্তগ্রাম—বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, বাসুদেবপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সম্বচোরা, বলদঘাটি। হিন্দু রাজাদের সময় ইহার উত্থান হইলেও মুসলমানদের সময়ে এখানকার গৌরবময় যুগ। শেরশাহ সপ্তগ্রাম হইতে দিল্লী পর্যন্ত একটি রাজসড়ক নির্মাণ করেন। তাহা এখন গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত। সরস্বতীর খাত দিয়া ভাগীরথীর অধিকাংশ জলরাশি প্রবাহিত হইত বলিয়া দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যেরও ইহাই ছিল পথ। ১৬৩০-এ নদী সরিয়া যায় ও সপ্তগ্রামের ফৌজদার হুগলিতে দপ্তর উঠাইয়া লইয়া যান। ১৭ শতকের মধ্যভাগ হইতে সপ্তগ্রামের [illegible] হয়

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সপ্তগ্রামের বর্ণনা এরূপ—"পূর্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধশালী নগর ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সঙ্কীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলী নূতন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পর্তুগীসেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন। কিন্তু তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল; কিন্তু তখনও অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।" (কপা. ২/৬)।

এমনিভাবে টুকরো টুকরো বিক্ষিপ্ত বাস্তব ঘটনাবলীর সাহায্যে বঙ্কিম-মানসে অখণ্ড সৌন্দর্যানুভূতিতে 'কপালকুণ্ডলা'র জন্ম হল।

'মৃণালিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস। গ্রন্থটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিম-জীবনী'তে বলেন—"আলিপুরে বঙ্কিমচন্দ্র দশমাস মাত্র ছিলেন। সেই দশমাসের [১৮৬৭ আগস্ট হইতে ১৮৬৮ জুন] ভিতর তিনি মৃণালিনী লিখিয়া শেষ করিলেন। পরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে তিনি ছয় মাসের ছুটি লইলেন। ছুটির কিয়দংশ গৃহে থাকিয়া আইন-পুস্তক-পাঠে ও মৃণালিনীর পাণ্ডুলিপি সংশোধনে অতিবাহিত করিলেন; এবং অবশেষে মৃণালিনী ছাপিতে দিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন।...মৃণালিনী মুদ্রিত হইতে এক বৎসরের উপর সময় লাগিয়াছিল। অবকাশান্তে বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তখনও মৃণালিনী ছাপা শেষ হয় নাই। অবশেষে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মৃণালিনী প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে চলিয়া গেলেন।"

মৃণালিনী

'মৃণালিনী'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। আখ্যায়িকাপত্রে একটি শ্লোক উদ্ধৃত ছিল।—"বিভর্ষি চকারমণির্বিতানাং/ মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্।" উৎসর্গপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—"বঙ্গকবিকুল-তিলক/শ্রীযুক্তবাবু দীনবন্ধু মিত্র/সুহৃৎ প্রধানকে/এই গ্রন্থ/প্রণয়োপহারস্বরূপ/ উৎসর্গ করিলাম।"

'মৃণালিনী'র আখ্যায়িকায় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বন করেছেন, তাই ব্যক্তিজীবনের অনুপ্রবেশ ঘটানোর সুযোগ কম। তবে 'মৃণালিনী' ও অন্যান্য উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন ঘটনায় জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর যেরূপ আস্থা স্থাপন করেছেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসেরই ফল।

বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস রচনা করলেন, কিন্তু বাংলা উপন্যাসের জগতে এক অমৃতময় বৃক্ষের জন্ম হল। বঙ্কিম তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বাংলা সামাজিক উপন্যাসের যে দিগন্ত উন্মোচিত করলেন, বর্তমানে তা বিচিত্র রঙে সুশোভিত।

বিষবৃক্ষ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে ''বিষবৃক্ষ' উপন্যাসও ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল, "১২৭৯ সালের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত মোট এগারো সংখ্যায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এরূপ—"বিষবৃক্ষ/উপন্যাস।/শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত।/

কাঁটালপাড়া।/বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।/ ১২৮০।/"

'বিষবৃক্ষ' প্রকাশকালে বঙ্কিম মুর্শিদাবাদে কর্মরত। সম্ভবতঃ এখানেই উপন্যাসটি লিখিত হয়। বঙ্কিমের বয়স তখন আনুমানিক ৩৫ বৎসর।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিম রোমান্স ও ইতিহাসের স্বপ্নলোক থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। এরকমটি কেন হল, তার কোন সূত্র পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা চলে যে, বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সংস্কারকদের দ্বারা বাংলার সমাজ-জীবনে যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল, তা-ই বঙ্কিমচন্দ্রকে সামাজিক উপন্যাস রচনা করতে প্রেরণা দিয়েছিল। বিধবা বিবাহ-সমস্যা যে বঙ্কিমকে ভাবিয়ে তুলেছিল, তার প্রমাণ বিষবৃক্ষে আছে। কুন্দ বিধবা, হীরা বিধবা— এই দু'জনের সমস্যাই প্রধান। তারাচরণের মা শ্রীমতীও বিধবা ছিল এবং তার চরিত্র দুষ্ট হয়েছিল।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের বিষয়-বস্তুতে বঙ্কিম যেমন মাটির কাছাকাছি এসেছেন, তেমনি কোন কোন চরিত্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে সংগ্রহ করেছেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'বঙ্কিম প্রসঙ্গে' লিখেছেন—তিনি বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করেন সত্যই কি বিষবৃক্ষে কিছু বাস্তব ছবি আছে? তার উত্তরে বঙ্কিম বলেন—'কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হইয়াছে।'

নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন' (২য় ভাগ)-এ লেখেন, সূর্যমুখীর চরিত্র বঙ্কিমের স্ত্রীর প্রতিচ্ছবি। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন নবীনচন্দ্র তাঁর রচনা থেকে পাঠ করতে অনুরোধ জানান। "তিনি কি পড়িবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।...আমি বলিলাম—'বিষবৃক্ষ'। তিনি—'কোন্ স্থান পড়িব?' আমি—'যে স্থান আপনার অভিরুচি।' তিনি 'বিষবৃক্ষ' খুলিয়া যেখানে কমলমণির কাছে সূর্যমুখী তাঁহার পতিপ্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন সে স্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—'বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি।' আমাকে অক্ষয়বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে 'নভেলিষ্ট' করিয়াছে। তিনিই সূর্যমুখী।" (আমার জীবন, ২য় ভাগ).

বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসখানি তাঁর প্রিয় বন্ধু জগদীশনাথ রায়ের নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল—"কাব্যপ্রিয়/পণ্ডিতাগ্রগণ্য/শ্রীযুক্তবাবু

জগদীশনাথ রায়/সুহৃদবরকে/এই গ্রন্থ/বন্ধুত্ব ও স্নেহের চিহ্নস্বরূপ/অর্পিত হইল।"

জগদীশনাথ রায় ২৪-পরগণা জেলার কাঁচরাপাড়ায় বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পুলিশ বিভাগের সামান্য কর্মচারী থেকে তিনি নিজ প্রতিভাবলে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর পদে উন্নীত হন। তাঁর স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ ক'লকাতায় জগদীশনাথ রায় লেন আছে।

এই জগদীশনাথ রায় সম্বন্ধে 'বঙ্কিমজীবনী'তে শচীশচন্দ্র লেখেন—'বিষবৃক্ষে' হরদেব ঘোষালের নামে যে পত্রগুলি আছে, সেগুলি জগদীশনাথ রায়ের লেখা।

হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রনাথের বন্ধু। তিনি বিদেশে থাকেন। উপন্যাসে এ চরিত্রটির উপস্থিতি নেই। এঁর সঙ্গে কেবল নগেন্দ্রের পত্র-বিনিময় হয়েছে। এই পত্রেব দ্বারা নগেন্দ্রের মনের খবর পাওয়া যায়। হরদেব ঘোষালের পত্র থেকে বোঝা যায় তিনি বিজ্ঞ এবং লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ। নগেন্দ্রের প্রতি তাঁর ভালবাসাও প্রবল।

১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শন' চৈত্রসংখ্যায় 'ইন্দিরা' ছোট গল্প আকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইন্দিরা' যখন প্রথম পুস্তক আকারে

ইন্দিরা

প্রকাশিত হয়, তখনো বঙ্গদর্শনের পাঠটুকুই বর্তমান ছিল। তখন পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪৫। প্রথম সংস্কবণেব আখ্যাপত্রটি এরূপ—"ইন্দিরা/উপন্যাস।/বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত/কাঁটালপাড়া।/বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়./ কর্তৃক মুদ্রিত।,১২৮০/মূল্য চারি আনা মাত্র।"

বঙ্কিমচন্দ্র, মৃত্যুব একবছর পূর্বে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইন্দিরা'কে সংস্কাব ক'বে ১৭৭ পৃষ্ঠার পঞ্চম সংস্করণ বেব করেন।

'ইন্দিরা' উপন্যাসে গার্হস্থ্য চিত্রের যে সুনিবিড় পরিচয় পাই, তা বঙ্কিমেব গৃহজীবনেরই অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলে ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন।—

"লক্ষ্য করার বিষয় উপেন্দ্র ও ইন্দিরার বয়সের পার্থক্য দশ (বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী দেবীর ন্যায়); যখন উপেন্দ্র ৩০, তখন ইন্দিরা ২০। এই গ্রন্থ রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মীদেবী যথাক্রমে ৩৫ ও ২৫ বৎসর। মনে হয় সুখোচ্ছল বঙ্কিমচন্দ্র আপন জীবনের পরিপূর্ণ মাধুর্যকে একটি কাহিনীব পাত্রে পরিবেশন করেছেন। এমনটি আর কোথাও ঘটেনি।"

(কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র)

যুগলাঙ্গুরীয় ১২৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'যুগলাঙ্গুরীয়' প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১ম সংস্করণের আখ্যাপত্র—"যুগলাঙ্গুরীয়/উপন্যাস।/শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত।/ কাঁটালপাড়া।/বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক/মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/১২৮১।/"

'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র কাহিনীর সঙ্গে বঙ্কিমের তমলুকের রাজবাটীর এক উদ্যানের বাস্তব অভিজ্ঞতা জড়িত রয়েছে, একথা বলেছেন বঙ্কিম-জীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস রচনায় হাত দেন। উপন্যাসটি প্রথমে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮০ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় এবং শেষ হয় ১২৮১ সালের ভাদ্র সংখ্যায়। তারপর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এরূপ:—"চন্দ্রশেখর।/উপন্যাস।/শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত।/কাঁটালপাড়া।/বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক/মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/১২৮২ /

চন্দ্রশেখর

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৯৫। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটি তাঁর অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন—"অনুজ/ শ্রীমান্ বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে/এই/গ্রন্থ/স্নেহ-চিহ্নস্বরূপ/উপহার/প্রদত্ত হইল।"

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ইতিহাসের পটভূমিকায় প্রেমকাহিনীকে স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী উপন্যাসের প্রেমকাহিনীর রোমান্স এই উপন্যাসে আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছে। বয়সোচিত অভিজ্ঞতার ফলে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেমচিন্তা যথেষ্ট পরিণত হয়েছে বলা চলে।

'রজনী' রচিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অসুস্থতার জন্য ছুটি নেন তিন মাস। তারপর মে মাস থেকে বারাসতে পাঁচ-ছ মাস থাকেন। গ্রন্থটি সেই সময়ে রচিত। ঐ বৎসরই, অর্থাৎ ১২৮১ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৮১ সালের আশ্বিন থেকে চৈত্র এবং ১২৮২ সালের বৈশাখ ও ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত মোট বারোটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'রজনী' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ২রা জুন, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১২৮৪ সালে)। 'রজনী'র প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ

রজনী

গ্রন্থাবলী সম্পাদকের মন্তব্য—"রজনী'র প্রথম সংস্করণ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারেও একখণ্ড আছে বটে, কিন্তু তাহার ১—২ ও ৯—১০ পৃষ্ঠা নাই।"

'রজনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কতটুকু কাজে লাগিয়েছেন তা নির্ণয় করা যায় না। তবে নীতি ও অলৌকিকতার যে কিঞ্চিৎ বাহুল্য আছে তা পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১২৮২ সালের পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন—এই তিন সংখ্যায় কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তী সংখ্যা থেকে 'বঙ্গদর্শন' আর কিছুদিন প্রকাশিত হয়নি, ফলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রকাশও বন্ধ ছিল। ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাস থেকে মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় পুনরায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও প্রকাশিত হতে লাগল। ঐ বৎসর মাঘ মাসের পত্রিকায় উপন্যাসখানির শেষ কিস্তি ছাপা হয়। সুতরাং 'বঙ্গদর্শনে'র মোট তেরটি সংখ্যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণকান্তের উইল

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এরূপ।—

"কৃষ্ণকান্তের উইল। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত।/কাঁটালপাড়া।/ বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক/মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/১৮৭৮/ All rights Reserved/মূল্য এক টাকা দুই আনা মাত্র।"

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য মালদহের রোডসেসের কাজ থেকে ছ'মাসের ছুটি নিয়ে কাঁটালপাড়ায় এসে থাকেন। অনুমান সেই সময়েই তিনি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, এই উপন্যাসখানি রচনার পশ্চাতে বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের ঘটনার প্রভাব আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র যে উইল করে যান, তা নিয়ে ভ্রাতাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। মনে হয়, এইজন্যই তিনি 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ বন্ধ করেন এবং চুঁচুড়ায় বাস করতে থাকেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ'-এ লিখেছেন—"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি ত চুঁচুড়ায় বাস করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু কৃষ্ণকান্তী আছে ? তিনি বলিলেন, 'তুমি ঠিক বুঝিয়াছ।"

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে উইল সম্বন্ধীয় ঘটনার প্রাধান্য থাকলেও, এক সুখী দম্পতির জীবনে বিচ্ছেদের বেদনাই মূল আবেদন জুগিয়েছে।

১২৮৪ সালের (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) 'বঙ্গদর্শনে'র চৈত্র সংখ্যা থেকে 'রাজসিংহ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৮৫ সালের

রাজসিংহ

ভাদ্র মাস পর্যন্ত, মোট ৬টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে অসমাপ্ত অবস্থায় গ্রন্থটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ তিন বছর পরে ১২৮৮ সালে (৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ খ্রীঃ) 'রাজসিংহ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তখন লেখক গ্রন্থটিকে উপন্যাস না বলে 'ক্ষুদ্রকথা' নামে অভিহিত করেন। প্রথম সংস্করণে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮৩। ২য় সংস্করণ হয় ১২৯২ সালে (পৃ ৯০)। তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত সামান্য পরিবর্তনের ফলে পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়ায় ৯০-এ। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট 'রাজসিংহে'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। চতুর্থ সংস্করণটি ব্যাপক পরিমার্জন ও পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ নূতন রূপ লাভ করে। পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৪৩৪।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে ইতিহাসের কাহিনী প্রাধান্য লাভ করায় ব্যক্তিজীবনের অনুপ্রবেশ ঘটেনি।

১২৮৭ সালের চৈত্রসংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' থেকে আরম্ভ ক'রে ১২৮৮ সালের আশ্বিনসংখ্যা পর্যন্ত 'আনন্দমঠ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে

আনন্দমঠ

ছ'মাসের জন্য বন্ধ থাকে, কারণ 'বঙ্গদর্শন'ও সেই সময় বন্ধ হয়ে যায়। ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস থেকে পুনরায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে 'আনন্দমঠ'ও প্রকাশিত হয়, এবং জ্যৈষ্ঠসংখ্যাতে শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ, মোট ন'টি সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'আনন্দমঠ' প্রথম প্রকাশিত হয়।

'আনন্দমঠ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর। তখন পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৯১। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এরূপ ছিল।—

"আনন্দমঠ।/শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত।/কলিকাতা।/জন্‌সন্ প্রেসে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক/মুদ্রিত /১২৮৯।/মূল্য এক টাকা দুই আনা মাত্র।

বঙ্কিমের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্রের 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গে'র বর্ণনা থেকে জানা যায়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় গ্রন্থ-রচনার উপাদান তিনি বাল্যকালেই লাভ করেন। তাঁদের খুল্লপিতামহের নিকট বাল্যকালে তাঁরা মন্বন্তরের গল্প শোনেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় বঙ্কিমের মনে পুনরায় সেই

বাল্যকালে শোনা গল্পের স্মৃতি উদিত হয়, তারপর পরিণত বয়সে 'আনন্দমঠে' রূপলাভ করে।

'আনন্দমঠ' গ্রন্থখানি বঙ্কিম পরলোকগত প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রটি এরূপ ছিল।—

"উৎসর্গপত্র/ক্ব নু মাং ত্বদধীনজীবিতং/বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।/নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো/জলসংঘাতইবাসি বিদ্রুতঃ॥/স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এইরূপ উৎসর্গ হইল।"

'আনন্দমঠে' সন্নিবেশিত তিনটি গান বা কবিতা এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে রচিত বা শ্রুত। পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন—'ধীরে সমীরে তটিনীতীরে' ও 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে'—কবিতা দু'টি বঙ্কিমের বাল্যকালে শ্রুত। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত বঙ্কিমের ক্লাসিক সৃষ্টি। এটি জাতীয় আন্দোলনে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করে।

দেবী চৌধুরাণী

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুর (কটক)-এ অস্থায়ী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টররূপে যোগদান করেন। এই সময়েই 'দেবী চৌধুরাণী'র রচনা সুরু বলে মনে হয়।

১২৮৯ সালের পৌষ মাসের 'বঙ্গদর্শন' থেকে 'দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশিত হতে থাকে, কিন্তু চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, ১২৯০ সালের বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ থাকে। তারপর কার্তিক থেকে মাঘ পর্যন্ত চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বঙ্গদর্শন আবার বন্ধ হয়। ঐ চার সংখ্যাতে 'দেবী চৌধুরাণী'-ও ছিল। কিন্তু মাত্র দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। তারপর বঙ্কিম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরূপে 'দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশ করেন।

'দেবী চৌধুরাণী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২০৬। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি ছিল এরূপ—"দেবী চৌধুরাণী/ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত।/কলিকাতা/শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত/৩/৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে/শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত/১২৯১/মূল্য ২ টাকা/"

গ্রন্থখানি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রটি এরূপ—"যাঁহার কাছে/প্রথম নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছিলাম,/যিনি স্বয়ং/নিষ্কাম কর্মই ব্রত করিয়াছিলেন,/যিনি এখন/পুণ্যফলে স্বর্গারূঢ়,/তাঁহার/ পবিত্র পাদপদ্মে/এই গ্রন্থ/ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।

'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসে ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃভক্তির অনেকেই সাদৃশ্য অনুভব করেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন থেকে ছুটি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় বাস করতে থাকেন। ঐ বছরই কার্তিক অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'রাধারাণী' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি—'উপকথা—অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' নামক পুস্তকে স্থানলাভ করে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 'রাধারাণী'র প্রথম আবির্ভাব।

রাধারাণী

বঙ্কিম-জীবনীকার শচীশচন্দ্র এই 'রাধারাণী' আখ্যানের সূত্র হিসাবে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—

"গৃহ-বিগ্রহ রাধাবল্লভজিউর রথযাত্রা প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। পূজনীয় যাদবচন্দ্র তখন জীবিত। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালে রথযাত্রার সময় ছুটি লইয়া গৃহে আসিয়াছিলেন। রথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়া যায়। তাহারা আত্মীয়-স্বজনের অনুসন্ধানার্থে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার দুই মাস পরে 'রাধারাণী' লিখিত হয়। আমার মনে হয়, এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'রাধারাণী' রচনা করিয়াছিলেন।"

'সীতারাম' উপন্যাস রচনার প্রেরণা হিসাবে শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' ২য় খণ্ডে একটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন। এই তথ্য এবং অন্যান্য তথ্যের সমবায়ে যদুনাথ সরকার সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখেছেন—

সীতারাম

"১৮৬১—১৮৬৩ এই তিন বৎসর বঙ্কিম, খুলনা জেলায় ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন, এবং ঐ জেলার মাগুরা বিভাগের সাবডিভিসনাল অফিসর নিযুক্ত থাকেন। ঐ অঞ্চলে মাগুরা শহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর এখন গ্রাম মাত্র, কিন্তু তাহার রাজবাড়ী, মন্দির, দুর্গ প্রাকার, পরিখা প্রভৃতির অগণ্য ভগ্নাবশেষ জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে। স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ যে 'রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্পরসিক কর্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া বঙ্কিম তাঁহার নিকট হইতে অনেক গল্প গুজব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন রাইচরণ বাবু ২।৩ মাস বেতনভুক হইয়া মাগুরায় থাকেন ও তাঁহাকে সময়মত গল্প শুনাইতেন।"

(সতীশচন্দ্র, ২য় খণ্ড, ৫১৪ পৃঃ) সীতারামের মৃত্যুর দেড়শত বৎসর পরেও তাঁহার বাসস্থানে তাঁহার নিজের এবং লোকজনের বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী সীতারামের নিজ জীবনের বিবরণের একমাত্র উপাদান। তাহার উপর বঙ্গদেশের ইতিহাস কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র ষ্টুয়ার্ট (তস্য পিতা রিয়াজ-উস্-সলাতীন, তস্য পিতা সলিমুল্লার তারিখ-ই-বাংগালা) হইতে লইয়া বঙ্কিম নিজ কাহিনী পূর্ণ করিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র যখন হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কাজ করছিলেন, যে সময় তিনি বেশির ভাগ কলকাতাতেই থাকতেন এবং এখানেই 'সীতারাম' গ্রন্থটি লিখিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকার ১ম সংখ্যা (১২৯১, শ্রাবণ) থেকেই ধারাবাহিকভাবে 'সীতারাম' উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৯৩ সালের মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে তবে শেষ হয়। মাঝে কয়েক সংখ্যা বাদ ছিল।

'সীতাবাম' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালেব ১৭ই ফাল্গুন (মার্চ ১৮৮৭), পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪১৯। মূলতঃ এটি 'প্রচারে' প্রকাশিত উপন্যাসেবই পুনর্মুদ্রণ। গ্রন্থখানি তিনি উৎসর্গ করেন—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যাযকে। উৎসর্গপত্রটি এরূপ —"সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত,/সর্বগুণেব আধার,/সকলের প্রিয়,/আমাব বিশেষ স্নেহেব পাত্র/৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের/স্মরণার্থ/এই গ্রন্থ/উৎসর্গ করিলাম।"

বঙ্কিম-উপন্যাসে তাঁব ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলনের যে সমীক্ষা করা গেল, তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কৌতূহলী মনেব এতে তৃপ্তি হয় না। তবে একথা সত্য বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস শিল্পকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বেশ কিছু দূরে রাখতেই চেয়েছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা শিল্পী-সত্তারই প্রকাশ অধিক। বঙ্কিমচন্দ্রেব সৌন্দর্যচেতনা ও আদর্শবোধ ক্রমান্বয়ে তাঁর উপন্যাসকে একটি বিশেষ পরিণতিব দিকে নিয়ে চলেছে।

॥ তিন ॥

ছাত্রজীবনের পাঠ্যগ্রন্থ ও তার প্রভাব

ছাত্রজীবনে পাঠ্যতালিকাভুক্ত এমন অনেক বিষয় থাকে যা ছাত্রের মনে অনুপ্রেরণার কারণ না হয়ে বিরক্তি উৎপাদন করে। পাঠ্যতালিকার সবগুলি বিষয়ে সমান অনুরক্তি খুব অল্প ছাত্রের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু যে-কোন সাধারণ ছাত্রের ক্ষেত্রেও পাঠ্য তালিকার অন্ততঃ একটি বিষয়েও সামান্যতম উৎসাহ থাকে। যে ছাত্রটি বরাবর ক্লাসে ইংরেজী, অংকে ফেল করছে সে কিন্তু বাংলায় বেশ ভালই।

কোন মানুষের পরবর্তী জীবনে বাল্যকালের পাঠ্য বিষয়ের স্মৃতি হয়তো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জাগরূক থাকে না, কিন্তু তাঁর বিশেষ মানস গঠনে যে এককালে এইসব পাঠ্যবস্তু সাহায্য করেছিল সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য দুঃখের সংগে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ে এত বহুল পরিমাণে অপাঠ্য বস্তুর সমাবেশ করা হয়ে থাকে যা নিতান্তই পীড়াদায়ক। তাই সত্যিকারের কোন শিক্ষা স্কুল-কলেজের বাইরে এসেই যথার্থভাবে স্থরু হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্র-জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাঁর পাঠ্যতালিকার মূল্যায়ণ করতে চাই।

সেকালের প্রথামত কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের কাছে পাঁচ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। এই 'হাতে খড়ি' ব্যাপারটি শিক্ষারম্ভের একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপর গ্রাম্য পাঠশালায় গুরু মহাশয় রামপ্রাণ সরকারের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পাঠ শুরু হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী আলোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র এই শিক্ষা সম্পর্কে যে বিবৃত দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য।

"...সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন "গুরু মহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয় ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন ; কেন না, আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুরে গেলাম।"

অবশ্য এই তথ্য বঙ্কিমভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে—"বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নহে।…তাঁহাকে একজন Private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত।"

(বঙ্কিম প্রসঙ্গ)

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিই বিশ্বাসযোগ্য। এবং এ কথাও সত্য যে রামপ্রাণ সরকারের পাঠ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র পিতার কর্মস্থান মেদিনীপুরের ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন। তখন সেই স্কুলের হেড্-মাষ্টার ছিলেন এফ. টীড্। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি ঢাকায় বদলি হলে সিন্‌ক্লেয়ার হেড-মাষ্টার নিযুক্ত হন। পূর্ণচন্দ্র মেদিনীপুরের শিক্ষা সম্বন্ধে লিখেছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে একটি হাই স্কুল ছিল। টিড্ নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেড্ মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজী শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহা ঘটিল না।

মেদিনীপুরের শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানা না গেলেও বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ্যক্রমের প্রথম থেকেই যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর থেকে কাঁটালপাড়ায় চলে আসার জন্য ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর বঙ্কিমচন্দ্র ১১½ বছর বয়সে হুগলী কলেজে ভর্তি হন। তখন এই কলেজ মহম্মদ মহসীনের কলেজ নামেও পরিচিত ছিল। সে-সময়ে ১লা অক্টোবর থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শিক্ষাবর্ষ গণ্য করা হত। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়ে ভর্তি হয়েছিলেন।

"১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ যে-বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবেশ করেন, হুগলী কলেজের ইংরেজী বিভাগ—কলেজ ও স্কুলে বিভক্ত ছিল। স্কুল বিভাগের উচ্চভাগে (সিনিয়র ডিবিসনে) তিনটি শ্রেণী, প্রত্যেক শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকশন

এবং নিম্নভাগে (জুনিয়র ডিবিসনে) চারিটি শ্রেণী, প্রথম তিনটি শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকশন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র ডিভিসনে প্রথম শ্রেণীর "এ" সেকশনে ভর্তি হন। তখন জুনিয়র ও সিনিয়র ডিভিসনের ছাত্রদিগকে মাসিক বেতন যথাক্রমে দুই টাকা ও তিন টাকা দিতে হইত। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র বৈতনিক ছাত্র ছিলেন।" (সাহিত্যসাধক চরিতমালা)

উপরের উদ্ধৃতিটিতে প্রথম শ্রেণী বলতে চতুর্থ শ্রেণী বুঝতে হবে। এই শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা এরূপ ছিল—

Literature :	Azimghur Reader 2nd Poetical Reader Pinnock's Catechism of English History
Grammar :	Lennie's Grammar (to 20th Rule of Syntax) Writing.
Arithmetic :	Extraction of the Square Root. Vulgar Fraction.
Geography :	Stewart's Geograpy (Europe, Asia and Africa)
Bengali :	History of Bengal (বঙ্গেতিহাস) 51 pp. Gyanarnub (জ্ঞানার্ণব) 95 pp.

তখন এক একটি সেকশন এক একজন শিক্ষকের অধীন থাকত। তিনি বাংলা ছাড়া সমস্ত বিষয় পড়াতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেণী শিক্ষক ছিলেন নবীনচন্দ্র দাস। বাৎসরিক পরীক্ষায় 'এ সেকশনে যে দু'জন ছাত্র সাধারণ পারদর্শিতার পুরস্কার পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাদের মধ্যে অন্যতম।

১৮৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় শ্রেণীর 'এ' সেকশনে পড়েন। এ বছরেও বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি সাধারণ পারদর্শিতার পুরস্কার লাভ করেন। এই শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীর 'এ' সেকসনে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পড়েন। এই শ্রেণীতে তিনি কোন পুরস্কার পাননি।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর 'বি' সেকশনে পড়েন। এই শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন—

Head Master. J. Graves- B.A. : Literature and History.

Second Master. W. Brenand : Mathematics and Geography.

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ব্রেন্যাণ্ড সাহেব ঢাকায় বদলি হয়ে যান, তাঁর জায়গায় D. Foggo, B.A. আসেন প্রায় এক বছর পরে (১৮।২।৫৪)। এই সময় ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্লারমণ্ট সাহেব ব্রেন্যাণ্ড-এর কাজ ভাগ করে নেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ঈশানবাবু বদলি হলে তাঁর জায়গায় J. G. Beanland সাহেব আসেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপরোক্ত ব্যক্তিদের কাছে অঙ্ক ও ভূগোল শিক্ষা করেন।

তখন ছাত্রদের জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হত। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এই পরীক্ষার পাঠ্য তালিকা ছিল এরূপ—

Prose : Selections from Goldsmith's Essays, Cal. Ed.
Poetry : Selections from Pope, Prior and Akenside Poetical Reader No, III pt. II (last ed.)
History : Keightley's History of England, Vol. I
Grammar : Crombie, Part II
Geography and Map Drawing.
Mathematics : Euclid Books VI and XI
Algebra to the end of simple Equations Arithmetic.

Bengali : বেতালপঞ্চবিংশতি (2nd Ed.)
Bengali Grammar.

পরীক্ষা ৫ মাস পিছিয়ে যাওয়ায় এ বছর নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পাঠ (Supplementary) নির্দিষ্ট হয়।

Prose : Moral Tates, Encyclopaedia Bengalensis No. X
Poetry : Poetical Reader Part I, No. III (Cal. Ed.)
Crombie's Etymolegy & Syntax, Part I

Bengali : 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৭৭৪ শকাব্দা, ১০৫—১১৬ সংখ্যা।

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা তখন বিভিন্ন স্কুলে আলাদাভাবে নেওয়া হত। হুগলী কলেজ ও তার অধীনস্থ স্কুলের মোট ৭৩ জন পরীক্ষার্থী সেবার পরীক্ষা দেয়। তারমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষস্থান অধিকার করেন। মোট ৭টি বিষয়ের মধ্যে ছটি

বিষয়েই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, কেবল অনুবাদে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বৃত্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর—

ব্যাকরণ	ইতিহাস	গণিত	ভূগোল	সাহিত্য	অনুবাদ	মৌখিক পরীক্ষা	মোট
৪৫	৪১	৩০	৪৬	৪০	৩৪·৫	৩৯	২৭৫·৫

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় মাসিক ৮·০০ টাকা বৃত্তি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীতে ওঠেন। এই শ্রেণীর পাঠ্য-তালিকা ছিল।—

English : Addison, (pp. 1—382) as far as No, 2o5.
Pope. as contained in Richardson's Selections.

Moral Philosophy : Abercrombie's Moral Feelings.

History : Knightley's Hist. of England. Vol. II.

Physical Geography : Hughes' Physical Geography, pp. 1—99.

Mathematics : Euclid I-VI & XI (up to 21st proposition) Algebra and Plan Trigonometry. Surveying and Plan Drawing.

Bengali : নির্দিষ্ট পুস্তক কোন শ্রেণীতে ছিল না। • কেবল Translation ও Grammar.

এই শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন—

Literature : Principal J. Kerr, M.A. (সপ্তাহে ২ দিন)
J. Graves, B.A. (Hd. Master)

History : J. Graves.

Mathematics : R. Thwaytes, B.A., ও D. Foggo, B.A.
E. Lodge, B.A. (succeeded Foggo from 8. 12. 54)

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই শ্রেণীর পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষস্থান অধিকার করে পুনরায় ৮·০০ টাকা করে বৃত্তি পাবার অধিকারী হন। এই পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্রের ফলাফল এরূপ :—

Literature Paper (70)—39 ; Moral Philosophy and Political Economy (6o)—43 ; History (70)—56½ ; Pure Mathematics (100)—49·5 ; Mixed Mathematics (100)—34 ; English Essay (50)—30 ; Translation (50)—24 ; Total (500)—276.

তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র কার সাহেবের কাছে Literature, থোয়েট্‌স এর কাছে—Physics and Mathematics এবং গ্রেভ্‌স এর কাছে History পড়েন। লজ সাহেব বদলী হয়ে গেলে ১০-১-৫৬ তারিখে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুনর্নিযুক্ত হয়ে আসেন, তিনি পড়ান Sheodler's Book of Nature.

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই শ্রেণী থেকে যে ১৩ জন সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দেন, তারমধ্যে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই হুগলী কলেজ থেকে সেই বছর "Highest proficiency in all the subject" দেখিয়ে দু'বছরের জন্য মাসিক ২০.০০ টাকা বৃত্তি লাভ করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষার ফলাফল এরূপ :—

Literature—55, History—82, Mathematics—67 5, Naturl Philosophy—74'3, Translation—76, Total—854 8।

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রীষ্মের ছুটির পর একমাস দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন ট্রান্‌সফারের জন্য দরখাস্ত করেন। দরখাস্ত প্রেরণকালে তদানীন্তন অস্থায়ী অধ্যক্ষ মন্তব্য করেন—"Bankim Chunder is a youth of good character and acquirements."

১২ জুলাই বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করে আইন পড়বার জন্য কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। বৃত্তির টাকা থেকেই আইন বিভাগের ১৩.২৫ করে বেতন ও নগদ ২.০০ টাকা করে tution fee দেবার ব্যবস্থা হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পরীক্ষা দেন। সেবার মোট ২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দেন, তার মধ্যে ১১৫ জন প্রথম বিভাগে ও ৪০ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তখন তৃতীয় শ্রেণী ছিল না। সর্বসমেত অর্ধেকের বেশি নম্বর পেলে প্রথম বিভাগ হত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

এই শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য ছিল—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং।

পরীক্ষার বিষয় এবং পরীক্ষক ছিলেন—

English, Greek and Latin G. Smith. Esq., Principal.
Devoton College.

Sanscrit, Bengali and Hindee The Revd. K. M. Banerjee,
Professor, Bishop's College.

History and Geography E. B. Cowell, Esq., M. A.
Professor, Presidency College.

Mathemetice and Natural Philosophy W. Masters, Esq.,
Professor, Metropoliton College.

প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়াকালেই পরের বছর বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় বসেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে এই পরীক্ষা হয়। ১০ জন ছাত্র এই পরীক্ষা দেন। কিন্তু কেবলমাত্র দু'জন - বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ ছ'টি বিষয়ের মধ্যে ৫টিতে পাশ করেন, কিন্তু ৬ষ্ঠ বিষয়টিতে অনধিক ৭ নম্বর কম পেয়ে ফেল করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে ৭ নম্বর গ্রেস দিয়ে পাশ করাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"Minutes of the Syndicate, for the year 1858, 24th April.

8. Read a letter from the University Board of Examiners in Arts, stating that of the 13 candidates for the degree of B. A., three had been absent during the whole, or a portion of the Examination, and that of the others, all had failed.

Read also a letter from the like Board, recommending, that, two candidates, viz. Bunkim Chunder Chatterjee and Judoonath Bose who had passed creditably in five of the six subjects, and had failed by not more than seven marks in the sixth, might, as a special act of grace, be allowed to have their degrees, being placed in the second division. it being clearly understood, that such favour should, in no case, be regarded as a precedent in future years.

RESOLVED :—That the two candidates mentioned, be admitted to the degree of B.A (University of Calcutta, Minutes for the year 1858. pp. 18—19)

বি. এ. পরীক্ষায় অবশ্যপাঠ্য ইংরাজীতে ছিল—

সেক্সপীয়রের Macbeth, ড্রাইডেনের Cymon and Iphigenia, অ্যাডিসনের Essays প্রভৃতি।

বাংলায় পাঠ্য ছিল—মহাভারত (প্রথম তিন পর্ব), বত্রিশ সিংহাসন ও পুরুষ পরীক্ষা।

বি. এ. পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্র এখানে দেওয়া হল ঃ—

Examination Papers 1858. Bechelor of Arts
Tuesday. April 6th Morning 10 to $1\frac{1}{2}$. Bengali
Examiner,—Pundit Eshwar chandra Bidyasagar
Mahabharat

মুনি বলে মহাশয়, শুন শ্রীজনমেজয়, হেন মতে নিবসে পাণ্ডব।
একদিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত সর্বত্র গমন মনোভব ॥
জ্ঞেয় জ্ঞান যোগ যুজ্য অমর অসুর পূজ্য, চতুর্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, বিজ্ঞ যত ব্রহ্ম কর্ম, ব্রহ্মাণ্ড সৃজেন অনায়াসে ॥
পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি, কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে পিঙ্গল ফোঁটা, শ্রবণে কুণ্ডল উল্লাসিত ॥
মুখে হরি নাম স্রবে, ভুজস্থ বীণার রবে, গতি মন্দ যেমন মাতঙ্গ।
বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে, পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ ॥
শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রজ্বল অনল দীপ্তকায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন, সঙ্গে মুনি কত জন, উপনীত পাণ্ডব সভায় ॥
দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি, সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে।
আস্তে ব্যস্তে ধর্মসুত, সহোদরগণ যুত, প্রণাম করেন সে চরণে ॥
সুগন্ধ উদক দিয়া, পদযুগ পাখালিয়া, বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর, ভক্তিভাবে করেন পূজন ॥
তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে, কহ রাজা ভদ্র আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম, ধন উপার্জন ধর্ম, নির্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার ॥
সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ, এ সবার রাখ কি বচন।
একক অনেক সহ, বিচার কি না করহ, কার্য্যে না কি রাখ মুখ্যগণ ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য যথাযথ, ন্যায় মূলে কিন কত, না রাখত দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত, দুঃখত না পায় কোন জনা ॥
বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, আছে কি বন্দক বিনোদক।
অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রাহ্মণ মুখে, সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক ॥
রাজ্যের যতেক রাজা, পায় যথোচিত পূজা সবে অনুগতত তোমার।
ধান্য ধন বহুমত, উদক আয়ুধ যত, পূর্ণ করিয়াছত ভাণ্ডার ॥
প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ, বৈকালেতে ক্রীড়ারস, আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম কর্মে ধন ব্যয়, কর নিত্য উপচয়, পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ ॥

Answer the following questions :—

1. সর্বত্র গমন মনোজব—এ স্থলে মনোজব পদের অর্থ কি? এই পদে সমাস আছে কি না? যদি থাকে সে সমাসের নাম কি? যে দুই শব্দে সমাস হইয়াছে উহাদিগের পৃথক পৃথক অর্থ লিখ।

2. বিজ্ঞ যত ব্রহ্ম কর্ম— ইহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া লিখ।

3. পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি, কলহ গায়নে বড় প্রীত— এই শ্লোকার্ধের অর্থ কি?

4. বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে, পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ— বারিজ নয়ন যুগে এই স্থলে বারিজ শব্দের অর্থ কি? এই শব্দে ঐ অর্থ বুঝায় কেন? আর এই শব্দের সহিত নয়ন শব্দের কিরূপে অন্বয় হইবেক? নারদের নয়ন যুগে কি কারণে বারি বহিতেছে? পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ—ইহার অর্থ ও তাৎপর্য কি?

5. শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রজ্বল অনল দীপ্তকায়—এই শ্লোকার্ধের অর্থ লিখ, কোন স্থলে কি সমাস আছে বল? এবং যে কয়েকটী শব্দ আছে পৃথক পৃথক লিখিয়া প্রত্যেকের অর্থ লিখ।

6. পরিধান কৃষ্ণাজিন—কৃষ্ণাজিন পদের অর্থ কি? এক শব্দ কি দুই শব্দ? যদি দুই শব্দ হয় তবে পৃথক করিয়া লিখ, আর এই দুই শব্দে কি সমাস আছে, এবং সমাস হইয়া দুই শব্দের কি অবয়ব পরিবর্ত হইয়াছে বল?

7. দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি, সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে—এই স্থলে ঋষি পদে কোন কারক আছে বল? উঠিল ক্রিয়ার কর্তা কে ততক্ষণে এই পদের অর্থ কি?

8. আস্তে ব্যস্তে ধর্মসুত, সহোদরগণ যুত—ধর্মসুত শব্দে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে? এই শব্দে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় কেন?

9. সুগন্ধ উদক দিয়া— এ স্থলে 'দিয়া' ক্রিয়াপদ কি না?

10. যথা শিষ্ট ব্যবহার—এই অংশের অর্থ কি?

11. কার্যে না কি রাখ মুখ্যগণ- ইহার অর্থ লিখ।

12. তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত—ইহার অর্থ কি; আর শরণাগত পদে কি সমাস হইয়াছে বল? এবং এই দুই শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ লিখ।

13. বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, আছে কি বন্দক বিনোদক—দৈবজ্ঞ, বন্দক ও বিনোদক শব্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়া লিখ।

14. অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রাহ্মণ মুখে, সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক —এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ কি?

15. প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ—ইত্যাদি এই শ্লোকের অর্থ লিখ।

Pooroosh Parikhya.

গোদাবরী নদী তীরে বিশালা নামে এক নগরী তাহাতে সমুদ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন নাম। তিনি অত্যন্ত সরল হৃদয়। তাঁহাকে দেখিয়া সেই নগরবাসী কোন বঞ্চক বণিক্ রাজপুত্রের ধনাপহরণে চিন্তা করিল। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যেমত মৃগ সকল ব্যাঘ্রের ভক্ষণীয় হয়, এবং সর্পেরা গরুড়ের ভক্ষ্য হয়, এবং অন্য পক্ষিগণ সাঁচান পাক্ষির ভক্ষ্য হয়; সেই প্রকার সাধু লোক কুলোকের ভক্ষণীয় হয়। অতএব বণিক্ বিবেচনা করিল যে এই রাজকুমার অতি সুপ্রকৃতি ইহার ধন আমার সুখগ্রাহ্য হইবে, সেই কারণ ইহার উপাসনা করি। পরে বণিক সেই রাজপুত্রের সেবা করিতে লাগিল। তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জ্জনের প্রকৃতি প্রথম সুরসা পরিণামে বিরসা হয়। বণিক্ সেই প্রকৃতি দ্বারা সেবা করত নানোপসনাতে রাজকুমারকে বশীভূত করিল।

Answer the following questions :—

1. সাধুলোক কুলোকের ভক্ষণীয় হয়,—ইহার অর্থ ও তাৎপর্য কি?

2. ইহার ধন আমার সুখগ্রাহ্য হইবে—এ স্থলে সুখগ্রাহ্য শব্দের অর্থ কি বল?

3. তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জ্জনের প্রকৃতি প্রথম সুরসা পরিণামে বিরসা হয়—ইহার অর্থ ও তাৎপর্য লিখ।

Tuesday. April 6th Afternoon 2 to 5½ Bengali
Examiner,—Pundit Eshwar chandra Bidyasagar.

Translate the following passage into English :—

এক দিবস মাধব্য, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া আমার প্রাণ গেল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মৃগয়ায় যাইতে হয়, এবং এই মৃগ, ঐ বরাহ, এই শার্দ্দূল, এই করিয়া মধ্যাহ্ন কাল পর্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে পল্বল ও নদনদী সকল শুষ্ক প্রায় হইয়া আইসে; যে অল্প প্রমাণ জল

থাকে, তাহাও বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে অত্যন্ত কটু ও কষায় হইয়া উঠে। পিপাসা পাইলে সেই বিরস বারি পান করিতে হয়। আহারের সময় নিয়মিত নাই; প্রতিদিন অনিয়ত সময়েই আহার করিতে হয়। আহার সামগ্রীর মধ্যে শূল্য মাংসই অধিকাংশ, তাহাও প্রত্যহ সুচারুরূপ পাক করা হয় না। আর প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত অশ্ব পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব শরীর বেদনায় এরূপ অভিভূত হইয়া থাকে, যে রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না। রাত্রি শেষে নিদ্রার আবেশ হয়; কিন্তু ব্যাধগণের বন গমন কোলাহলে অতি প্রত্যুষেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়; ত্বরায় যে এই সকল ক্লেশের অবসান হইবেক তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সে দিবস আমরা পশ্চাৎ পড়িলে, একাকী এক মৃগের অনুসরণক্রমে তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে শকুন্তলা নাম্নী এক তাপস কন্যা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া অবধি আর নগর গমনের কথাও মুখে আনেন না। এই ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, একবারও চক্ষু মুদি নাই।

Translate the following passage into Bengali :—

"Having resided at Agra till there was no more to be learned, I travelled into Persia, where I saw many remains of ancient magnificence, and observed many new accommedations of life. The Persians are a nation eminently social, and their assemblies afforded me daity opportunities of remarking characters and manner, and of tracing human nature through all its variations From Persia, I travelled through Syria, and for three years resided in Palestine, where I conversed with great numbers of the Northern and Western nations of Europe ; the nations which are now in possession of all power and all knowledge, whose armies are irresistable, and whose fleets command the remotest parts of the globe. When I compared these men with the natives of our own kingdom, and these that surround us, they appeared almost another order of beings. In their countries it is difficult to wish for any thing that may not be obtained ; a thousand arts, of which never heard, are continually labouring for their convenience and pleasure ; and whatever their own climate has denied them, is supplied by their commerce."

(আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগের স্বর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ 'স্বর্ণলেখা' থেকে পুনর্মুদ্রিত)

বি. এ. পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পাশে উল্লিখিত বিষয়ের পরীক্ষক ছিলেন।—

English, Greek and Latin	W. Grapel, Esq., M. A., Presidency College.
Sanskrit, Bengali, Hindee and Orya	Pundit Iswarchandra Bidyasagar, Principal, Sanskrit College.
History and Geography.	F. B. Cowell, Esq , M. A , Professor, Free Church Institution.
Mathematics and Natural Philosophy	The Revd. T. Smith, Professor, Free Church Institution.
Natural History and Physical Sciences	H. S. Smith, Esq., B. A , Professor, Civil Engineering College.
Mental and Moral Sciences	The Revd. A. Duff. D. D.

১১ই ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে ভাইস চ্যান্সেলরের অভিভাষণ পাঠের পর, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসুকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেন এবং উভয়কে উপাধি প্রদত্ত হয়।

বি. এ. পাশ করার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর আইনের ছাত্ররূপে হাজির ছিলেন। তারপর তিনি চাকুরী নিয়ে চলে যান। চাকুরী কর কালীন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বি. এল. পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষায় পরীক্ষক ছিলেন—

Jurisprudence	Mr. C. J. Wilkinson.
Personal Rights and Status	Do.
The Law of Contracts	Do.
Rights and Property	Mr. W. Jardine, M. A., LL. M.
Proceedure and Evidence	Do.
Criminal Law	Do.

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষার আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন। এই শিক্ষা তাঁকে ইংরাজীয়ানায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। অবশ্য তিনি বিভিন্ন পরীক্ষায় যথেষ্ট মেধা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষার মোহ প্রথমে অবশ্য উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই 'Rajmohan's wife' নামক উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি লাভ করার চেষ্টা করেছিলেন।

তবে বাল্যকাল থেকেই বাংলা কবিতা রচনা ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকরে' তার প্রকাশ বাঙ্গালা চর্চার ধারাটিকে সজীব রেখেছিল। 'ললিতা তথা মানস' কাব্যও এই বাংলাচর্চারই ফল।

"সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলাসাহিত্যে হাতেখড়ি যাঁহাদের হস্তে হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম পৃথক্‌ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পঠদ্দশায় হুগলী কলেজের ছয়জন পণ্ডিত বাংলার অধ্যাপনা করিতেন, তন্মধ্যে সুপারিন্টেণ্ডিং পণ্ডিত অন্নদাচরণ তর্কপঞ্চানন কেবল কলেজ বিভাগে পড়াইতেন। বাকি পাঁচজনের মধ্যে দুইজন—গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি ও ভগবচ্চন্দ্র রায় বিশারদ সিনিয়র ডিভিসনে এবং তিন জন জুনিয়র ডিভিসনে পড়াইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নতম পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত বিশারদ ও গোপালচন্দ্র বিদ্যানিধি, এই দুই-জনের নিকট পড়েন নাই। তাঁহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন কাশীনাথ তর্কভূষণ। জুনিয়র ডিভিসনে প্রথম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক— ইতিহাস ও জ্ঞানার্ণব।"

"সিনিয়র ডিবিসনে উন্নীত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ ভগবচ্চন্দ্র রায় বিশারদের নিকট পড়েন। ইনি একজন প্রথিতনামা ব্যক্তি। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ইঁহার 'সুখবোধ' বাংলা ব্যাকরণ দেশের সর্বত্র পঠিত হইত।

"সিনিয়র ডিবিসন, তৃতীয় শ্রেণীর 'এ' সেক্‌শনের বাংলা পাঠ্যগ্রন্থ মাত্র একখানি—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' অনুবাদ-রচনাদির উপরই বিশেষ জোর ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনুবাদ ও রচনা ছাড়া পৃথক্ পাঠ্য-পুস্তক মোটেই ছিল না।

"প্রথম শ্রেণীতে দীর্ঘ দেড় বৎসরকাল বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণির নিকট পড়েন। ইনি কুমারহট্ট নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পুত্র। এই শ্রেণীর পাঠ্য ছিল—'বেতালপঞ্চবিংশতি' (২য় সং) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৭৭৪ শকাব্দা)।"

"সুপারিণ্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন অবসর গ্রহণের পূর্বেই ৪ঠা নবেম্বর ১৮৫৪ তারিখে (৫৯ ৬০ বৎসর বয়সে) হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন—তাঁহার নিয়োগ তারিখ ছিল ২০-৮-৩৬। বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে উঠিয়া তাঁহার নিকট পাঁচ মাস পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎস্থলে ২৫-১-৫৫ হইতে গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ই নিযুক্ত হন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলীর শিক্ষকদের মধ্যে শিরোমণির সংস্পর্শই দীর্ঘতম (অন্যূন তিন বৎসর) হইয়াছিল।"

"পরিশেষে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তৎকালে সংস্কৃত কলেজ ব্যতীত অন্য বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে কোথাও সংস্কৃত পড়েন নাই—ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের সাহায্যে বাড়ীতেই সংস্কৃত পড়িয়া ব্যুৎপন্ন হন।" (সাহিত্যসাধক চরিতমালা—২য় খণ্ড)।

ছাত্রজীবনেই নয়, ভবিষ্যৎ জীবনেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রচুর পড়াশোনা করতেন। দেশী ও বিদেশী কাব্য-সাহিত্য পাঠ, ইতিহাসগ্রন্থ ও বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞানস্পৃহা তৃপ্ত হত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর স্মৃতিচারণে বঙ্কিমচন্দ্রের পড়াশোনার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দান করেছেন—

"কাব্যে উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন।......সেকালে লোকে যে সকল ইংরাজি কাব্য পড়িত, সে সকলই বঙ্কিমবাবুর পড়া ছিল। বাঙ্গালায় তিনি কীর্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি কীর্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি বঙ্গদর্শনের তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল।......কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁর বেশি সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। "রিনাইসেন্স (Renissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালার আবার যাহাতে নবজীবন সঞ্চার হয় তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।"

(বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়: শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

বঙ্কিম-উপন্যাসে সমসাময়িক দেশ-কাল ও ঘটনার প্রভাব

দেশ ও কালচেতনা আধুনিকতার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে কোন লেখকই সমসাময়িক দেশ ও কালের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন না। দেশ ও কাল যেমন চিন্তাশীল ব্যক্তির চরিত্রগঠনে সাহায্য করে, তেমনি চিন্তাবিদরাও দেশ ও কালের পটভূমিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন একজন সচেতন শিল্পী। তাঁর শিল্পচেতনা শুধুমাত্র সৌন্দর্য সৃষ্টিতেই শেষ হয়নি, তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজসংস্কার ও উদ্দেশ্য প্রতিপাদনেরও চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্যকলায় সমসাময়িক দেশ-কাল ও ঘটনার প্রভাব অনুসন্ধান করা অসঙ্গত হবে না।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকাল। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পটভূমিকাটি নির্দেশ ক'রে নিলে বঙ্কিমের মানসিকতাটিকে বোঝার সুবিধা হয়। কিন্তু বঙ্কিমমানস গঠনে কেবলমাত্র তাঁর জন্ম তারিখ নয়, তার পূর্বকালের অনুসৃতিও লক্ষ্য করার বিষয়। তাই আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্যন্ত—'ইতিহাস-সংস্কৃতি-সাহিত্যের কালপঞ্জী'টি ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়ের "আধুনিক বাংলাসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত" থেকে উদ্ধৃত করে দিলাম।

১৭৪৩—পর্তুগীজ মিশনারীদের বাংলা গদ্যের অনুশীলন; মানোএল-দা-আসুম্পসাঁও প্রণীত (১) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৪৩), (২) Vocabulario em Idioma Bengalla, e Portuguez (১৭৪৩) লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত; দোম আন্তোনিও (বাঙালী খ্রীষ্টান) প্রণীত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' মুদ্রিত হয় নাই, ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশকের মধ্যে রচিত।

১৭৫৭, ২৩শে জুন—পলাশীর যুদ্ধ।

১৭৬৫—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণ।

১৭৭৪ (১৭৭২)—রামমোহন রায়ের জন্ম।

১৭৭৮—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হলহেডের The Grammar of the Bengal Language প্রকাশ।

১৭৮৪—উইলিয়ম জোন্‌স কর্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত—প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য মনীষার প্রথম সংযোগ।

১৭৯৩—লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent settlement) প্রবর্তন; উইলিয়ম কেরীর বাংলায় আগমন।

১৭৯৫—রুশীয় পর্যটক হেবেসিম লেবেডেফ কর্তৃক কলিকাতায় দুইখানি বাংলা (অনূদিত) নাটকের অভিনয় প্রযোজনা।

১৮০০—শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা; বাইবেলের কিয়দংশের ('মঙ্গল সমাচার মাতীয়ের রচিত' অর্থাৎ st. Mathew's Gospel) অনুবাদ; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮০১—ডেভিড হেয়ারের আগমন; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উইলিয়ম কেরীর বাংলা ও সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধানরূপে যোগদান; শ্রীরামপুর মিশন হইতে সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ ('ধর্ম্মপুস্তক'); রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' মুদ্রণ—(বাঙালী রচিত প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ)।

১৮০৮—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি' প্রকাশিত—ভারতীয়ের রচিত প্রথম আধুনিক ধরণের ইতিহাস।

১৮১২—কবি ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম।

১৮১৪-১৫—রামমোহনের কলিকাতায় আগমন ও আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠা; ১৮০১-১৮১৫ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান-প্রধান গদ্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৮১৭—হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা।

১৮১৮—কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজ প্রতিষ্ঠা; 'দিগ্‌দর্শন' (মাসিক), 'সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক), 'বাঙ্গাল গেজিটি' প্রকাশ।

১৮২০—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম।

১৮২১—রামমোহন কর্তৃক ইউনিটারিয়ান কমিটি স্থাপন; 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশ।

১৮২২—'সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকা' (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) প্রকাশ; 'কলিরাজার যাত্রা' ও 'নলদময়ন্তী' যাত্রাভিনয়।

১৮২৩—রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা; ইংরাজ সরকার কর্তৃক জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন স্থাপন।

১৮২৪—সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত; মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম।

১৮২৮—রামমোহন কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত।

১৮২৯—বেন্টিংক কর্তৃক আইনের দ্বারা সহমরণ প্রথা নিরোধ; নীলরতন হালদার সম্পাদিত 'বঙ্গদূত' প্রকাশ; ১৮১৫—২৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' 'বেদান্তসার', 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'প্রবর্তক-নিবর্তক-সম্বাদ' প্রভৃতি এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫), 'দূতীবিলাস' (১৮২৫) এবং 'নববিবি বিলাস' (১৮৩১?) প্রকাশ।

১৮৩০—রামমোহনের বিলাত যাত্রা, রক্ষণশীল হিন্দুদের দ্বারা 'ধর্মসভা' স্থাপিত।

১৮৩১—ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ; 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' মুদ্রণ।

১৮৩২—উইলসনের সম্পাদনায় বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'বিজ্ঞান-সেবধি'র প্রকাশ।

১৮৩৩—ব্রিস্টল নগরে রামমোহনের জীবনাবসান, শ্যামবাজারে নবীন বসুর বাটিতে বিদ্যাসুন্দর অভিনয়।

১৮৩৫—বেন্টিংকের আদেশে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃত; 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রকাশ।

১৮৩৬—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব।

১৮৩৮—বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম।

১৮৩৯—সংবাদ-প্রভাকর' দৈনিক পত্রে রূপান্তরিত—ভারতের প্রথম দৈনিক পত্র, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন।

১৮৪২—বিলাত হইতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ভারতপ্রেমিক টমসনের কলিকাতায় আগমন।

১৮৪৩—টমসনের উপদেশে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপন; অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৪৭—বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' মুদ্রিত।

১৮৫০—রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সংবাদ সুধাংশু' পত্রিকা প্রকাশিত।

১৮৫১—বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা; 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত) পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৫২—যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' নাটক (পাশ্চত্য আদর্শে লেখা প্রথম নাটক), হ্যানা মূলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (প্রথম উপন্যাসধর্মী আখ্যান) প্রকাশ।

১৮৫৩—বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' তারাচরণ শিকদারের পৌরাণিক নাটক 'ভদ্রার্জুন' ও হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (শেকস্পীয়রের 'Merchant of Venice' এর ভাবানুবাদ) প্রকাশ।

১৮৫৪—রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে সহজ ভাষায় 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ; কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' নাটক, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' এবং তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' মুদ্রণ।

১৮৫৬—বিধবা বিবাহ আইন পাস; উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' (প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি) প্রকাশ।

১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ; ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' মুদ্রিত।

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্তন।

১৮৫৮—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান', প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ) 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশ, সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ভিক্টোরিয়ার ভারত শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ।

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি এ পরীক্ষার প্রবর্তন।

১৮৫৯—নীল হাঙ্গামার প্রবলাকার ধারণ; মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক মুদ্রণ; কবি ঈশ্বরগুপ্তের জীবনাবসান।

১৮৬০—মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য,' দুইখানি প্রহসন ('একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'), দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এবং বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' প্রকাশ।

১৮৬১—মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক প্রকাশ; রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

* এগুলি লেখকের নিজস্ব সংযোজন

১৮৬২—মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতিকবিতা সংগ্রহ 'সঙ্গীত শতক' প্রকাশ।

১৮৬৩—স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) জন্ম।

১৮৬৫—বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ।

১৮৬৭—দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রকাশ ; হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন।

১৮৭১—কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রকাশ।

১৮৭২—বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ; গিরিশ-চন্দ্রাদির উদ্যোগে ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৩—মধুসূদনের মৃত্যু ; বিদ্যাসাগর কর্তৃক মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন—দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা প্রথম সার্থক চেষ্টা। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী' পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৭৪—ঢাকা হইতে কালীপ্রসন্ন ঘোষের সম্পাদনায় 'বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশ ; রাজনারায়ণ বসুর 'একাল ও সেকাল', অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' (আখ্যান কাব্য), রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা', তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' প্রকাশ।

১৮৭৫—হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' (১ম), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রকাশ ; বালক রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতা পাঠ।

১৮৭৬—নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণকল্পে Dramatic Performance Control Act বিধিবদ্ধ ; নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য প্রকাশ।

১৮৭৭—'ভারতী পত্রিকা' প্রকাশ।

১৮৭৯—বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' প্রকাশ।

১৮৮০—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্য প্রকাশ।

১৮৮১—নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার ; 'বঙ্গবাসী' (সাপ্তাহিক) প্রকাশ।

১৮৮২—'সঞ্জীবনী' (সাপ্তাহিক), রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশ।

১৮৮৩—'নব্যভারত' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ।

১৮৮৪—অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকা প্রকাশ।

১৮৮৫—জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৬—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণ ; নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' ('কুরুক্ষেত্র'—১৮৯৩, 'প্রভাস'—১৮৯৬), রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশ।

১৮৮৭—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্যসংগ্রহ 'অশ্রুকণা' প্রকাশ।

১৮৮৮—গোবিন্দচন্দ্র দাসের কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভাব, গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' প্রকাশ।

১৮৮৯—বিহারীলালের 'সাধের আসন', কামিনী রায়ের 'আলো-ছায়া', গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' প্রকাশ।

১৮৯০—সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সম্পাদনায় 'সাহিত্য' মাসিক পত্রের প্রকাশ।

১৮৯১—বিদ্যাসাগরের তিরোধান, হিতবাদী ও সাধনা পত্রিকার প্রকাশ।

১৮৯২—রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশ।

১৮৯৩—স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রা, শিকাগো শহরে ধর্মমহা-সম্মেলনে বক্তৃতা : মানকুমারী বসুর 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' প্রকাশ।

১৮৯৪—বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলালের জীবনাবসান।

এই ঘটনাবলীকে আমরা মোটামুটি পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করে নিতে পারি—(১) সমাজ (২) অর্থনীতি (৩) রাজনীতি (৪) শিক্ষা (৫) ধর্ম।

সামাজিক ঘটনার মধ্যে বহু বিবাহ রদ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, ইয়ংবেঙ্গল, মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবর্তন অন্যতম।

অর্থনৈতিক ঘটনার মধ্যে—দ্বৈত শাসনের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি প্রভাব পড়েছিল' ইংরাজশাসনের ফলে তার কতটা পরিবর্তন সাধিত হল এবং দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের কি পরিণাম ঘটল তার বিচার প্রয়োজন।

রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে সিপাহীবিদ্রোহের ফলশ্রুতি, ইংরাজশাসনের সুফল-কুফল ও আমাদের স্বদেশচেতনা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার স্বরূপ নির্ণয় অন্যতম।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ অথবা বর্জন এবং এই শিক্ষা আমাদের জাতীয়জীবনে কতখানি রেখাপাত করেছে তার বিচার প্রয়োজন।

ধর্মের ক্ষেত্রে—খ্রীষ্টান ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার এবং হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনে কতখানি অগ্রসর হওয়া সম্ভব, ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব—এইসব বিষয় গ্রহণযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতায় এই সমস্ত চিন্তা প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। উপন্যাস যেহেতু বাস্তবজীবনের অধিকতর নিকটবর্তী তাই তার মধ্যে

এগুলির প্রতিফলন ঘটা অসম্ভব নয়। তবে কেবলমাত্র উপন্যাসের মধ্যেই নয়, প্রবন্ধ এবং অন্যান্য রচনার মধ্যেও বঙ্কিমচেতনার সমর্থন পাওয়া যাবে।

বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে লেখক পুরোপুরি রোমান্সের স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেছেন। ইতিহাস সেখানে তাঁর কল্পনার মূলে জলসেচন করেছে। তাই বাস্তব জীবনসমস্যা সেখানে অনুপস্থিত।

দুর্গেশনন্দিনী

তবুও 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সংগে সংগে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে হাহাকার উঠল। তার কারণ জগৎসিংহ-তিলোত্তমার বিবাহপূর্ব প্রণয় বাংলাসাহিত্যে ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত। এ তো ইংরেজদের 'কোর্টশিপ'-এরই মত। জগৎসিংহ-তিলোত্তমা তো হিন্দু। তাই তাদের এ জাতীয় আচরণ নিন্দনীয় বই কি! তবে ইতিহাসের দূরত্ব, ব্যাপারটিকে অনেকটা দায়মুক্ত করে দিল।

'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমার কপালকুণ্ডলার প্রণয়ে তাই কি বঙ্কিমচন্দ্র আরো সতর্ক হলেন? অধিকারী কর্তৃক বিবাহ-সংঘটনের আগে

কপালকুণ্ডলা

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি। এমনকি কপালকুণ্ডলা কর্তৃক নবকুমারের বন্ধনমোচন পর্যন্ত যে নিছক পরোপকার-প্রবৃত্তি-প্রসূত এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

১ম খণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদ (আশ্রয়ে) এবং নবম পরিচ্ছেদ (দেবনিকেতনে) টি পড়লেই বোঝা যাবে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের বিবাহের উদ্যোগ আয়োজনে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। "নবকুমার কহিলেন. "আজি হইতে কপাল-কুণ্ডলা আমার ধর্মপত্নী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব। কে কন্যা সম্প্রদান করিবে?"

"ঘটকচূড়ামণির মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত দিনে জগদম্বার কৃপায় আমার কপালিনীর বুঝি গতি হইল।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি সম্প্রদান করিব।" অধিকারী নিজ শয়নকক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। একটি খুঙ্গীর মধ্যে কয়েক খণ্ড অতি জীর্ণ তালপত্র ছিল। তাহাতে তাঁহার তিথি নক্ষত্রাদি নির্দিষ্ট থাকিত। তৎসমুদায় সবিশেষ সমালোচনা করিয়া আসিয়া কহিলেন, "আজ যদিও বৈবাহিক দিন নহে—তথাচ বিবাহে কোন বিঘ্ন নাই। গোধূলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিব। তুমি অদ্য উপবাস করিয়া থাকিবে মাত্র। কৌলিক আচরণ সকল বাটী গিয়া করাইও। এক দিনের জন্য তোমাদিগকে লুকাইয়া রাখিতে পারি, এমন স্থান আছে। আজি

যদি তিনি আসেন, তবে তোমাদিগের সন্ধান পাইবেন না। পরে বিবাহান্তে কালি প্রাতে সপত্নীক বাটী যাইও।"

"নবকুমার ইহাতে সম্মত হইলেন। এ অবস্থায় যতদূর সম্ভব, ততদূর যথাশাস্ত্র কার্য হইল। গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিকপালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।" (কপালকুণ্ডলা ১/৯)।

লক্ষ্য রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত হলেও বিবাহ-সম্পর্কে হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতাকেই সমর্থন করেছেন। তাই অজ্ঞাতকুলশীলা কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করে বাড়ীতে আনা যে সহজ নয়, তার কৈফিয়ৎস্বরূপই তিনি পরিস্থিতিটাকে অন্যভাবে উপস্থিত করেছেন ২য় খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদে (স্বদেশে)। এবং বাড়ীতে সাদরে কপালকুণ্ডলার ঠাঁই হবার পরই বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন—"যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিল। অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলাকে লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই,—অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই আশঙ্কাতেই তিনি কপালকুণ্ডলার পাণিগ্রহণ প্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই, এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্য্যন্তও বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই; পরি-প্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল, জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপলমোচনে যেমন দুর্দম স্রোতোবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।" (কপালকুণ্ডলা ২/৫)।

কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের সুরুতে 'প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে'-র গঙ্গাসাগর-যাত্রীদের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র সে-চিত্র সমসাময়িক কাল থেকেই চয়ন করেছিলেন। বৃদ্ধ যাত্রীর ধম করতে গিয়েও উগ্র স্বভাবের পরিচয় দান, 'তিন কাল গিয়ে এককালে' ঠেকলে পরোপকারের জন্য পাইবারী হারে পুণ্যসঞ্চয়ে ইচ্ছা, অথচ অত্যুগ্র বিষয়াসক্তি (বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি, বেটারা বিশ-পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলে-পিলে সম্বৎসর খাবে কি?") প্রভৃতি আমাদের সমাজের বেশিরভাগ লোকের চরিত্রবৈশিষ্ট্য। স্বার্থপর গ্রামবাসীদের, পরোপকারী নবকুমারকে নির্জন বনবাসে নিক্ষেপ ক'রে, পলায়ন এবং গ্রামে গিয়ে বাক্‌চাতুরীর দ্বারা মিথ্যাকে সত্য

প্রতিপন্ন করার চেষ্টা শুধু হাস্যরস নয়, আমাদের জনতাচরিত্রের স্বরূপটিও প্রকাশ করেছে।

নবকুমার চরিত্রটিকে নবযুগের নায়করূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উপন্যাসের সূচনায় নবকুমারের উপস্থিত বুদ্ধি, যুক্তিশীলতা, পরোপকার প্রবৃত্তি-গুলি উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধের সংগে কথোপকথনে নবকুমারের উক্তি—"যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"—উনবিংশ শতাব্দীর মানবধর্ম চেতনারই প্রকাশ। নবকুমারের তীর্থদর্শনের বদলে সমুদ্রদর্শনের জন্য সাগরসঙ্গমে গমন—নিতান্তই আধুনিক মনোভঙ্গী।

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসকে সমাজ-সংস্পর্শ থেকে সযত্নে দূরে রেখেছেন। তাই এই উপন্যাসটি কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের ব্যক্তিগত জীবন-সমস্যাই থেকে গেছে।

তান্ত্রিকতার রূপটি ঠিক বঙ্কিম-সমকালের ব্যাপার না। এটিকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের কালের পরিপ্রেক্ষিতেই স্থাপন করেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাধু-সন্তদের প্রতি কৌতূহল যে কাপালিক চরিত্রের প্রেরণা, সেকথা আমরা তাঁর ব্যক্তিজীবন থেকেই জানতে পারি।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ('অবরোধে'-এ কপাল-কুণ্ডলা ও শ্যামাসুন্দরীর কথোপকথনে বাংলাদেশের একটি মধুর-পারিবারিক চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। অবশ্য তার মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর কুলীন স্বামীজনিত দুর্ভাগ্যের সংগে বঙ্কিম যে পরিচিত তার ইঙ্গিত আছে।

'মৃণালিনী' উপন্যাসে সমাজচিত্র বিশেষভাবে ফুটে ওঠেনি। তবে হেমচন্দ্রের সংগে মৃণালিনীর বিবাহপূর্ব সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] সংকুচিত ছিলেন। তাই ১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদে (পিঞ্জরের বিহঙ্গী) মণিমালিনীকে যখন মৃণালিনী তার গৃহত্যাগের বিবরণ দান করেছে, তখন মণিমালিনী বলেছে—"ঐ কথাটি মনে পড়িলেও আমার বড় অসুখ হয়। তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে?"

মৃণালিনী

তখন মৃণালিনী হেমচন্দ্রকে স্বামীরূপে স্বীকার করেছে এবং মণিমালিনীকে গোপনে একটি কথা বলেছে, যা শুনে "মণিমালিনী পরম প্রীতি প্রকাশ করিলেন।"

এই গোপন কথাটি মণিমালিনীর কাছে প্রকাশ না করলেও পরবর্তী পরিচ্ছেদে মৃণালিনী গিরিজায়ার কাছে প্রকাশ করেছে। সে কথাটি হল হেমচন্দ্রের সংগে মৃণালিনীর গোপন বিবাহ। এই বিবাহও শাস্ত্রমতে হয়েছিল। এমন কি মৃণালিনীর কন্যাসম্প্রদানের জন্য তার এক আত্মীয়াকেও কৌশলে আনান হয়েছে। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র বিবাহপূর্ব প্রণয় সম্পর্কে যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন। তাই নানারূপ কৈফিয়ৎ-এর অবতারণা করেছেন।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের কিছু ইঙ্গিত 'মৃণালিনী' উপন্যাসে পাওয়া যেতে পারে। মনোরমা যখন পশুপতিকে যবনের সংগে গোপন পরামর্শ করতে দেখেছে, তখন তার প্রশ্নের উত্তরে পশুপতি একপ করার কারণ প্রসঙ্গে বলেছে- "কেন, মনোরমা? তোমার জন্যই আমি এ মন্ত্রণা করিয়াছি। আমি এক্ষণে রাজভৃত্য, ইচ্ছামত কার্য করিতে পারি না। এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব; কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লালসেন কৌলীন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।" (মৃণালিনী ২/৯)।

কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তনে আমাদের সমাজে কোন ভাল ফল হয়নি, বঙ্কিম-চন্দ্রও তা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সেই কৌলীন্যপ্রথার সংগে সমাসনে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে বসান বঙ্কিমচন্দ্রের নেতিবাচক মনোভাবেরই প্রকাশ বলতে হবে।

মনোরমাও যে আদৌ বিধবা নয়, পশুপতির পরিণীতা স্ত্রী, সেকথাও পরে প্রকাশিত হয়েছে। ৩য় খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে হেমচন্দ্রের সংগে মনোরমার প্রেম সম্পর্কে যে কথোপকথন হয়েছে তাতে বিবাহিতা বা বিধবা নারীর অন্য পুরুষে আসক্তির সমালোচনা আছে। প্রণয়কে সেখানে অস্বীকার করা হয়নি, তবে ধর্মের কাছে প্রণয়কে ম্লান করা হয়েছে।

মনোরমার পশুপতির প্রতি অনুরাগের জন্য, হেমচন্দ্রের এই ধিক্কারের প্রত্যুত্তর দেবার জন্যই, মনোরমা সহমরণকালে হেমচন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছে।

সহমরণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বেশ অনুরাগ ছিল তা মনোরমার সহমরণের বর্ণনায় পরিস্ফুট—"পরে ব্রাহ্মণেরা মনোরমাকে যথাশাস্ত্র এই ভীষণ ব্রতে ব্রতী করাইলেন। এবং শাস্ত্রীয় আচারান্তে, মনোরমা ব্রাহ্মণের আনীত নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন। নব বস্ত্র পরিধান করিয়া, দিব্য পুষ্পমালা কণ্ঠে পরিয়া,

পশুপতির প্রজ্বলিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক, তদুপরি আরোহণ করিলেন। এবং সহাস্য আননে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া, নিদাঘ-সন্তপ্ত কুসুমকলিকার ন্যায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ করিলেন।"

(মৃণালিনী ৪/১৫)।

'মৃণালিনী' উপন্যাসেই প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচেতনা ও পরাধীনতার গ্লানিবোধ প্রকাশিত হয়েছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করে নিতে পারেন নি। তাই তিনি লিখেছেন—"ষষ্ট বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ্ উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্র-ফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক!" (মৃণালিনী ৪/৪)।

কিন্তু ইতিহাসের সত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই ব্যথিতচিত্তে লিখেছেন—

"সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম!" (মৃণালিনী ৮/২)। ইংরেজ আমলে পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের কামনা যে বঙ্কিমচন্দ্রের কত তীব্র ছিল তা এই খেদোক্তিতে প্রকাশিত।

জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বেশ অনুরাগ ছিল। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে মাধবাচার্য কর্তৃক ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাষদান উল্লেখযোগ্য। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পূর্বদেশে যবনদের পরাজয় ঘটবে! সেজন্যই হেমচন্দ্রকে গৌড়ে পাঠান হয়েছিল। কিন্তু গৌড়ে পরাজিত হলেও মাধবাচার্যের বিশ্বাস যায় নি। তাই তিনি হেমচন্দ্রকে বলেছেন—"বৎস! দুঃখিত হইও না। দৈবনির্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে। আমি যখন গণনা করিয়াছি যে, যবন পরাভূত হইবে, তখন নিশ্চয়ই জানিও, তাহারা পরাভূত হইবে। যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গৌড় নহে। প্রধান রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই গৌড় রাজ্যে অনেক করপ্রদ

রাজা আছেন ; তাঁহারা ত এখনও বিজিত হয়েন নাই। কে জানে যে, সকল রাজা একত্র হইয়া প্রাণপণ করিলে, যবন বিজিত না হইবে ?”

(মৃণালিনী ৪/১২)।

শেষপর্যন্ত মাধবাচার্য নির্দেশিত দৈববাণী যে সফল হয়েছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র পরিশিষ্টে উল্লেখ করেছেন—“হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপন করিয়া মাধবাচার্য কামরূপে গমন করিলেন। সেই সময়ে হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন। বখ্তিয়ার খিলজি পরাভূত হইয়া কামরূপ হইতে দূরীভূত হইলেন। এবং প্রত্যাগমনকালে অপমানে ও কষ্টে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। কিন্তু সে সকল ঘটনার বর্ণনা কর এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।”

(মৃণালিনী—পরিশিষ্ট)।

‘বিষবৃক্ষ’ বঙ্কিমচন্দ্রের তথা বাংলাসাহিত্যের যথার্থ প্রথম সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মাটির অনেক কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয়েছেন। সূর্যমুখী-নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর সমস্যা আমাদের পরিচিত পরিবেশেরই সমস্যা। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকেই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য সে পরিবেশ নিতান্ত সাধারণ মানুষের পরিবেশ নয়, উচ্চবিত্ত জমিদারশ্রেণীর মানুষের পরিবেশ। নগেন্দ্র দত্ত গোবিন্দপুরের জমিদার। তাঁর বিরাট প্রাসাদ ও ধনৈশ্বর্যের

বিষবৃক্ষ

যে বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা তৎকালীন জমিদারদের আড়ম্বরপ্রিয়তার যথার্থ চিত্র। সেকালে নগেন্দ্রের মত প্রজাবৎসল, জনপ্রিয় জমিদারও যেমন ছিলেন, তেমনি কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তি জন্মানোর পর নগেন্দ্রের জমিদারীকাজে অবহেলার সুযোগে গোমস্তা-নায়েবদের অত্যাচারে প্রজাদের অস্থিরতার যে চিত্র দেওয়া হয়েছে তাও সে যুগে দুর্লভ ছিল না। দেবেন্দ্রর সংগে নগেন্দ্রের শরীকি মামলায় দেবেন্দ্রদের অবস্থার অবনতি ও সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য কুৎসিৎ কন্যার সংগে বিবাহের ঘটনাও সেকালের জমিদার সমাজে দুর্লভ ছিল না।

‘বিষবৃক্ষ’ গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সমস্ত জীবনচিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে অল্প কথায় তৎকালীন মানুষের জীবনযাত্রা সুন্দর ফুটে উঠেছে। নগেন্দ্রনাথের কলিকাতায় নৌকাযাত্রাকালে পার্শ্ববর্তী দৃশ্যাবলীর বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র এভাবে দিয়েছেন—“জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে

লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘষিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন—মধ্যবয়স্কারা শিবপূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক-বালিকারা চেঁচাইতেছে কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদ্রিতনয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পালাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভাল মানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠনিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে সাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া, রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে—পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না,—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।" (বিষবৃক্ষ—১/১০)।

আর একটি সার্থক ছবি—"বর্ষা গেল। শরৎকাল আসিল। শরৎকালও যায়। মাঠের জল শুকাইল। ধান সকল ফুলিয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীর পদ্ম ফুরাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে বৃক্ষপল্লব হইতে শিশির ঝরিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে মাঠে মাঠে ধূমাকার হয়। এমত কালে কার্তিক মাসের একদিন প্রাতঃকালে মধুপুরের রাস্তার উপরে একখানি পাল্কী আসিল। পল্লীগ্রামে পাল্কী দেখিয়া দেশের ছেলে খেলা ফেলে পাল্কীর ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের ঝি বউ মাগী ছাগী জলের কলসী কাঁকে নিয়া একটু তফাৎ দাঁড়াইল—কাঁকের কলসী কাঁকেই রহিল—অবাক্ হইয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল—আর

আর স্ত্রীলোকেরা ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। চাষারা কার্তিক মাসে ধান কাটিতেছিল—ধান ফেলিয়া, হাতে কাস্তে, মাথায় পাগড়ী, হাঁ করিয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল। গ্রামের মণ্ডল মাতব্বরলোকে অমনি কমিটিতে বসিয়া গেল। পাল্কীর ভিতর হইতে একটা বুটওয়ালা পা বাহির হইয়াছিল। সকলেই সিদ্ধান্ত করিল, সাহেব আসিয়াছে—ছেলেরা ধ্রুব জানিত, বৌ আসিয়াছে।

পাল্কীর ভিতর হইতে নগেন্দ্রনাথ বাহির হইলেন। অমনি তাঁহাকে পাঁচ সাত জন সেলাম করিল—কেন না, তাঁহার পেণ্টলুন পরা, টুপি মাথায় ছিল! কেহ ভাবিল, দারোগা, কেহ ভাবিল, বরকন্দাজ সাহেব আসিয়াছেন।"

(বিষবৃক্ষ—৩৭ পরি.)

নগেন্দ্রের অন্দরমহলের বর্ণনার মধ্যে সেকালের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের অনুগৃহীতদের আচার-ব্যবহারের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।—

"এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্দর মহল, তাহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্য্য। তন্মধ্যে কেবল তিনি, তাঁহার ভার্য্যা ও তাঁহাদের নিজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দাসীরা থাকিত। এবং তাঁহাদের নিজ ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী থাকিত। এই মহল নূতন, নগেন্দ্রের নিজের প্রস্তুত; তাহার নির্মাণ অতি পরিপাটি। তাহার পাশে পূজার বাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্দর। তাহা পুরাতন, কুনির্মিত; ঘরসকল অনুচ্চ, ক্ষুদ্র এবং অপরিষ্কৃত। এই পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয়কুটুম্ব-কন্যা, মাসী, মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায়, রাত্রি দিবা কল কল করিত। এবং অনুক্ষণ নানা প্রকার চীৎকার, হাস্য পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন, "জল আন", "কাপড় দে", "ভাত রাঁধলে না", "ছেলে খায় নাই", "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ীর পশ্চাতে রন্ধনশালা। সেখানে আরো জাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জাল দিয়া পা গোট করিয়া, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন। কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে ধুঁয়ায় বিগলিতাশ্রুলোচনা হইয়া, বাড়ীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছেন, এবং সে যে টাকা চুরি করিবার মানসেই ভিজা কাঠ কাটাইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু

মুদিয়া, দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভঙ্গি করিয়া আছেন, কেন না, তপ্ত তৈল ছিটকাইয়া তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে, কেহ বা স্নানকালে বাহুতৈলাক্ত, অসংযমিত কেশরাশি চূড়ার আকারে সীমন্তদেশে বাঁধিয়া ডালে কাটি দিতেছেন—যেন রাখাল, পাঁচনীহস্তে গোরু ঠেঙ্গাইতেছে। কোথাও বা বড় বঁটি পাতিয়া বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ, কুমড়া, বার্ত্তাকু, পটল, শাক কুটিতেছে; তাতে ঘস্ ঘস্ কচ্ কচ্ শব্দ হইতেছে, মুখে পাড়ার নিন্দা, মুনিবের নিন্দা, পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে। এবং গোলাপী অল্প বয়সে বিধবা হইল, চাঁদির স্বামী বড় মাতাল, কৈলাসীর জামাইয়ের বড় চাকরি হইয়াছে—সে দারোগার মুহুরী; গোপাল উড়ের যাত্রার মত পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই, পার্ব্বতীর ছেলের মত দুষ্ট ছেলে আর বিশ্ব বাঙ্গালায় নাই, ইংরেজেরা না কি রাবণের বংশ, ভগীরথ গঙ্গা এনেছেন, ভট্চার্য্যিদের মেয়ের উপপতি শ্যাম বিশ্বাস, এইরূপ নানা বিষয়ের সমালোচনা হইতেছে। কোন কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী, প্রাঙ্গণে এক মহাস্থরূপী বঁটি ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া, মৎস্যজাতির সদ্যঃপ্রাণসংহার করিতেছেন, চিলেরা বিপুলাঙ্গীর শরীরগৌরব ও হস্তলাঘব দেখিয়া ভয়ে আগু হইতেছে না, কিন্তু দুই একবার ছোঁ মারিতেও ছাড়িতেছে না! কোন পক্বকেশা জল আনিতেছে, কোন ভীমদশনা বাটনা বাটিতেছে। কোথাও বা ভাণ্ডারমধ্যে, দাসী, পাচিকা এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিনী এই তিন জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ভাণ্ডারকর্ত্রী তর্ক করিতেছেন যে, যে ঘৃত দিয়াছি, তাহাই ন্যায্য খরচ—পাচিকা তর্ক করিতেছে যে, ন্যায্য খরচে কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী তর্ক করিতেছে যে, যদি ভাণ্ডারের চাবি খোলা থাকে, তাহা হইলে আমরা কোনরূপে কুলাইয়া দিতে পারি। ভাতের উমেদারীতে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে, কাঙ্গালী, কুক্কুর বসিয়া আছে। বিড়ালেরা উমেদারী করে না—তাহারা অবকাশমতে "দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ" করত বিনা অনুমতিতেই খাদ্য লইয়া যাইতেছে। কোথাও অনধিকার প্রবিষ্টা কোন গাভী লাউয়ের খোলা, বেগুনের ও পটলের বোঁটা এবং কলার পাত অমৃতবোধে চক্ষু বুজিয়া চর্বন করিতেছে।"

(বিষবৃক্ষ: ৭ম পরিচ্ছেদ)

নবম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী অন্তঃপুরের যে সার্থক চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তাই এই পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতযোগ্য বলে মনে করি।—

"বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গৃহে কিছুদিন কালতিপাত করিল। একদিন মধ্যাহ্নের পর পৌরস্ত্রীরা সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় তাহারা অনেকগুলি, সকলে স্ব স্ব মনোমত গ্রাম্যস্ত্রীসুলভ কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল। তাহাদের মধ্যে অনতীতবাল্যা কুমারী হইতে পলিতকেশা বর্ষীয়সী পর্যন্ত সকলেই ছিল। কেহ চুল বাঁধাইতেছিল, কেহ চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, কেহ মাথা দেখাইতেছিল, কেহ মাথা দেখিতেছিল, এবং "উঁ উঁ" করিয়া উকুন মারিতেছিল, কেহ পাকা চুল তুলাইতেছিল, কেহ ধান্যহস্তে তাহা তুলিতেছিল। কোন সুন্দরী স্বীয় বালকের জন্য বিচিত্র কাঁথা শিয়াইতেছিলেন, কেহ বালককে স্তন্যপান করাইতেছিলেন। কোন সুন্দরী চুলের দড়ি বিনাইতেছিলেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিলেন, ছেলে মুখব্যাদন করিয়া তিনগ্রামে সপ্তস্বরে রোদন করিতেছিল। কোন রূপসী কার্পেট বুনিতেছিলেন, কেহ থাবা পাতিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশলা কাহারও বিবাহের কথা মনে করিয়া পিঁড়িতে আলপনা দিতেছিলেন, কোন সদগ্রন্থরসগ্রাহিণী বিদ্যাবতী দাশুরায়ের পাঁচালী পড়িতেছিলেন। কোন বর্ষীয়সী পুত্রের নিন্দা করিয়া শ্রোত্রীবর্গের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, কোন রসিকা যুবতী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে স্বামীর রসিকতার বিবরণ সখীদের কানে কানে বলিয়া বিরহিনীর মনোবেদনা বাড়াইতেছিলেন। কেহ গৃহিণীর নিন্দা, কেহ কর্ত্তার নিন্দা, কেহ প্রতিবাসীদিগের নিন্দা করিতেছিলেন; অনেকেই আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। যিনি সূর্য্যমুখী কর্তৃক প্রাতে নিজবুদ্ধিহীনতার জন্য মৃদুভর্ৎসিতা হইয়াছিলেন তিনি আপনার বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্যের অনেক উদাহরণ প্রয়োগ করিতেছিলেন যাঁহার রন্ধনে প্রায় লবণ সমান হয় না, তিনি আপনার পাকনৈপুণ্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছিলেন। যাঁহার স্বামী গ্রামের মধ্যে গণ্ডমূর্খ, তিনি সেই স্বামীর অলৌকিক পাণ্ডিত্য কীর্ত্তন করিয়া সঙ্গিনীকে বিস্মিতা করিতেছিলেন যাঁহার পুত্রকন্যাগুলি এক একটি কৃষ্ণবর্ণ মাংসপিণ্ড, তিনি রত্নগর্ভা বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন। সূর্য্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তিনি কিছু গর্ব্বিত, এ সকল সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না এবং তিনি থাকিলে অন্য সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত; তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা বলিত না। কিন্তু কুন্দনন্দিনী এক্ষণে এই সম্প্রদায়েই থাকিত, এখনও ছিল। সে একটি বালককে তাহার মাতার অনুরোধে ক, খ, শিখাইতেছিল। কুন্দ বলিয়া দিতেছিল, তাহার ছাত্র অন্য বালকের

করস্থ সন্দেশের প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল ; সুতরাং তাহার বিশেষ বিদ্যালাভ হইতেছিল।

এমত সময়ে সেই নারীসভামণ্ডলে "জয় রাধে!" বলিয়া এক বৈষ্ণবী আসিয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রের ঠাকুর বাড়ীতে নিত্য অতিথিসেবা হইত, এবং তদ্ব্যতীত সেইখানেই প্রতি রবিবারে তণ্ডুলাদি বিতরণ হইত, ইহা ভিন্ন ভিক্ষার্থ বৈষ্ণবী কি কেহ অন্তঃপুরে আসিতে পাইত না। এইজন্য অন্তঃপুর মধ্যে "জয় রাধে" শুনিয়া একজন পুরবাসিনী বলিতেছিল, "কে রে মাগী বাড়ীর ভিতর? ঠাকুরবাড়ী যা।" কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে সে মুখ ফিরাইয়া বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কথা আর সমাপ্ত করিল না। তৎপরিবর্ত্তে বলিল, "ও মা! এ আবার কোন্ বৈষ্ণবী গো!"

সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, বৈষ্ণবী যুবতী, তাহার শরীরে আর রূপ ধরে না। সেই বহুসুন্দরীশোভিত রমণীমণ্ডলেও, কুন্দনন্দিনী ব্যতীত তাহা হইতে সমধিক রূপবতী কেহই নহে। তাহার স্ফুরিত বিম্বাধর, সুগঠিত নাসা, বিস্ফারিত ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু চিত্রলেখাবৎ ভ্রূযুগ, নিটোল ললাট, বাহুযুগলের মৃণালবৎ গঠন এবং চম্পকদামবৎ বর্ণ, রমণীকুলদুর্লভ। কিন্তু সেখানে যদি কেহ সৌন্দর্য্যের সদ্বিচারক থাকিত, তবে সে বলিত যে, বৈষ্ণবীর গঠনে কিছু লালিত্যের অভাব। চলন ফেরন এ সকল পৌরুষ।

বৈষ্ণবীর নাকে রসকলি, মাথায় টেড়ি কাটা, পরণে কালাপেড়ে সিমলার ধুতি, হাতে একটি খঞ্জনী। হাতে পিত্তলের বালা, এবং তাহার উপরে জলতরঙ্গ চুড়ি।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, "হ্যাঁ গা, তুমি কে গা?"

বৈষ্ণবী কহিল, "আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী। মা ঠাকুরাণীরা গান শুনবে?"

তখন "শুনবো গো, শুনবো!" এই ধ্বনি চারিদিকে আবালবৃদ্ধার কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল। তখন খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া ঠাকুরাণীদিগের কাছে বসিল। সে যেখানে বসিল, সেইখানে কুন্দ ছেলে পড়াইতেছিল। কুন্দ অত্যন্ত গীতপ্রিয়, বৈষ্ণবী গান করিবে শুনিয়া আর একটু সন্নিকটে আসিল। তাহার ছাত্র সেই অবকাশে উঠিয়া গিয়া সন্দেশভোজী বালকের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া আপনি ভক্ষণ করিল।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি গায়িব?" তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন; কেহ চাহিলেন "গোবিন্দ অধিকারী"—কেহ "গোপালে উড়ে"। যিনি দাশরথির পাঁচালী পড়িতেছিলেন, তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা "সখীসংবাদ" এবং "বিরহ" বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন, "গোষ্ঠ"—কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, "নিধুর টপ্পা গাইতে হয় ত গাও—নহিলে শুনিব না।" একটি অস্ফুটবাক্য বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল, "তোলা দাস্‌নে দাস্‌নে দূতি।"

বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়া কুন্দের প্রতি বিদ্যুদ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা—তুমি কিছু ফরমাস করিলে না?" কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যার কাণে কাণে কহিল, "কীর্ত্তন গাইতে বল না!"

বয়স্যা তখন কহিল, "ওগো কুন্দ কীর্ত্তন করিতে বলিতেছে গো!" তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবী কীর্তন করিতে আরম্ভ করিল। সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী তাহার কথা রাখিল দেখিয়া কুন্দ বড় লজ্জিতা হইল।

হরিদাসী বৈষ্ণবী প্রথমে খঞ্জনীতে দুই একবার মৃদু মৃদু যেন ক্রীড়াচ্ছলে অঙ্গুলি প্রহার করিল। পরে আপন কণ্ঠমধ্যে অতি মৃদু মৃদু নববসন্তপ্রেরিতা এক ভ্রমরীর গুঞ্জনবৎ সুরের আলাপ করিতে লাগিল—যেন লজ্জাশীলা বালিকা স্বামীর নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তি জন্য মুখ ফুটাইতেছে। পরে অকস্মাৎ সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ খঞ্জনী হইতে বাদ্যবিদ্যাবিশারদের অঙ্গুলিজনিত শব্দের ন্যায় মেঘগম্ভীর শব্দ বাহির হইল, এবং তৎসঙ্গে শ্রোত্রীদিগের শরীর কণ্টকিত করিয়া, অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠগীতিধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন রমণীমণ্ডল বিস্মিত, বিমোহিতচিত্তে শুনিল যে, সেই বৈষ্ণবীর অতুলিত কণ্ঠ, অট্টালিকা পরিপূর্ণ করিয়া আকাশমার্গে উঠিল। মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ সেই গানের পরিপাট্য কি বুঝিবে? বোদ্ধা থাকিলে বুঝিত যে, এই সর্বাঙ্গীণতাললয়স্বরপরিশুদ্ধ গান কেবল সুকণ্ঠের কার্য নহে। বৈষ্ণবী যেই হউক, সে সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ সুশিক্ষিতা এবং অল্প বয়সে তাহার পারদর্শী।

বৈষ্ণবী গীত সমাপন করিলে, পৌরস্ত্রীগণ তাহাকে গায়িবার জন্য পুনশ্চ

অনুরোধ করিল। তখন হরিদাসী সতৃষ্ণবিলোলনেত্রে কুন্দনন্দিনীর মুখপানে চাহিয়া পুনশ্চ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল,

"শ্রীমুখপঙ্কজ—দেখ্‌বো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।
মানেব দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধা কথা কোয়ে,
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখ্‌বো তোমায় নয়ন ভরে,
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে।
যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী,
তখন নয়নজলে আপনি ভাসি।
তুমি যদি না চাও ফিরে,
তবে যাব সেই যমুনাতীরে,
ভাঙ্গ্‌বো বাঁশী তেজ্‌বো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
ব্রজের সুখ, রাই, দিয়ে জলে,
বিকাইনু পদতলে,
এখন চবণনূপুব বেঁধে গলে,
পশিব যমুনা-জলে।"

গীত সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবী কুন্দনন্দিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল, "গীত গাইয়া আমার মুখ শুকাইতেছে। আমায় একটু জল দাও।"

কুন্দ পাত্রে করিয়া জল আনিল। বৈষ্ণবী কহিল, "তোমাদিগের পাত্র আমি ছুঁইব না। আসিয়া আমাব হাতে ঢালিয়া দাও, আমি জাতি বৈষ্ণবী নহি।"

ইহাতে বুঝাইল, বৈষ্ণবী পূর্বে কোন অপবিত্রজাতীয়া ছিল, এক্ষণে বৈষ্ণবী হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া কুন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল ফেলিবার যে স্থান সেইখানে গেল। যেখানে অন্য স্ত্রীলোকেরা বসিয়া রহিল, সেখান হইতে ঐ স্থান এরূপ ব্যবধান যে, তথায় মৃদু মৃদু কথা কহিলে কেহ শুনিতে পায় না।

সেই স্থানে গিয়া কুন্দ বৈষ্ণবীর হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। ধুইতে ধুইতে অন্যের অশ্রুতস্বরে বৈষ্ণবী মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "তুমি নাকি গা কুন্দ ?"

কুন্দ বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা ?"

বৈ। তোমার শাশুড়ীকে কখন দেখিয়াছ ?

কু। না।

কুন্দ শুনিয়াছিল যে, তাহার শাশুড়ী ভ্রষ্টা হইয়া দেশত্যাগিনী হইয়াছিল।

বৈ। তোমার শাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বাড়ীতে আছেন, তোমাকে একবার দেখ্‌বার জন্য বড়ই কাঁদিতেছেন—আহা! হাজার হোক্ শাশুড়ী। সে ত আর এখানে আসিয়া তোমাদের গিন্নীর কাছে সে পোড়ার মুখ দেখাতে পারবে না—তা তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে দেখা দিয়ে এস না ?

কুন্দ সরলা হইলেও, বুঝিল যে শাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকারই অকর্ত্তব্য। অতএব বৈষ্ণবীর কথায় কেবল ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

কিন্তু বৈষ্ণবী ছাড়ে না—পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল। তখন কুন্দ কহিল, "আমি গিন্নীকে না বলিয়া যাইতে পারিব না।"

হরিদাসী মানা করিল। বলিল, "গিন্নীকে বলিও না। যাইতে দিবে না। হয়ত তোমার শাশুড়ীকে আনিতে পাঠাইবে। তাহা হইলে তোমার শাশুড়ী দেশ ছাড়া হইয়া পালাইবে।"

বৈষ্ণবী যতই দার্ঢ্য প্রকাশ করুক, কুন্দ কিছুতেই সূর্য্যমুখীর অনুমতি ব্যতীত যাইতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা হরিদাসী বলিল, "আচ্ছা তবে তুমি গিন্নীকে ভাল করিয়া বলিয়া রেখ। আমি আর একদিন আসিয়া লইয়া যাইব, কিন্তু দেখো, ভাল করিয়া বলো; আর একটু কাঁদাকাটা করিও; নহিলে হইবে না।"

কুন্দ ইহাতে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু বৈষ্ণবীকে হাঁ কি না, কিছু বলিল না। তখন হরিদাসী হস্তমুখপ্রক্ষালন সমাপ্ত করিয়া অন্য সকলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পুরস্কার চাহিল। এমত সময়ে সেইখানে সূর্য্যমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাজে কথা একেবারে বন্ধ হইল, অল্পবয়স্করা সকলেই এক একটি কাজ লইয়া বসিল।

সূর্য্যমুখী হারিদাসীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কে গা ? তখন নগেন্দ্রের এক মামী কহিলেন, "ও একজন বৈষ্ণবী গান করিতে

এসেছে। গান যে সুন্দর গায়! এমন গান কখন শুনিনে মা। তুমি একটি শুনিবে? গা ত গা হরিদাসি। একটি ঠাকরুণ বিষয় গা।"

হরিদাসী এক অপূর্ব শ্যামাবিষয় গাইলে সূর্য্যমুখী তাহাতে মোহিতা ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে পুরস্কার প্রদানপূর্বক বিদায় করিলেন।

বৈষ্ণবী প্রণাম করিয়া এবং কুন্দের প্রতি আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বিদায় লইল। সূর্য্যমুখী চক্ষের আড়ালে গেলেই সে খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু গাইতে গাইতে গেল,

"আয় রে চাঁদের কণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব সোণা।
আতর দিব শিশি ভোরে,
গোলাপ দিব কার্বা করে,
আর আপনি সেজে বাটা ভোরে,
দিব পানের দোনা।"

বৈষ্ণবী গেলে স্ত্রীলোকেরা অনেকক্ষণ কেবল বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গ লইয়াই রহিল। প্রথমে তাহার বড় সুখ্যাতি আরম্ভ হইল। পরে ক্রমে একটু খুঁত বাহির হইতে লাগিল। বিরাজ বলিল, 'তা হোক, কিন্তু নাকটা একটু চাপা।' তখন বামা বলিল, "রঙটা বাপু বড় ফেকাসে।" তখন চন্দ্রমুখী বলিল, "চুলগুলো যেন শণের দড়ি।" তখন চাঁপা বলিল, "কপালটা একটু উঁচু।" কমলা বলিল, "ঠোঁট দুখানা পুরু।" হারাণী বলিল, "গড়নটা বড় কাটকাট।" প্রমদা বলিল, "মাগীর বুকের কাছটা যেন যাত্রার সখীদের মত, দেখে ঘৃণা করে।" এইরূপে সুন্দরী বৈষ্ণবী শীঘ্রই অদ্বিতীয়া কুৎসিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তখন ললিতা বলিল, "তা দেখিতে যেমন হউক, মাগী গায় ভাল।" তাহাতেও নিস্তার নাই। চন্দ্রমুখী বলিল, "তাই বা কি, মাগীর গলা মোটা।" মুক্তকেশী বলিল, "ঠিক বলেছ—মাগী যেন ষাঁড় ডাকে।" অনঙ্গ বলিল, "মাগী গান জানে না, একটাও দাশুরায়ের গান গাইতে পারিল না।" কনক বলিল, "মাগীর তালবোধ নাই।" ক্রমে প্রতিপন্ন হইল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী কেবল যে যার পর নাই কুৎসিতা, এমত নহে—তাহার গানও যার পর নাই মন্দ।"

—(বিষবৃক্ষ—নবম পরিচ্ছেদ)

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর দু'টি আন্দোলনের প্রসঙ্গ আছে। একটি হল ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যটি বিধবাবিবাহ সম্পর্কে।

তারাচরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"তখন তারাচরণ এক প্রকার মোটামুটি ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কর্মকার্য্যে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সূর্য্যমুখীর পিতৃপরলোকের পর নিরাশ্রয় হইয়া, তিনি সূর্য্যমুখীর কাছে গেলেন। সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রকে প্রবৃত্তি দিয়া গ্রামে একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন। তারাচরণ তাহাতে মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে গ্রাণ্ট ইন্ এডের প্রভাবে গ্রামে গ্রামে তেড়িকাটা, টপ্পাবাজ নিরীহ ভালমানুষ মাষ্টার বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর "মাষ্টার বাবু" দেখা যাইত না। সুতরাং তারাচরণ একজন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তিনি Citizen of the world এবং spectator পড়িয়াছিলেন, এবং তিনি বুক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথাও বাজারে রাষ্ট্র ছিল। এই সকল গুণে তিনি দেবীপুরনিবাসী জমিদার দেবেন্দ্র বাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদমধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিকবিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন, এবং "হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর!" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা তত্ত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন। মুখে সর্বদা বলিতেন, "তোমরা ইটপাটখেলের পূজা ছাড়, খুড়ী, জ্যেঠাইমার বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পূরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।" স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবরালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য। এ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই, সূর্য্যমুখী তাঁহার বিবাহের জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতার কুলত্যাগের কথা গোবিন্দপুরে প্রচার হওয়ায় কোন ভদ্র কায়স্থ তাঁহাকে কন্যা দিতে সম্মত হয় নাই। অনেক ইতর কায়স্থের কালো কুৎসিৎ কন্যা পাওয়া গেল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তারাচরণকে ভ্রাতৃবৎ ভাবিতেন, কি প্রকারে ইতর লোকের কন্যাকে ভাইজ বলিবেন, এই ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। কোন ভদ্র কায়স্থের সুরূপা কন্যার সন্ধানে ছিলেন, এমত কালে নগেন্দ্রের পত্রে কুন্দনন্দিনীর রূপগুণের কথা জানিয়া তাহারই সঙ্গে তারাচরণের বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন।"

—(বিষবৃক্ষ—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

দেবেন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে—"কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফর্মর্ বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। তারাচরণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম জুটিল, বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটি ফিমেল স্কুলের জন্যও মধ্যে মধ্যে আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী করিতে পারিলেন না। বিধবাবিবাহে বড় উৎসাহ। এমন কি, দুই চারিটা কাওরা তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বরকন্যার গুণে। জেনানা রূপ কারাগারের শিকল ভাঙ্গার বিষয়ে তারাচরণের সঙ্গে তাঁহার একমত—উভয়েই বলিতেন মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবু বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—কিন্তু সে বাহির করার অর্থবিশেষ।"

— (বিষবৃক্ষ—দশম পরিচ্ছেদ)

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত দু'টি উদ্ধৃতি থেকে ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মদের সম্পর্কে খুব একটা শ্রদ্ধার ভাব মনে জাগে না। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, উদ্ধৃতি [illegible] অসংযমী পাত্রপাত্রীর চরিত্রের আবরণে পরিবেশিত করা হয়েছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র পর্দানশীন প্রথা সমর্থন না করলেও, মেয়েদের পরপুরুষের সঙ্গে যথেচ্ছ মেলামেশার সমর্থক ছিলেন না বলেই মনে হয়। তাই তারাচরণের মত সংস্কারবাদীদের দেবেন্দ্রর সঙ্গে নিজের স্ত্রীর পরিচয় ঘটানোয় [illegible] দিয়েছিলেন।

বিধবাবিবাহ সমস্যা, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের মূল সমস্যা। বিধবা কুন্দনন্দিনীর জীবনে [illegible] করেছিল তার ফল সুখময় হয়নি। অন্যদিক থেকে এটিকে বহু বিবাহের সমস্যারূপেও চিহ্নিত করা যায়।

বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত মন্তব্যগুলি প্রথমে লিপিত করা যেতে পারে। সূর্যমুখী কমলমণিকে একটি চিঠিতে লিখেছে—'আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে? এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্ক-বিতর্ক হয়। সে দিন ন্যায়-কচকচি ঠাকুর, মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র, বিধবাবিবাহের পক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটি টাকা লইয়া যায়। তাহার পরদিন সার্বভৌম ঠাকুর বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের

জন্য আমি পাঁচ ভরির সোণার বালা গড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বড় বিধবাবিবাহের দিকে নয়।”

—(বিষবৃক্ষ—একাদশ পরিচ্ছেদ)

শ্রীশচন্দ্রকে লিখিত নগেন্দ্রের সম্পূর্ণ পত্রটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—“ভাই। আমাকে ঘৃণা করিও না—অথবা সে ভিক্ষাতেই বা কাজ কি? ঘৃণাস্পদকে অবশ্য ঘৃণা করিবে। আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব—তাহার বড় বাকীও নাই।

“এ কথা বলার পর আর বোধ হয় কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। তোমরাও বোধ হয় ইহার পর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কথা বলিবে না। যদি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি।

“যদি কেহ বলে যে বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে? আর যদি বল শাস্ত্র সম্মত হইলেও ইহা সমাজসম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব, তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি? তথাপি আমি তোমাদিগের মনোরক্ষার্থে এ বিবাহ গোপন রাখিব—আপাততঃ কেহ জানিবে না।

“তুমি এ সকল আপত্তি করিবে না। তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিসে জানিলে ইহা নীতি-বিরুদ্ধ কাজ? তুমি এ কথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথা ছিল না। কিন্তু ইংরেজেরা কি অভ্রান্ত? যিহুদার বিধি আছে বলিয়া ইংরেজদিগের এ সংস্কার—কিন্তু তুমি আমি যিহুদী বিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মানি না। তবে কি হেতুতে এক পুরুষের দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ বলিব?

“তুমি বলিবে, যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন? উত্তর—এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃনিরূপণ হয় না—পিতাই সন্তানের পালনকর্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে। কিন্তু পুরুষের দুই

বিবাহে সন্তানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না। ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

"যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক, তাহাই নীতি-বিরুদ্ধ। তুমি যদি পুরুষের দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ বিবেচনা কর, তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকর।

"গৃহে কলহাদির কথা বলিয়া আমাকে যুক্তি দিবে। আমি একটি যুক্তির কথা বলিব। আমি নিঃসন্তান। আমি মরিয়া গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে ত সন্তান হইবার সম্ভাবনা—ইহা কি অযুক্তি?

"শেষ আপত্তি—সূর্যমুখী। স্নেহময়ী পত্নীর সপত্নীকণ্টক করি কেন? উত্তর—সূর্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন। তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কাহার আপত্তি? "তবে কোন্ কারণে আমার এই বিবাহ নিন্দনীয়? (বিষবৃক্ষ—পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ)

নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করেছিলেন, বিধবা-বিবাহ প্রথা সমর্থন করার জন্য নয়। তাঁর ভালবাসার সমর্থন হিসাবে তিনি বিধবাবিবাহ সংস্কারকে কাজে লাগিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি সূর্যমুখীও বিদ্যাসাগরকে পণ্ডিত বলতে দ্বিধা জানিয়েছিলেন—তার ঘর ভাঙবার আয়োজন দেখে।

আসলে 'বিষবৃক্ষ' বিধবাবিবাহ বা বহুবিবাহের সমস্যা নয়। পরিবারিক জীবনে সতী-সাধ্বী স্ত্রী বর্তমানে অন্য নারীতে আসক্তি যে কি বিষময় ফল প্রসব করতে পারে, তারই ইতিবৃত্ত হল 'বিষবৃক্ষ'।

শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির সুখী গাহার্স্থজীবনের যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কন করেছেন, তাকে উনবিংশ শতাব্দীর একটি ছোট সুখী পরিবার রূপে চিহ্নিত করা চলে।

কমলমণি ও সূর্যমুখীর শিক্ষা প্রসঙ্গে সেকালের মেয়েদের শিক্ষাপদ্ধতি প্রকাশিত—"নগেন্দ্রের পিতা মিস্ টেম্পল্ নাম্নী একজন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত করিয়া কমলমণিকে এবং সূর্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন।"

'ইন্দিরা' উপন্যাসে গার্হস্থ্যচিত্রের একটি সুনিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দিরার মুখ দিয়ে কাহিনী বর্ণনা করার জন্যই বোধহয় পারিবারিক ঘটনাগুলি

এমন সার্থকভাবে পরিবেশিত হয়েছে। ইন্দিরার সুভাষিণীদের গৃহে রাঁধুনী থাকাকালীন বড়লোকের বাড়ীর অন্তঃপুরের পরিচয় প্রয়োজন হয়েছে। 'কালির বোতল' বাড়ীর গৃহিণীর সুন্দরী রাঁধুনী রাখার দুর্বলতা কোথায়, তা ইন্দিরাকে কর্তার কাছে না পাঠানোতেই পরিস্ফুট। সুভাষিণী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে হাস্যোজ্জ্বল নারীর রূপটি প্রকাশিত। সুভাষিণী যেন 'বিষবৃক্ষে'র কমলমণিরই অনুসরণ।

ইন্দিরা

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ—'সেকালে যেমন ছিল' তে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তারিত ভাবে সমাজচিত্র প্রকাশ করেছেন। নতুন জামাইকে কেন্দ্র করে এ ধরনের রসিকতা যে বঙ্কিম-সমকালে কমে এসেছিল লেখক তা স্বীকার করেছেন—"এ পরিচ্ছেদটা না লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। তবে এ দেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের জীবনের এই ভাগটুকু এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। লোপ পাইয়াছে, ভালই হইয়াছে, কেন না, ইহার সঙ্গে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, কদাচিৎ বা দুর্নীতি, আসিয়া মিশিত। কিন্তু যাহা লোপ পাইযাছে, তাহার একটা চিত্র দিবার বাসনায় এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম। তবে জানি না, অনেক স্থানে এ কুরীতি লোপ না পাইয়াও থাকিতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে যাঁহারা জামাই দেখিতে পৌরস্ত্রীদিগকে যাইতে নিষেধ করেন না, তাঁহাদের চোখ কান ফুটাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। তাই, ধরি মাছ, না ছুঁই পানি করিয়া তাঁহাদের ইঙ্গিত করিলাম।"

ইঙ্গিতে হলেও বর্ণনাটির মধ্যে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীসমাজের একটি চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের যুগ থেকে এই ধারার যেন একই অনুস্যূতি লক্ষ্য করতে পারি। পরিচ্ছেদটির রস সম্পূর্ণ উপভোগ করা যেতে পারে।—

"দলে দলে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া, সন্ধ্যার পর আমার স্বামীকে ঘেরিয়া লইয়া, মজলিস্ করিয়া বসিল। সেই প্রকাণ্ড পুরীর একটা কোণের ঘরে মেয়েদের মজলিস্ হইল।

কত মেয়ে আসিল, তার সংখ্যা নাই। কত বড় বড় পটোল-চেরা ভ্রমর-তারা চোখ, সারি বাঁধিয়া, স্বচ্ছ সরোবরে সফরীর মত খেলিতে লাগিল, কত কালো কালো কুন্তলীকৃত ফণাধরা অলকরাশি বর্ষাকালে বনের লতার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া, দুলিয়া উঠিতে লাগিল,—যেন কালিয়দমনে কাল-নাগিনীর দল, বিত্রস্ত হইয়া যমুনার জলে ঘুরিতে-ফিরিতেছে—কত কাণ, কাণবালা, চৌদান, মাকড়ি, ঝুমকা, ইয়ারিং, দুল—মেঘ-মধ্যে বিদ্যুতের মত,

কত মেঘের মত চুলের রাশির ভিতর হইতে খেলিতে লাগিল,—কত রাঙ্গা ঠোঁটের ভিতর হইতে কত মুক্তাপংক্তির মত দন্তশ্রেণীতে কত সুগন্ধি-তাম্বুল চর্বণে কত রকম অধর-লীলার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল,—কত প্রৌঢ়ার কাঁদি-নথের ফাঁদে কন্দর্পঠাকুর ধরা পড়িয়া, তীরন্দাজিতে জবাব দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন—কত অলঙ্কাররাশিভূষিত সুগোল বাহুর উৎক্ষেপনিক্ষেপে বায়ুসন্তাড়িত পুষ্পিত লতাপূর্ণ উদ্যানের মত সেই কক্ষ একটা অলৌকিক চঞ্চল শোভায় শোভিত হইতে লাগিল, রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু শিঞ্জিতে ভ্রমরগুঞ্জন অনুকৃত হইতে লাগিল; কত চিকে চিক্‌ চিক্‌; হারে বাহার; চন্দ্রহারে চন্দ্রের হার; মলের ঝলমলে চরণ টল্‌মল্! কত বানারসী, বালুচরী, মুরশিদাবাদী, ঢাকাই, শান্তিপুরে, সিমলা, ফরাসডাঙ্গা,—চেলি, গরদ, সূতা,—রঙ্গকরা, রঙ্গভরা, ডুরে, ফুরফুরে, ঝুর্‌ঝুরে, বাঁহুরে—তা'তে কারও ঘোমটা, কারও আড়ঘোমটা, কারও আধ-ঘোমটা—কারও কেবল কবরীপ্রান্তে মাত্র বসনসংস্পর্শ—কারও তা'তেও ভুল। আমার প্রাণনাথ অনেক গোরার পল্টন ফতে করিয়া ঘরে টাকা লইয়া আসিয়াছেন—অনেক গবর্ণর, জানরেলের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া, লাভের অংশ ঘরে লইয়া আসিয়াছেন—কিন্তু এই সুন্দরীর পল্টন দেখিয়া, তিনি বিশুষ্ক—বিত্রস্ত। তোপের আগুনের স্থানে নয়নবহ্নির স্ফূর্তি, কামানের কালকারালকুণ্ডলীকৃত ধূমপুঞ্জের পরিবর্তে এই কালকারালকুণ্ডলীকৃত কমনীয় কেশকাদম্বিনী, বেওনেটের ঠন্‌ঠনির পরিবর্তে এই অলঙ্কারের রুনুরুণি, জয়ঢাকের বাদ্যের পরিবর্তে আলতা পরা পায়ে মলের ঝম্‌ঝমি! যে পুরুষ চিলিয়ানওয়ালা দেখিয়াছে—সেও হতাশ্বাস। এ ঘোর রণক্ষেত্রে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য, তিনি আমাকে দ্বারদেশে দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিতে ডাকিলেন—কিন্তু আমিও শিখ সেনাপতির মত বিশ্বাসঘাতকতা করিলাম—এ রণে তাঁহার সাহায্য করিলাম না।

স্থূল কথা, এই সকল মজলিসগুলায় অনেক নির্লজ্জ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে জানিতাম। তাই কামিনী আর আমি গেলাম না—বাহিরে রহিলাম। দ্বার হইতে মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিলাম। যদি বল, যাহাতে নির্লজ্জ ব্যাপার ঘটে, তুমি তাহার বর্ণনায় কেন প্রবৃত্ত তাহাতে আমার উত্তর এই যে, আমি হিন্দুর মেয়ে, আমার রুচিতে এই সকল ব্যাপার নির্লজ্জ ব্যাপার। কিন্তু এখানকার প্রচলিত রুচি ইংরেজি রুচি; ইংরেজী রুচির বিধানমতে বিচার করিলে ইহাতে নির্লজ্জ ব্যাপার কিছুই পাওয়া যাইবে না।

বলিয়াছি, আমি ও কামিনী দুই জনে একবার উঁকি মারিলাম। দেখি, পাড়ার যমুনাঠাকুরাণী সভাপত্নী হইয়া জমকাইয়া বসিয়া আছেন। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ ছাড়াইয়াছে ; রঙটা মিঠে রকম কালো ; চোখ দুইটা ছোট ছোট, কিন্তু একটু ঢুলু ঢুলু, ঠোঁট দুইখানা পুরু, কিন্তু রসে ভরা ভরা। বস্ত্রালঙ্কারের বাহার—পায়ে আলতার বাহার, কালোতে রাঙ্গা, যেন যমুনাতেই জবা,—মাথায় ছেঁড়া চুলের বাহার। শরীরের ব্যাস ও পরিধি আসাধারণ দেখিয়া, আমার স্বামী তাঁহাকে "নদীরূপা মহিষী" বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন। মথুরা-বাসীরা যমুনা নদীকে কৃষ্ণের নদীরূপা মহিষী বলিয়া থাকে, সেই কথা লক্ষ্য করিয়া উ-বাবু এই রসিকতা করিলেন। এখন আমার যমুনা দিদি কখনও মথুরা যান নাই, এত খবরও জানেন না, এবং মহিষী শব্দের অর্থ টা জানেন না। তিনি মহিষী অর্থে কেবল মাদি মহিষই বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্তর সহিত আপনার শরীরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া রাগে গর গর করিতেছিলেন। প্রতিশোধার্থ তিনি আমার স্বামীর সম্মুখে আমাকে প্রকারান্তরে "গাই" বলিলেন, এমন সময়ে আমি দ্বার হইতে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "যমুনা দিদি! কি গা ?"

যমুনা দিদি বলিলেন, "একটা গাই ভাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গাই কেন গা ?"

কামিনী আমার পাশ হইতে বলিল, "ডেকে ডেকে যমুনা দিদিব গলা কাঠ হইয়া গিয়াছে। একবার পিওবে।"

হাসির চোটে সভাপতি মহাশয়া নিবিয়া গেলেন কামিনীর উপর গরম হইয়া বলিলেন, "একরত্তি মেয়ে, তুই সকল হাঁড়িতে কাঠি দিস্ কেন লা কামিনী ?"

কামিনী বলিল, "আর ত কেউ তোমার ভুসি কলাই সিদ্ধ করতে জানে না।"

এই বলিয়া কামিনী পলাইল, আমিও পলাইলাম। আবার একবার গিয়া উঁকি মারিলাম, দেখি, পাড়ার পিয়ারী ঠান্‌দিদি, জাতিতে বৈদ্য—বয়স পঞ্চষষ্ঠি বৎসর, তার মধ্যে পঞ্চবিংশতি বৎসর বৈধব্যে কাটিয়াছে—তিনি সর্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়া ঘাঘরা পরিয়া, রাধিকা সাজিয়া আসিয়াছেন। আমার স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া, কৃষ্ণ কৈ ? কৃষ্ণ কৈ ? বলিয়া সেই কামিনীকুঞ্জবন পরিভ্রমণ করিতেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি খোঁজ ঠান্‌দিদি ?"

তিনি বলিলেন, "আমি কৃষ্ণকে খুঁজি।"

কামিনী বলিল, "গোয়ালবাড়ী যাও—এ কায়েতের বাড়ী।"

রসিকতাপ্রবীণা বলিল, "ঠান্‌দিদি, সকল জাতেই জাত দিয়াছ নাকি ? এখন, পিয়ারী ঠাকুরাণীর এককালে তেলি অপবাদ ছিল। এই কথায়, তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া কামিনীকে ব্যঙ্গচ্ছলে গালি পাড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁকে থামাইবার জন্য, যমুনা দিদিকে দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, "রাগ কর কেন ? তোমার কৃষ্ণ ঐ যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছেন। এসো—তোমায় আমায় পুলিনে দাঁড়াইয়া একটু কাঁদি।"

যমুনা ঠাকুরাণী "মহিষী" শব্দের অর্থবোধে যেমন পণ্ডিতা, "পুলিন" শব্দের অর্থবোধেও সেইরূপ। তিনি ভাবিলেন, আমি বুঝি কোন পুলিনবিহারীর কথার ইঙ্গিত করিয়া তাঁহার অকলঙ্কিত সতীত্বের—(অকলঙ্কিত তাঁহার রূপের প্রভাবে)—প্রতি কোন প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছি। তিনি সক্রোধে বলিলেন, "এর ভিতর পুলিন কে লো ?"

কাজেই আমারও একটু রঙ্গ চড়াইতে ইচ্ছা হইল। আমি বলিলাম, "যার গায়ে পড়িয়া যমুনা রাত্রিদিন তরঙ্গভঙ্গ করে, বৃন্দাবনে তাকে পুলিন বলে।"

আবার তরঙ্গ শব্দে সর্বনাশ করিল,—যমুনা দিদি ত কিছু বুঝিল না, রাগিয়া বলিল, "তোর তরঙ্গ-ফরঙ্গকেও চিনি নে, তোর পুলিনকেও চিনি নে, তোর বেন্দাবনকে চিনি নে। তুই বুঝি ডাকাতের কাছে এত সব রঙ্গরসের নাম শিখে এসেছিস্ ?"

মজলিসের ভিতর রঙ্গময়ী বলিয়া আমার একজন সমবয়স্ক ছিল। সে বলিল, "অত ক্ষেপ কেন যমুনা দিদি! পুলিন বলে নদীর ধারের চড়াকে। তোমার দু'ধারে কি চড়া আছে ?"

চঞ্চলা নামে যমুনা দিদির ভাইজ, ঘোমটা দিয়া পিছনে বসিয়াছিল, সে ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদু মধুর স্বরে বলিল, "চড়া থাকিলেও বাঁচিতাম! একটু ফরসা কিছু দেখিতে পাইতাম। এখন কেবল কালো জলের কালিন্দী কল্ কল্ করিতেছে।"

কামিনী বলিল, "আমার যমুনা দিদিকে কেন তোরা অমন ক'রে চড়ার মাঝখানে ফেলে দিতেছিস্।"

চঞ্চলা বলিল, "বালাই! ষাট! ঠাকুরঝিকে চড়ার মাঝখানে ফেলে

দেবে কেন? ওঁর ভাইয়ের পায়ে ধ'রে বলব, যেন ঠাকুরঝিকে মেঠো শ্মশানে দেন।"

রঙ্গময়ী বলিল, "দুটোতে তফাৎ কি বৌ?"

চঞ্চলা বলিল, "শ্মশানে শিয়াল কুকুরের উপকার,—ডাঙ্গায় গোরু মহিষ চরে—তাদের কি উপকার?" মহিষ কথাটা বলিবার সময়ে, বৌ একবার ঘোমটা তুলিয়া ননদের উপর সহাস্যে কটাক্ষ করিল।

যমুনা বলিল, "নে, আর এক-শ বার সেই কথা ভাল লাগে না। যাদের মোষ ভাল লাগে, তারাই এক শ বার মোষ মোষ বকুক গে।"

পিয়ারী ঠান্‌দিদি কথাটায় বড় কান দেন নাই— তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোষের কথা কি গা?"

কামিনী বলিল, "কোন্ দেশে তেলিদের বাড়ী মোষে ঘানি টানে, সেই কথা হচ্ছে।"

এই বলিয়া কামিনী পলাইল। বার বার সেই তেলি কথাটা মনে করিয়া দেওয়াটা ভাল হয় নাই—কিন্তু কামিনী কুচবিত্রা লোক দেখিতে পারিত না। পিয়ারী ঠান্‌দিদি, রাগে অন্ধকার দেখিয়া আর কথা না কহিয়া, উ-বাবুর কাছে গিয়া বসিল। আমি তখন কামিনীকে ডাকিয়া বলিলাম, "কামিনী! দেখসে আয় লো! এইবার পিয়ারী কৃষ্ণ পেয়েছেন।"

কামিনী দূর হইতেই বলিল, "অনেক দিন সময় হয়েছে।" তারপর একটা গোলগোল শুনিলাম। আমার স্বামীর আওয়াজ শুনিতে পাইলাম—তিনি একজনকে হিন্দিতে ধমক ধামক করিতেছেন। আমরা দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, এক জন দাড়িওয়ালা মোগল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, উ-বাবু তাহাকে তাড়াইবার জন্য ধমক-ধামক করিতেছেন, মোগল যাইতেছে না। কামিনী তখন দ্বার হইতে ডাকিয়া বলিল, "মিত্র মহাশয়! গায়ে কি জোর নেই?"

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "আছে কি বই?"

কামিনী বলিল, "তবে মোগল মিন্‌সেকে গলা ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দাও না।"

এই বলিবা মাত্র মোগল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পলায়ন করিবার সময় আমি তাহার দাড়ি ধরিলাম— পরচুলা খসিয়া আসিল। মোগল বলিল, "মরণ আর কি! তা এ বোকাটি নিয়ে ঘর করিব কি প্রকারে?" এই বলিয়া সে পলাইল। আমি দাড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যমুনা দিদিকে উপহার দিলাম। উ-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

কামিনী বলিল, "ব্যাপার আর কি? তুমিই দাড়িটা পরিয়া চারি পায়ে ঘাসবনে চরিতে আরম্ভ কর।"

উ বাবু বলিলেন, "কেন, মোগল কি জাল?"

কামিনী। কার সাধ্য এমন কথা বলে। শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দাসী কি জাল মোগল হইতে পারে! আসল দিল্লীর আমদানি।

একটা ভারি হাসি পড়িয়া গেল। আমি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে পাড়ার ব্রজসুন্দরী দাসী একখানি জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া একটি ছেলে কোলে করিয়া উ-বাবুর কাছে গিয়া দুঃখের কান্না কাঁদিতে লাগিল। "আমি বড় গরীব; খেতে পাই না, ছেলেটি মানুষ করিতে পারি না।"

উ-বাবু তাহাকে কিছু দিলেন। আমরা দুই জনে দ্বারের দুই পাশে। সে যখন দ্বার পার হয়, কামিনী তাহাকে বলিল, "ভাই ভিখারিণী। জান ত বড় মানুষের কাছে কিছু ভিক্ষা পাইলে দ্বারবানদের কিছু ঘুস দিয়ে যেতে হয়?"

ব্রজসুন্দরী বলিল, "দ্বারবান্ কে?"

কামিনী। আমরা দুইজন।

ব্রজ। কত ভাগ চাও?

কামিনী। পেয়েছ কি?

ব্রজ। দশটি টাকা।

কা। আমাদের আট টাকা আট টাকা ষোল টাকা দিয়া যাও।

ব্রজ। লাভ মন্দ নয়।

কা। তা বড় মানুষের বাড়ীর ভিক্ষায় লাভালাভ করিতে গেলে চলিবে কেন? সময়ে অসময়ে ঘর থেকেও কিছু দিতে হয়।

ব্রজসুন্দরী বড় মানুষের স্ত্রী। ধাঁ করিয়া ষোল টাকা বাহির করিয়া দিল। আমরা সেই ষোল টাকা যমুনা ঠাকুরাণীকে দিলাম, বলিলাম, "তোমরা এই টাকায় সন্দেশ খাইও।"

স্বামী বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

ততক্ষণে ব্রজসুন্দরী ছেলে পাঠাইয়া দিয়া, বানারসী পরিয়া আসিয়া বসিলেন। আবার একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল।

উ-বাবু বলিলেন, "এ কি যাত্রা নাকি?"

যমুনা বলিল, "তা না ত কি? দেখিতেছ না, কাহারও কালিয়দমনের

পালা, কারও কলঙ্কভঞ্জনের পালা, কারও মাথুর মিলন,—কারও শুধু পালাই পালাই পালা।"

উ-বাবু। শুধু পালাই পালাই পালা কার ?

যমুনা। কেন কামিনীর! কেবল পালাই পালাই তার পালা। কামিনী কথায় সকলকে জ্বালাইতে লাগিল ; পান, পুষ্প, আতর বিলাইয়া সকলকে তুষ্ট করিতেছিল। তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিল, বলিল, "তুই যে বড় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্ লা ?

কামিনা বলিল, "পালাব না ত কি তোমাদের ভয় করি না কি ?"

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "কামিনী! ভাই, তোমার সঙ্গে কি কথা ছিল ?"

কামিনী। কি কথা ছিল, মিত্র মহাশয় ?

উ-বাবু। তুমি নাচিবে।

কা। আমি ত নেচেছি।

উ। কখন নাচলে ?

কা। দুপুর বেলা।

উ। কোথায় নাচলি লো ?

কা। আমার ঘরের ভিতর, দোর বন্ধ ক'রে।

উ। কে দেখেছে ?

কা। কেউ না।

উ। তেমনতর ত কথা ছিল না।

কা। এমন কথাও ছিল না যে, তোমাদের সম্মুখে আসিয়া পেশওয়াজ পরিয়া নাচিব। নাচিব স্বীকার করিয়াছিলাম, তা নাচিয়াছি। আমার কথা রাখিয়াছি। তোমরা দেখিতে পাইলে না, তোমাদের অদৃষ্টের দোষ। এখন আমি যে শিকল কিনিয়া রাখিয়াছি, তার কি হবে ?

কামিনী যদি নাচের দায় এড়াইল, তবে আমার স্বামী গানের জন্য ধরা পড়িলেন। মজলিস্ হইতে হুকুম হইল তোমাকে গায়িতে হইবে। তিনি পশ্চিমাঞ্চলে রীতিমত গীতবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। তিনি সনদী খিয়াল গায়িলেন। শুনিয়া সে অপ্সরোমগুলী হাসিল। ফরমায়েস করিল, "বদন অধিকারী, কি দাশু রায়।" তাতে উ-বাবু অপটু। সুতরাং অপ্সরোগণ সন্তুষ্ট হইল না।

এইরূপে দুই প্রহর রাত্রি কাটিল।" (ইন্দিরা—একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ)।

'যুগলাঙ্গুরীয়'কে বঙ্কিমচন্দ্র 'উপকথা' নামে আখ্যাত করেছিলেন। এই কাহিনীর মধ্যে দূরকালের রূপকথার স্পর্শ থাকার জন্য সমসাময়িক দেশ-কালের প্রভাব বিশেষ পড়েনি।

যুগলাঙ্গুরীয়

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের পটভূমি বঙ্কিমের খুব দূরবর্তী কালের নয়। বাংলা-দেশে ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকের এই কাহিনী অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান ব্যবহার করলেও ইংরেজচরিত্র সৃষ্টি ও তাঁদের মনোভাব বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত।

চন্দ্রশেখর

লরেন্স ফষ্টরের যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তা ইংরাজ কুঠিয়ালদের হীন প্রবৃত্তির পরিচায়ক। ইনি ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম কুঠির কুঠিয়াল। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে আমরা যে কুঠিয়ালদের চিত্র পাই তার সংগে এঁদের বিশেষ পার্থক্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য তখনকার ও এখানকার পার্থক্যটুকু স্বীকার করেছেন।—"এখনকার ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আসিলে যেমন নানাবিধ শরীরিক রোগ জন্মে; তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত।" (চন্দ্রশেখর—১/৩)।

বঙ্কিমচন্দ্র আরো লিখেছেন—"এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভ সম্বরণে অক্ষম, এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্যে অধর্ম আছে, অতএব অকর্তব্য। যাহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য-সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা দেয় নাই।

লরেন্স ফষ্টর সেই প্রকৃতির লোক। তিনি লোভ সম্বরণ করিলেন না—বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্মশব্দ লুপ্ত হইয়াছিল। তিনি সাধ্যাসাধ্যও বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে বলিতেন, 'Now or never'।"

(চন্দ্রশেখর—১/৩)।

ইংরাজ চরিত্রগুলির একদিকে যেমন অত্যাচারিত শাসকরূপটি প্রকাশিত, অন্যদিকে তেমনি তাদের সাহস ও দৃঢ়তাও প্রকাশিত।

'রাধারাণী' গল্পটিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক কালকেই পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পটভূমিতে তিনি দেশ-কালকে প্রকাশ করার সুযোগ গ্রহণ করেন নি।

রাধারাণী

রজনী

'রজনী' উপন্যাসের কাহিনীর কালসীমাকে বঙ্কিমের সমসাময়িক বললে অন্যায় করা হয় না। কলকাতার পটভূমিতেই এই উপন্যাসের কাহিনী রচিত। রজনী বলেছে—"বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল—তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। (রজনী—১/১)। 'মনুমেণ্ট'-এর উল্লেখও কলকাতার পটভূমিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে সেকালের কলকাতায় বালিগঞ্জ অঞ্চলে জনবসতি অপেক্ষা ফুলের বাগান করার মত জায়গা ছিল। তাছাড়া গাড়ী-ঘোড়ার মিছিলও খুব বেশী ছিল না। তাই রজনীর মত 'কানা ফুলওয়ালী'র পক্ষেও রাস্তা চলাচল বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল না।

হীরালালের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক সমাজের অব্যবস্থার কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। বর্ণনাটি এরূপ—

হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল—চাঁপার অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট। হীরালাল মদ খায়—তাহাও অল্প মাত্রায় নহে। শুনিয়াছি, গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখা-পড়া শিখান নাই—কোন প্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র, তথাপি রামসদয় বাবু তাহাকে কোথা কেরাণীগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরিটি গেল। হরনাথ বসু, তাহার দমে ভুলিয়া লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। দোকানে লাভ দূরে থাক, দেনা পড়িল—দোকান উঠিয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তারপর সে একখানা খবরের কাগজ করিল। দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল—কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিসে টানাটানি আরম্ভ করিল—ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল। কিছুদিন পরে হীরালাল আবার হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া ছোটবাবুর মোসায়েবি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ছোটবাবুর কাছে মদের চাল নেই দেখিয়া আপনা আপনি সরিল। অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না। তবে ছাপাখানার দেনা শোধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ ভবসংসারে আর কূল-কিনারা না দেখিয়া—হীরালাল চাঁপাদিদির আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল।" (রজনী—১/৫)।

সেকালেও সুপারিশের জোর থাকলে যে অযোগ্যব্যক্তিরও কেরাণীগিরি পাওয়া যেত তা বোঝা যায়। খবরের কাগজের সম্পাদনার যে চিত্র দেখান

হয়েছে তা আদর্শ সম্পাদকের চরিত্র না হলেও, কোন কোন ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কাগজওয়ালার প্রতি বিদ্রূপ। 'বঙ্গদর্শন' মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্রের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়, তারই প্রকাশ ঘটেছে 'ছাপাখানার দেনা শোধিতে হয় না' এই সিদ্ধান্তে।

দারোগাদের কার্যকলাপের একটি সার্থক চিত্র প্রকাশিত হয়েছে 'রজনী' উপন্যাসের ২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদে—"কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোন সচ্চরিত্র, অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। ইনি বহুকাল হইতে কাশীবাস করিয়া আছেন।

একদা তাঁহরে সঙ্গে কথোপকথনকালে পুলিসের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে উত্থাপিত হইল। অনেকে পুলিসের অত্যাচারঘটিত অনেকগুলিন গল্প বলিলেন—দুই একটা বা সত্য, দুই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত। গোবিন্দকান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন—তাহার সারমর্ম এই।

"হরেকৃষ্ণ দাস নামে আমাদিগের গ্রামে একঘর দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার একটি কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তান ছিল না। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সে নিজেও রুগ্ন। এজন্য সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল। তাহার কন্যাটির কতকগুলিন স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভবশতঃ তাহা সে শ্যালীপতিকে দেয় নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলঙ্কারগুলি সে আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল—বলিল যে, "আমার কন্যার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবেন—এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ করিবে।" আমি স্বীকৃত হইলাম। পরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া, নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণের ঘটি বাটী পাতর টুকনি লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ বলিল যে, হরেকৃষ্ণ লাওয়ারেশ নহে—কলিকাতায় তাহার কন্যা আছে। দারোগা মহাশয় তাহাকে কটু বলিয়া আজ্ঞা করিলেন, 'ওয়ারেশ থাকে, হুজুরে হাজির হইবে।' তখন আমার দুই একজন শত্রু সুযোগ মনে করিয়া বলিয়া দিল যে, গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে। আমাকে তলব হইল। আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্ত করে দাঁড়াইলাম। কিছু গালি খাইলাম। আসামী শ্রেণীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম। বলিব কি? ঘুষাঘুষির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কারগুলি সব দারোগা মহাশয়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিলাম, তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

'ঃবলাবাহুল্য যে, দারোগা মহাশয়, অলঙ্কারগুলি আপন কন্যার ব্যবহারার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, 'হরেকৃষ্ণ দাসের লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তিই নাই ; এবং সে লাওয়ারেশা ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই।"

বলাবাহুল্য এই চিত্র বর্তমান কালেও অনেকাংশে সত্য।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ সমসাময়িক সমাজচিত্র প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র তা পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তাই বিষবৃক্ষের'র মত এই উপন্যাসটিও পারিবারিক উপন্যাসই থেকে গেছে।' বিষবৃক্ষের মত এই উপন্যাসেও বিধবাবিবাহের ঘটনা আছে। কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' কুন্দ বিধবা হলেও, তার বয়স এবং মনোভাবের দিক থেকে পাপাচার স্পর্শ করেনি। সেখানে ভালোবাসাই প্রবল হয়ে উঠেছিল।

কৃষ্ণকান্তের উইল

কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিনীর প্রতি গোবিন্দলালের ভালবাসার জন্ম রূপজ মোহ থেকেই এবং রোহিনীও গোবিন্দলালের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল দেহজ কামনা থেকেই। ফলে তাদের বিবাহ ঘটাতে বঙ্কিম সঙ্কোচবোধ করেছেন। তাদের পাপাচারের পরিণামও ভয়াবহরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার প্রেম সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন। 'বিষবৃক্ষে'র বিশেষ পরিস্থিতিতে বঙ্কিমের বিধবা-বিবাহের প্রতি কিঞ্চিৎ কোমল মনোভাব থাকলেও, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর পরিস্থিতিতে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা করেনান।

এই গ্রন্থে উইল-সংক্রান্ত বিষয়ের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। উইলের পরিবর্তনের সংগে সংগে ঘটনাও অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধনী পরিবারে উইলের প্রভাব অনেক ঘটনার জন্ম দিয়েছে।

কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চবিত্ত-পরিবারের সামাজিক অনুষ্ঠানের বিস্তারিত চিত্র দেবার সুযোগ থাকলেও, তিনি স্বভাবসুলভ মিতবাক্ থেকে বর্ণনাটি সেরেছেন।—

"তারপর কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। শত্রুপক্ষ বলিল যে, হাঁ ঘটা হইয়াছে বটে, পাঁচ সাত দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ বলিল লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উত্তরাধিকারীগণ মিত্রপক্ষের নিকট গোপনে বলিল, আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা খাতা দেখিয়াছি। মোট ব্যয়, ৩২৩৫৬।/১২॥।

যাহা হউক, দিনকতক বড় হাঙ্গামা গেল। হরলাল শ্রাদ্ধাধিকারী, আসিয়া শ্রাদ্ধ করিল। দিনকতক মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে, কাঙ্গালের কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কান পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকি নামাবলীর আমদানী, কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য কুটুম্ব, তস্য কুটুম্বের আমদানি। ছেলেগুলা মিহিদানা সীতাভোগ লইয়া ভাঁটা খেলাইতে আরম্ভ করিল; মাগীগুলা নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া, মাথায় লুচিভাজা ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল; গুলির দোকান বন্ধ হইল, সব গুলিখোর ফলাগারে; মদের দোকান বন্ধ হইল, সব মাতাল, টিকি রাখিয়া নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে গিয়াছে। চাল মহার্ঘ হইল, কেন না, কেবল অন্নব্যয় নয়, এত ময়দা খরচ যে, আর চালের গুঁড়িতে কুলান যায় না; এত ঘৃতের খরচ যে, রোগীরা আর কাষ্টর অয়েল পায় না; গোয়ালার কাছে ঘোল কিনিতে গেলে তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল, আমার ঘোলটুকু ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে দই হইয়া গিয়াছে।" (কৃষ্ণকান্তের উইল—১/২৮)

উনবিংশ শতাব্দীতে বড়লোকের সন্তানদের বাগানবাড়ীতে বাইজীদের সংগে রাত্রিযাপন বহুলপ্রচারিত চিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র এইসব পাপাচারের চিত্র প্রকাশে স্বভাবতই কুণ্ঠিত ছিলেন। তবুও রোহিনী এবং গোবিন্দলালের প্রসঙ্গে তাঁকে যে চিত্রটি প্রকাশ করতে হয়েছে তা নিম্নরূপ।—

"দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিত্রানদী বহিতেছে—তীরে অশ্বত্থ কদম্ব আম্র খর্জ্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিলদয়েল পাপিয়া ডাকিতেছে। নিকটে গ্রাম নাই; প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুদ্র বাজার প্রায় এক ক্রোশ পথ দূর। এখানে মনুষ্যসমাগম নাই দেখিয়া নিঃশব্দে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া পূর্ব্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর এবং তাহার ঐশ্বর্য ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে—তাহার আমীন তাগাদগীর নায়েব গোমস্তা সকলে উপযুক্ত স্থানে স্বকর্মার্জ্জিত ফলভোগ করিতেছেন। একজন বাঙ্গালী সেই জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া, তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পুষ্পে, প্রস্তরপুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র—কিন্তু কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত—অবর্ণনীয়। নির্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কাণ মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক

যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালঙ্কার ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে—পার্শ্বস্থ প্রাচীরবিলম্বী দুইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের ছায়াও ঐরূপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া, একজন যুবা পুরুষ নবেল পড়িতেছেন এবং মধ্যস্থ মুক্ত দ্বারপথে যুবতীর কার্য্য দেখিতেছেন।

তম্বুরার কান মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়িধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান্ খ্যান্ ওস্তাদজীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল—তখন তিনি সেই গুম্ফশ্মশ্রুর অন্ধকারমধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া, বৃষ-দুর্লভ কণ্ঠরব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। রব নির্গত করিতে করিতে সে তুষারধবল দন্তগুলি বহুবিধ খিচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল, এবং ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাশি তাহার অনুবর্তন করিয়া নানাপ্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিচুনিসন্তাড়িত হইয়া সেই বৃষভদুর্লভ রবের সঙ্গে আপনার কোমল কণ্ঠ মিশাইয়া গীত আরম্ভ করিল—তাহাতে সরু মোটা আওয়াজে সোণালি রূপালি রকম একপ্রকার গীত হইতে লাগিল।

এইখানে যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু তথাপি সেই অশোক বকুল কুটজ কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকূজন, সেই ক্ষুদ্রনদীতরঙ্গচালিত রাজহংসের কলনাদ, সেই যূথী জাতি মল্লিকা, মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নলিকাচপ্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব মাধুরী, সেই রঙ্গতফটিকাদিনির্মিত পুষ্পাধারে সুবিন্যস্ত কুসুমগুচ্ছের শোভা, সেই গৃহশোভাকারী দ্রব্যজাতের বিচিত্র উজ্জ্বলতা আর সেই গায়কের বিশুদ্ধস্বর সপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম। কেন না, যে যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে তাহার হৃদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্য্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্তি হইতেছে।" (কৃষ্ণকান্তের উইল—২৫)।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের দূর দূরকালের পটভূমিতে প্রসারিত হওয়ার জন্য সমসাময়িক কালে চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষ ছায়াপাত করার সুযোগ পায় নি কেবলমাত্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় 'হিন্দুর বাহুবল' বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচেতনারই অন্যতর প্রকাশ বলে মনে করি।

রাজসিংহ

'আনন্দমঠ' উপন্যাসখানি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-এর পটভূমিকায় রচিত।

এই পটভূমির সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও, তিনি পড়াশোনার দ্বারা এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বর্ণনায় মন্বন্তর-এর চিত্রটি এরূপ—

"১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল। জোত জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল—জ্বর, ওলাওঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের

প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।" (আনন্দমঠ—১/১)

ক্ষুধার্ত মানুষেরা যখন দস্যুবৃত্তি করে কল্যাণী ও তার শিশুসন্তানকে হরণ করে নিয়ে গেল তখন তাদের মনোভাব এক ভয়াবহ বাস্তব-চিত্রকে প্রকাশ করেছে।—

"যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে আনাইল, সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হৃদয়ান্তর্গত সৌন্দর্যের ন্যায় সে বনের সৌন্দর্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক—বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে পরিষ্কৃত সুকোমল শষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে নামাইল। তাহারা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। তখন তাহারা বাদানুবাদ কবিতে লাগিল যে, ইহাদিগকে লইয়া কি করা যায়—যে কিছু অলঙ্কার কল্যাণীব সঙ্গে ছিল, তাহা পূর্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। একদল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে, একজন দস্যু বলিল, "আমরা সোনা-রূপা লইয়া কি করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুটা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।" একজন এই কথা বলিলে সকলে সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল। "চাল দাও", "চাল দাও," "ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনা-রূপা চাহি না।" দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে, যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, সে, সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। দলপতি দুই এক জনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল, "শৃগাল-কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই, আজ এই বেটাকে খাই।" তখন সকলে "জয় কালী!" বলিয়া উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। "বম্ কালী! আজ নরমাংস খাইব!" এই বলিয়া

সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্তিসকল অন্ধকারে খল-খল হাস্য করিয়া, করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য এক-জন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। শুষ্ক লতা, কাষ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া চকমকি সোলায় আগুন করিয়া, সেই তৃণকাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল। তখন অল্প অল্প অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে পার্শ্ববর্তী আম্র, জম্বীর, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, খর্জুর, প্রভৃতি শ্যামল পল্লবরাজি, অল্প অল্প প্রভাসিত হইতে লাগিল। কোথাও পাতা আলোতে জ্বলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জ্বল হইল। কোথাও অন্ধকার আরও গাঢ় হইল। অগ্নি প্রস্তুত হইলে, একজন মৃতশবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর একজন বলিল, "রাখ, রও, রও, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুকনা মাংস কেন খাই? আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব; এস, ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।" আর একজন বলিল, "যাহা হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় না।" তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা লইয়া শুইয়া ছিল, সেই দিকে চাহিল। দেখিল যে, সে স্থান শূন্য, কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া, কন্যার মুখে স্তনটি দিয়া, বনমধ্যে পলাইয়াছে। শিকার পলাইয়াছে, দেখিয়া মার মার শব্দ করিয়া, সেই প্রেতমূর্তি দস্যুদল চারিদিকে ছুটিল। অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।"

মন্বন্তরকালীন এই চিত্র যেমন যথাযথ, তেমনি তার অব্যবহিত পরবর্তী কালেও দেশের অবস্থা কি নিদারুণভাবে শোচনীয় হয়ে পড়ে তার বর্ণনাও বঙ্কিমচন্দ্র দিতে ভোলেন নি—

"কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালায় ছয় আনা রকম মনুষ্যকে,—কত কোটী তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়া ছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্যা। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্বর ভূমিখণ্ড-সকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পুরিয়া গেল।

দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাস্যময় শ্যামল শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো-মহিষাদি বিচরণ করিত, যে সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক-যুবতীর প্রমোদভূমি ছিল, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে সুন্দরীব দল অলক্তাঙ্কিতচরণে চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, বয়স্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে কবিতে, উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেইখানে ভল্লুকে বিবর প্রস্তুত করিয়া শাবকাদি লালন-পালন করিতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীন বয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি যূথে যূথে বন্য হস্তিসকল মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের কাণ্ডসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্পসকল দিবসে ভেকেব অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই, চাষায চাষ করে, টাকা পায় না—জমীদারের খাজনা দিতে পারে না, জমীদাবেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না। রাজা জমিদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমিদার-সম্প্রদায় সর্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায়, কাড়িয়া খায়। চোর-ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।"

(আনন্দমঠ ৩/১)।

'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ যেমন ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে, এখন আর কোথাও হয় নি। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে তিনি যে দেশকে মাতারূপে আরাধনার ব্যবস্থা করলেন, তা বহুকাল আমাদের স্বাধীনতার মন্ত্ররূপে উচ্চারিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে দেশাত্মবোধের প্রধান দু'টি ধারা ছিল—অহিংস ও সহিংস। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র সন্তানসেনার বিদ্রোহের মাধ্যমে যেমন সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন, অন্যদিকে তেমনি শান্তির (অহিংসা) বাণী প্রচার করেছেন।

ব্রহ্মচারী কর্তৃক মহেন্দ্রকে দেবী দর্শন করানোর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-চিন্তার রূপটি প্রকাশিত হয়েছে।—

"ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ

করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবারুণপ্রফুল্ল প্রাতঃকালে, যখন নিকটস্থ কানন সূর্যালোকে হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতর কি আছে, মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভ স্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্ত্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্তিমান রাগ রাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মূর্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর, অতি ভীত স্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল দেখিতে পাইতেছ?" মহেন্দ্র বলিল, "পাইতেছি।"

ব্রহ্ম। বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ?

মহে। দেখিয়াছি। কে উনি?

ব্রহ্ম। মা

মহে। মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমরা যাঁর সন্তান।"

মহেন্দ্র। কে তিনি?

ব্রহ্ম। সময়ে চিনিবে। বল—বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

ব্রহ্ম। মা—যা ছিলেন।

মহে। সে কি?

ব্রহ্ম। ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্যশালিনী। ইঁহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথে আইস।" ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ, মা যা হইয়াছেন।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, "কালী"।

ব্রহ্ম। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে খেটক খর্পর কেন?"

ব্রহ্ম। আমার সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল, বন্দে মাতরম্।

"বন্দে মাতরম্" বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই পথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারি দিক্ হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন, এক মর্মরপ্রস্তর নির্মিত প্রকাণ্ড মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্মিত দশভুজা প্রতিমা নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন—

"এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—"বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্গদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। "দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দিণী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।" তখন দুই জনে যুক্ত করে ঊর্ধ্বমুখে এককণ্ঠে ডাকিতে লাগিল,—

"সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্তু তে॥"

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদগদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব ?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।" (আনন্দমঠ—১/১১)।

দেবীর এই মূর্তিপূজায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সন্তানসেনারা ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র বেশিদূর অগ্রসর হতে পারলেন না। যে ইংরাজ-সরকারের তিনি নিমক খেয়েছিলেন তারজন্য তাঁকে লেখনী-সন্ধি করতে হল। তবুও সত্যানন্দ ও মহাপুরুষের কথোপ-কথনের মধ্যে আমরা যেন বঙ্কিমের দেশপ্রেমিক সত্তা ও চাকুরীজীবি সত্তার দ্বন্দ্বময় রূপটি লক্ষ্য করতে পারি।—

"সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে, বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমত সময়ে সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া, সত্যানন্দ উঠি া প্রণাম করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা।"

সত্য। চলুন—আমি প্রস্তুত। কিন্তু হে মহাত্মন্!—আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্তে যুদ্ধজয় করিয়া সনাতনধর্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়ে আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল ?"

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে, মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য নাই। অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই।"

সত্য। মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, "হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না তবে কে রাজা হইবে ? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে ?"

তিনি বলিলেন, "না, এখন ইংরেজ রাজা হই ।" সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার

দিকে ফিরিয়া জোড়হাতে বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায় মা! তোমায় উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমাব মৃত্যু হইল না।"

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বাবা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতাব পূজা সনাতনধর্ম নহে, সে একট লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম, তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম—ম্লেচ্ছেবা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকাব, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সে-ই সনাতনধর্মেব প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেকদিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্মেব পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই, আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংবেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংবেজকে বাজা কবিব। ইংরেজী শিক্ষায এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইব। তখন সনাতনধর্ম প্রচাবের আব বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংবেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "হে মহাত্মন্! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমাদিগকে এই নৃশংস-যুদ্ধকার্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?"

মহাপুরুষ বলিলেন, "ইংরেজ এক্ষণে বণিক্—অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্য-শাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্য-শাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।"

সত্যানন্দ। হে মহাত্মন্! আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না—জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজ-রাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।"

মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে এই মাতৃপ্রতিমাসম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্ত্তি শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছে। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন।

বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।" (আনন্দমঠ—৪/৮)।

'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস ও সমাজচেতনার মিশ্রণ ঘটেছে। এ ছাড়া এই উপন্যাস রচনার পিছনে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ যে কার্যকরী হয়েছে, একথা সর্ববাদীসম্মত। গীতার অনুশীলনতত্ত্বের প্রকাশ

তিনি দেখিয়েছেন প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্যে। নিষ্কাম কর্মসাধনাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রফুল্লর দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে অনুশীলনের ফল যখন গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এসে সার্থকতা খুঁজে পায়, তখন বঙ্কিমের এই আদর্শবোধের কথা চিন্তা করে তা মেনে নিতে হয়। গার্হস্থ্য ধর্মই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনপীঠ। প্রফুল্ল তাই নিশির মত সব-কিছু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করতে পারেনি। শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে নিশি নিষ্কর্মা। প্রফুল্লর কিছু কর্ম আছে সংসারে ক্ষেত্রে। বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনে সুখশান্তি কামনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লর মত সর্বগুণসম্পন্না নারীর আবির্ভাব কামনা করেছেন।

দেবীচৌধুরাণী

কিন্তু আদর্শবাদ যাই থাক না কেন, এর মধ্যে গাহস্থ্য জীবনের তৎকালীন সমাজের চিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। হরবল্লভের বিরাট পরিবার, প্রফুল্লর নামে পাড়ার লোকের কুৎসা রটনা, ব্রজেশ্বরের সাগরের বাপের বাড়ী যাত্রার ঘটনা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কার্যতঃ না হলেও, ব্রজেশ্বরের মধ্যে কিছু অন্তর্দ্বন্দ্বের অবতারণা করে চরিত্রটির মহিমা বজায় রাখা হয়েছে।

ভবানী পাঠকের কাছে প্রফুল্লর শিক্ষার যে বিস্তারিত বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন, তা নিতান্ত উপেক্ষনীয় নয়। এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-সম্পর্কিত মানসিকতার কি কোন পরিচয় পাওয়া যাবে! পরিচ্ছেদটি আমরা অনুসন্ধান করতে পারি।

"প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হইল। নিশি ঠাকুরাণী, রাজার ঘরে থাকিয়া, পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন—বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক প্রফুল্ল তাঁহার কাছে শিখিল। তার পর পাঠক ঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ করাইলেন। আরম্ভ করাইয়া দুই চারি দিন পড়াইয়া অধ্যাপক বিস্মিত হইলেন। প্রফুল্লের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, শিখিবার ইচ্ছা অতি প্রবল—প্রফুল্ল বড় শীঘ্র শিখিতে লাগিল। তাহার পরিশ্রমে নিশিও বিস্মিতা হইল। প্রফুল্লের রন্ধন, ভোজন, শয়ন সব নামমাত্র, কেবল "সু ঔ জস্, অম্ ঔ শস্" ইত্যাদিতে মন। নিশি বুঝিল যে, প্রফুল্ল সেই "দুই নূতন" কে ভুলিবার জন্য অনন্যচিত্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিতেছে। ব্যাকরণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল। তার

পর প্রফুল্ল ভট্টিকাব্য জলের মত সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান অধিকৃত হইল। রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ অবাধে অতিক্রান্ত হইল। তখন আচার্য্য একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত এবং একটু ন্যায় শিখাইলেন। এ সকল অল্প অল্প মাত্র। এই সকল দর্শনে ভূমিকা করিয়া, প্রফুল্লকে সবিস্তারে যোগশাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন; এবং সর্বশেষে সর্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধীত করাইলেন। পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল।

এদিকে প্রফুল্লের ভিন্নপ্রকার শিক্ষাও তিনি ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত রহিলেন। গোব্‌রার মা কিছু কাজ করে না, কেবল হাট করে—সেটাও ভবানী ঠাকুরের ইঙ্গিতে। নিশিও বড় সাহায্য করে না, কাজেই প্রফুল্লকে সকল কাজ করিতে হয়। তাহাতে প্রফুল্লের কষ্ট নাই—মাতার গৃহেও সকল কাজ নিজে করিতে হইত। প্রথম বৎসর তাহার আহারের জন্য ভবানী ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচকলা। আর কিছুই না। নিশির জন্য তাই। প্রফুল্লের তাহাতেও কোন কষ্ট হইল না। মার ঘরে সকল দিনে এক জুটিত না। তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত—গোব্‌রার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে, প্রফুল্ল খানা, ডোবা, বিল, খালে আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত; সুতরাং গোব্‌রার মা হাট হইতে একাদশীতে মাছ আনিতে আর আপত্তি করিত না।

দ্বিতীয় বৎসরে নিশির আহারের ব্যবস্থা পূর্বমত রহিল। কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে কেবল নুন লঙ্কা ভাত আর একাদশীতে মাছ। তাহাতে প্রফুল্ল কোন আপত্তি করিল না।

তৃতীয় বৎসরে নিশির প্রতি আদেশ হইল, তুমি ছানা, সন্দেশ, ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, ননী, ফল, মূল, অন্ন, ব্যঞ্জন উত্তমরূপে খাইবে, কিন্তু প্রফুল্লের নুন লঙ্কা ভাত। দুই জনে একত্র বসিয়া খাইবে। খাইবার সময়ে প্রফুল্ল ও নিশি দুই জনে বসিয়া হাসিত। নিশি ভাল সামগ্রী বড় খাইত না—গোব্‌রার মাকে দিত। এই পরীক্ষাতেও প্রফুল্ল উত্তীর্ণ হইল।

চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল। প্রফুল্ল তাহা খাইল।

পঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ভোজনে উপদেশ হইল। প্রফুল্ল প্রথম বৎসরের মত খাইল।

শয়ন, বসন, স্নান, নিদ্রা সম্বন্ধে এতদনুরূপ অভ্যাসে ভবানী ঠাকুর শিষ্যাকে নিযুক্ত করিলেন। পরিধানে প্রথম বৎসরে চারিখানা কাপড়। দ্বিতীয় বৎসরে দুইখানা। তৃতীয় বৎসরে গ্রীষ্মকালে একখানা মোটা গড়া, অঙ্গে শুকাইতে হয়, শীতকালে একখানি ঢাকাই মলমল, অঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয়। চতুর্থ বৎসরে পাট কাপড়, ঢাকাই কাল্কাদার শান্তিপুরে। প্রফুল্ল সে সকল ছিঁড়িয়া খাটো করিয়া লইয়া পরিত। পঞ্চম বৎসরে বেশ ইচ্ছামত। প্রফুল্ল মোটা গড়াই বহাল রাখিল। মধ্যে মধ্যে ক্ষারে কাচিয়া লইত।

কেশবিন্যাস সম্বন্ধেও ঐরূপ। প্রথম বৎসবে তৈল নিষেধ, চুল রুক্ষ বাঁধিতে হইত। দ্বিতীয় বৎসরে চুল বাঁধাও নিষেধ। দিবারাত্র চুলের রাশি আলুলায়িত থাকিত। তৃতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুরের আদেশ অনুসারে সে মাথা মুড়াইল। চতুর্থ বৎসরে নূতন চুল হইল; ভবানী ঠাকুর আদেশ করিলেন, "কেশ গন্ধ-তৈল দ্বারা নিষিক্ত করিয়া সর্বদা রঞ্জিত করিবে।" পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন। প্রফুল্ল, পঞ্চম বৎসরে চুলে হাতও দিল না।

প্রথম বৎসরে তূলার তোষকে তুলার বালিশে প্রফুল্ল শুইল। দ্বিতীয় বৎসরে বিচালির বালিশ, বিচালির বিছানা। তৃতীয় বৎসরে ভূমি-শয্যা। চতুর্থ বৎসরে কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা।' পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। পঞ্চম বৎসরে প্রফুল্ল যেখানে পাইত, সেখানে শুইত।

প্রথম বৎসরে ত্রিযাম নিদ্রা। দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিযাম। তৃতীয় বৎসরে দুই দিন অন্তর রাত্রিজাগরণ। চতুর্থ বৎসরে তন্দ্রা আসিলেই নিদ্রা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। প্রফুল্ল রাত জাগিয়া পড়িত ও পুঁথি নকল করিত।

প্রফুল্ল জল, বাতাস, রৌদ্র, আগুন সম্বন্ধেও শরীরকে সহিষ্ণু করিতে লাগিল। ভবানীঠাকুর প্রফুল্লের প্রতি আর একটি শিক্ষার আদেশ করিলেন, তাহা বলিতে লজ্জা করিতেছে; কিন্তু না বলিলেও কথা অসম্পূর্ণ থাকে। দ্বিতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "বাছা, একটু মল্লযুদ্ধ শিখিতে হইবে।" প্রফুল্ল লজ্জায় মুখ নত করিল, বলিল, "ঠাকুর আর যা বলেন, তা শিখিব, এটি পারিব না।"

ভ। এটি নইলে নয়।

প্র। সে কি ঠাকুর! স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখিয়া কি করিবে?

ভ। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য। দুর্বল শরীরে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।

প্র। কে আমাকে মল্লযুদ্ধ শিখাইবে? পুরুষ মানুষের কাছে আমি মল্লযুদ্ধ শিখিতে পারিব না।

ভ। নিশি শিখাইবে। নিশি ছেলেধরার মেয়ে। তারা বলিষ্ঠ বালক বালিকা ভিন্ন দলে রাখে না। তাঁহাদের সম্প্রদায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখিয়াছিল। আমি এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশিকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছি।

প্রফুল্ল চারি বৎসর ধরিয়া মল্লযুদ্ধ শিখিল।

প্রথম বৎসর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসরে আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্তু তাহার বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বৎসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকট যাইতেন— প্রফুল্ল নেড়া মাথায়, অবনত মুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত। চতুর্থ বৎসরে ভবানী নিজে অনুচরদিগের মধ্যে বাছা বাছা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেন; প্রফুল্লকে তাহাদের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে বলিতেন। প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে তাহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিত। পঞ্চম বৎসরে কোন বিধি-নিষেধ রহিল না। প্রয়োজনমত প্রফুল্ল পুরুষ দিগের সঙ্গে আলাপ করিত, নিষ্প্রয়োজনে করিত না। যখন প্রফুল্ল পুরুষমানুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত, তখন তাহাদিগকে আপনার পুত্র মনে করিয়া কথা কহিত।

এই মত নানারূপ পরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী প্রফুল্লকে ভবানী ঠাকুর ঐশ্বর্য্যভোগের যোগ্য পাত্রী করিতে চেষ্টা করিলেন। পাঁচ বৎসরে সকল শিক্ষা শেষ হইল।" (দেবী চৌধুরাণী—১/১৫)।

'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসে ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির যে চিত্র আছে, 'সীতারাম' উপন্যাসে তার একটি অন্যতর চিত্র লক্ষ্য করা যায়।—"সীতা। পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি যখন আছেন, তখনও পালনীয়—তিনি যখন স্বর্গে, তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি অধর্ম করিতে বলেন, তবে তাহা

সীতারাম

কি পালনীয়? পিতা-মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম করা যায় না— কেন না, যিনি পিতা-মাতার পিতামাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়।" (সীতারাম—১/৭)।

'সীতারাম' উপন্যাসে অঙ্কিত কয়েকজন মুসলমানের চরিত্র নিকৃষ্টরূপে

অঙ্কন করা হয়েছে ব'লে অনেকে বঙ্কিমকে মুসলমান বিদ্বেষী ব'লে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু তারই পাশাপাশি আর একজন মুসলমান ফকিরের উদার মতবাদ যে বঙ্কিমেরই সৃষ্টি, একথা আমাদের ভুললে চলবে না।

বঙ্কিম-উপন্যাসে সমসাময়িক দেশ-কাল ও ঘটনার যে সমীক্ষা করা হল, তার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সকলেই একমত হবেন, এবং স্বীকার করবেন যে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাইরের জগতের দ্বার রুদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনার সাক্ষে এই সিদ্ধান্তগুলি আরও অনেকটা যুক্তিনিষ্ঠ করা যেত, কিন্তু সেগুলি আমাদের বক্ষমান প্রবন্ধের অধিকারভুক্ত নয়।

তবে মোটামুটিভাবে দেখা গেল সামাজিক ঘটনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ইতঃস্তত: বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। বহুবিবাহ সম্পর্কে তাঁর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল বলেই মনে হয়, কারণ তাঁর উপন্যাসের অধিকাংশ নায়কেরই একাধিক বিবাহ। বিধবাবিবাহের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র সুফল-কুফল দু'দিক সম্বন্ধেই সচেতন ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর উপস্থিতি বঙ্কিম-উপন্যাসে নেই। তবে ইংরেজী শিক্ষা বাঙালী যুবমানসে যে পরিবর্তন এনেছিল, তার প্রকাশ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অধিকাংশই ছোট পরিবার। একান্নবর্তী পরিবারের বদলে ক্ষুদ্র পরিবারের উপস্থিতি আধুনিক সমাজব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে—বঙ্কিমচন্দ্র মোটামুটি স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' বা 'সাম্য' বা 'বিড়াল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অর্থনৈতিক বৈষম্যের আলোচনা করেছেন, উপন্যাসে সেরকম সুযোগ কোথাও গ্রহণ করেননি। ইতিহাসের দূরকালের পটভূমিতে যেসব দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের কথা বলেছেন, তা সেকালের বাস্তবচিত্র প্রকাশেই ব্যবহৃত হয়েছে।

বঙ্কিম-উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনা সার্থকতা লাভ করেছে দেশাত্মবোধের সার্থক প্রকাশে। দূরকালের প্রেক্ষাপটে হলেও পরাধীনতার গ্লানিবোধ ও স্বাধীনতার কামনা তাঁর মধ্যে স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। তবে ইংরাজদের ভাল দিকটিও তিনি অস্বীকার করেননি।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষার আশীর্বাদকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি, কিন্তু প্রাচ্যশিক্ষার ধারাটিকেও তিনি বজায় রাখার সপক্ষে।

হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর আসক্তি একটু বেশি রকমের। তাই পাশ্চাত্য রোমান্সের মত দেবীচৌধুরাণীকে দিয়ে এত কাণ্ড করিয়েও শেষ পর্যন্ত তাঁকে গৃহধর্মে অনুশীলনতত্ত্বের ও যোগের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয়েছে। ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রতি তাঁর বিরূপতা না থাকলেও অনুরাগ বড় একটা ছিল না।

॥ পাঁচ ॥

বঙ্কিম-উপন্যাসে পূর্ববর্তী বাংলাসাহিত্যের প্রভাব

দশম-একাদশ শতাব্দীতে 'চর্যাপদ'-কে নিয়ে যে বাংলাসাহিত্যের যাত্রা সুরু হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রে এসে তার যে একটি স্পষ্ট পট-পরিবর্তন ঘটেছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তনের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছেন।—"পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা একমুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

অবশ্য এখানে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম প্রকাশকেই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের সমুজ্জ্বল শিখররূপে চিহ্নিত করেছেন। 'বঙ্গদর্শনে' অন্যান্য রচনার মধ্যে 'বিষবৃক্ষ' ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হতে সুরু করে। তার পূর্বে সরাসরি গ্রন্থাকারে তিনি কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে-সময় সাহিত্যচর্চা সুরু করেন তখন বাংলাসাহিত্যের পরিসর খুব বড় ছিল না। 'চর্যাপদ' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। বৈষ্ণব-পদাবলী কীর্তনীয়াদের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে কীর্তনগানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাসে গানগুলির মধ্যে বৈষ্ণবপদাবলীর স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। এই গানগুলি বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে রচনা করেছেন, তাতে বৈষ্ণব পদরচনার ধারাটি সম্পর্কে তাঁর যে গভীর অনুরাগ ও অধিকার ছিল সেকথা বোঝা যায়।

'মৃণালিনী' উপন্যাসে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেম-বিরহ রাধা-কৃষ্ণলীলার

পটভূমিকায় স্থাপন করা হয়েছে এবং গিরিজায়ার ভূমিকা অনেকটা সখী বা দূতীর মত। তাই গানগুলি বেশ কাহিনীর সংগে খাপ খেয়ে গেছে এবং ঘটনার অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে।

অন্যান্য উপন্যাসেও যে-সমস্ত গান স্থান পেয়েছে, তার অধিকাংশেই বৈষ্ণব-পদাবলীর রীতি প্রকাশিত।

শাক্তপদাবলী প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে একটি বিশেষ আসন গ্রহণ করেছে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কাপালিকের যে শক্তি আরাধনার কথা আছে তা তন্ত্রসম্মত কালীপূজা। অবশ্য বিপরীতভাবের সাধনা দেখান হয়েছে অধিকারীর মাতৃ আরাধনায়। কপালকুণ্ডলাকে তান্ত্রিকের হাতে গড়ে তুলেও শেষপর্যন্ত তার মধ্যে কোমলভাবের অবতারণা করা হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ৮ম পরিচ্ছেদে (গৃহাভিমুখে) কপালকুণ্ডলাকে আকাশে যে কালীমূর্তি দেখান হয়েছে, তা ভয়ঙ্করী মূর্তি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"কপালকুণ্ডলা আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ; যথায় গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন ; দেখিলেন, রণরঙ্গিণী খল খল হাসিতেছে ; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন।"

কপালকুণ্ডলার মনে কাপালিকের প্রভাব কি পরিমাণ কার্যকরী হয়েছিল তার পরিচয়ও বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে দিয়েছেন।—

"কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান, তান্ত্রিক যেরূপ কালিকাপ্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলা সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জনে তদ্রূপ। কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে ; তথাপি অহর্নি শক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখদুঃখিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু তার কোন কার্য্যে ভক্তি প্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না। এখন সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন ?"

'নবম পরিচ্ছেদে'-এ (প্রেতভূমে) শ্মশানভূমির বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র বীভৎস রসেরই প্রকাশ করেছেন। বর্ণনাটি এরূপ—

"চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। কাপালিক যথায় আপন পূজাস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন তথায় কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গেলেন। সে গঙ্গাতীরে এক বৃহৎ সৈকতভূমি। তাহারই সম্মুখে আরও বৃহত্তর দ্বিতীয় এক সিকতাময় স্থান। সেই সৈকতে শ্মশানভূমি। উভয় সৈকতমধ্যে জলোচ্ছ্বাসকালে অল্প জল থাকে, ভাঁটার সময়ে জল থাকে না। এক্ষণে জল ছিল না। শ্মশানভূমির যে মুখ গঙ্গাসম্মুখীন, সেই মুখ অত্যুচ্চ; জলে অবতরণ করিতে গেলে একেবারে উচ্চ হইতে অগাধ জলে পড়িতে হয়। তাহাতে আবার অবিরতবায়ুতাড়িত তরঙ্গাভিঘাতে উপকূলতল ক্ষয়িত হইয়াছিল; কখনও কখনও মৃত্তিকাখণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া যাইত। পূজাস্থানে দীপ নাই—কাষ্ঠখণ্ডমাত্রে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্টদৃশ্য শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল। নিকটে পূজা, হোম, বলি প্রভৃতির সমগ্র আয়োজন ছিল। বিশাল তরঙ্গিণীহৃদয় অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈত্র মাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল; তাহার আঘাতে তরঙ্গাভিঘাতজনিত কলকল রব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল। শ্মশানভূমিতে শবভুক্ পশুগণ কর্কশকণ্ঠে কদাচিৎ ধ্বনি করিতেছিল।

কাপালিক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে উপযুক্ত স্থানে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া তন্ত্রাদির বিধানানুসারে পূজারম্ভ করিলেন। উপযুক্ত সময়ে নবকুমারের প্রতি আদেশ করিলেন যে, কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আন। নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্ত ধারণ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। তাঁহাদিগের চরণে অস্থি ফুটিতে লাগিল। নবকুমারের পদের আঘাতে একটা জলপূর্ণ শ্মশান-কলস ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার নিকটেই শব পড়িয়া ছিল—হতভাগার কেহ সৎকার করে নাই। দুইজনেরই তাহাতে পদস্পর্শ হইল। কপালকুণ্ডলা তাহাকে বেড়িয়া গেলেন, নবকুমার তাহাকে চরণে দলিত করিয়া গেলেন। চতুর্দিক বেড়িয়া শবমাংসভুক্ পশুসকল ফিরিতেছিল; মনুষ্য দুই জনের আগমনে উচ্চকণ্ঠে রব করিতে লাগিল, কেহ আক্রমণ করিতে আসিল, কেহ বা পদশব্দ করিয়া চলিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন, নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে; কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক নিষ্কম্প।"

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে মহেন্দ্রকে দেবীমূর্তি দেখান প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দেওয়া

হয়েছে, তাতে কালী রূপের কথাও আছে। কিন্তু সেখানে শাস্ত্রসম্মত দেবীমূর্তি অপেক্ষা বঙ্কিমের কল্পিত দেশমাতৃকার প্রতীকমূর্তিই প্রাধান্য পেয়েছে।

(দ্রঃ আনন্দমঠ ১/২১)

মঙ্গলকাব্যে যে-সমস্ত প্রথাগত বর্ণনা আছে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের কোন কোন অংশে তার আধুনিক রূপ প্রদান করেছেন। যেমন—'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্রের গৃহের জাঁকজমক ও বিভিন্ন মহলের বর্ণনা, 'ইন্দিরা' উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে পাড়া-পড়শিদের নতুন বরকে নিয়ে রসিকতার বর্ণনা প্রভৃতি।

ভারতচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় কবি ছিলেন বলেই মনে হয়। 'বিষবৃক্ষে'র হীরা দাসী, ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীর কথাই স্মরণ করায়।

এই দুই চরিত্রের মধ্যে পরিকল্পনাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, কোথাও যেন একটা মিল লক্ষিত হয়। বোধহয়, উভয়েই হীরা ব'লে, বাইরে থেকে একই-রকম দ্যুতি বিচ্ছুরণ করে।

ভারতচন্দ্রের হীরা - মালিনী। রাজবাড়ীতে ফুল যোগান তার পেশা। বয়সে বৃদ্ধা হ'লে কি হয়, রসে সে পরিপূর্ণা।"

—"কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গাল-ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা সাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র-মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।
পড়সী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়॥

আর বিষবৃক্ষের হীরা দাসী। আধুনিকযুগের হীরা মালিনী—নগেন্দ্র দত্তের বাড়ীর পরিচারিকা। তাই একটু স্বতন্ত্র ধাতুতে গড়া, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।—"হীরা বাল্যবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন তাহার স্বামীর কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেও কেহ কোন

কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় কেশবিন্যাস করিত, এবং বেশবিন্যাসে বিশেষ প্রীতা ছিল।

হীরা আবার সুন্দরী।—উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। দেখিতে খর্বাকৃতি; মুখখানি মেঘঢাকা চাঁদ; চুলগুলি যে সাপ, ফণা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। হীরা আড়ালে ব'সে গান করে; দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বাধাইয়া তামাসা দেখে; পাচিকাকে অন্ধকারে ভয় দেখায়; ছেলেদের বিবাহের আবদার করিতে শিখাইয়া দেয়, কাহাকে নিদ্রিত দেখিলে চূণ কালি দিয়া সং সাজায়।"

হীরা মালিনী বিদ্যা-সুন্দরের গোপন প্রণয়ে সহায়তা করেছে। কিন্তু সে শুধু দূর থেকে বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয়লীলা উপভোগ করেই সুখী। তার সাধনা যেন বৈষ্ণবরসিকদের রাধা কৃষ্ণলীলা আস্বাদনে সখীভাবের সাধনা। তাই শেষ পর্যন্ত তার পাপের শাস্তিও কম হয়েছে। কোটালের হাতে নিগ্রহ সহ্য করে হীরা মালিনী প্রতিজ্ঞা করেছে—

"যত দিন আর জীব কাহারে না বাসা দিব।
গিয়া তিন কাল শেষে এই হাল
খত বা নাকে দিব।"

আর হীরা দাসীকেও দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল বটে, কিন্তু সে নিজেই প্রণয়লীলায় অংশ গ্রহণ করেছে। হরিদাসী বৈষ্ণবীর খোঁজে হীরাকে নিয়োগ করলেন—সূর্যমুখী কমলমণি। হীরা আবিষ্কার করল—হরিদাসী বৈষ্ণবী আর কেউ নয়, কুন্দনন্দিনীর রূপে আসক্ত দেবেন্দ্র। কিন্তু কেবলমাত্র সংবাদ সরবরাহ করেই হীরা শান্ত থাকতে পারে না। সূর্যমুখীর সর্বনাশসাধন, কুন্দকে আয়ত্তে আনা এবং দেবেন্দ্রকেও কুক্ষিগত করার কামনা তাকে পেয়ে বসেছে। এখানেই তার স্বাতন্ত্র্য। সেই স্বাতন্ত্র্যের দ্বারাই সে কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সুখের সংসারে বিষবৃক্ষের ফল ফলিয়েছে। কিন্তু নিজেও রেহাই পায়নি। দেবেন্দ্রের প্রত্যাখ্যান তার হৃদয়ে শেলের মত বেজেছে। অনুরাগ তখন প্রতিহিংসার রূপধারণ করেছে। উন্মাদিনী হীরা দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় নিজের গরলামৃত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করে গেয়ে উঠেছে—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

দুই যুগের এই দুই হীরা সমান দীপ্তিময় হলেও, প্রকারে স্বতন্ত্র। ভারতচন্দ্রের হীরা রাজ দরবারের চাকচিক্যময় মহার্ঘ রত্নের অন্যতম, বঙ্কিম-চন্দ্রের হীরা জীবনসমুদ্রের অমৃতমন্থনে আহৃত। ভারতচন্দ্রের হীরা রাজসভায় শুধু শোভা পায়, হাসির ঝিলিক্ দিয়ে মাঝে মাঝে সবার চোখ ধাঁধায়। বঙ্কিমের হীরা শুধু ঝিলিক দেয় তাই নয়, তার ধারও যথেষ্ট, কাঁচের বুকে সে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে।

ভারতচন্দ্র দিয়ে গেছেন—কমল হীরা, বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে গেছেন—কাঁচকাটা

বঙ্কিম তাঁর সমসাময়িক কালেব এবং অবব্যাহিত পূর্ববর্তী কালের যে-সমস্ত গ্রন্থ এবং লেখকের কথা উপন্যাসে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, কৌতূহলী পাঠকদের সামনে সেগুলি তুলে ধরছি। এব থেকে তারা বঙ্কিমেব উপর বাংলাসাহিত্যেব এই গ্রন্থগুলি বা লেখকদের প্রভাব কতখানি তা নির্ণয় করতে করতে পারবেন। পৃষ্ঠাসংখ্যা 'সাহিত্য সংসদ' গ্রন্থাবলীর নিদেশে উল্লিখিত হল।

মেঘনাদবধ কাব্য	—	কপালকুণ্ডলা	১৪১, ১৫৬, ১৫৭ পৃ।
বীবাঙ্গনা কাব্য	—	„	১৬৮, ১৭১ পৃ.।
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	—	„	১৭৪ পৃ।
বিদ্যাপতি	—	„	১৬৯ পৃ.।
নবীনতপস্বীনী	—	„	১৬৩ পৃ।
মাধোকানেব গীত	—	বিষবৃক্ষ	২৬৯ পৃ।
গোবিন্দ অধিকাবীর গীত	—	„	২৬৯ পৃ।
দাশুরায়ের পাঁচালী	—	„	২৭২ পৃ, দুর্গেশনন্দিনী ৭০ পৃ।
গোপাল উড়ে	—	„	২৭৩ পৃ।
নিধুব টপ্পা	—	„	২৭৩ পৃ.।
বিদ্যাসুন্দর (ভারতচন্দ্র)	—	রজনী	৪৯২ পৃ, দুর্গেশনন্দিনী ৬৪ পৃ.।
অন্নদামঙ্গল	—	কৃষ্ণকান্তেব উইল	৫৬৭ পৃ.।

———

॥ ছয় ॥

বঙ্কিম উপন্যাসে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব

যে ইংরাজজাতি আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল, সেই ইংরেজের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছিলাম শৃঙ্খলমোচনের সূত্র। সেই সূত্র হল ইংরেজী সাহিত্য। বলা বাহুল্য, ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা যেটুকু ভাল জিনিস লাভ করেছিলাম তার মধ্যে ইংরেজী-সাহিত্য সর্বপ্রধান। কিন্তু ইংরাজ আগমনের সূচনাতেই একদিনে এই ইংরাজী সাহিত্যের ভালোটুকু আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। ভালোমন্দ মিশিয়ে প্রথমদিকে দেখা দিয়েছিল একটি সংশয়ের সংঘাত।

বাঙালীরা প্রথমদিকে চাকরীর খাতিরে যে-সব হেটো ইংরাজী ও মেঠো ইংরাজী ব্যবহার করত তার সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। সেসব ইংরাজী আমাদের কোন উপকার করেনি।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাঙালীদের ইংরাজী শিক্ষার জন্য নয়, ইংরেজদের বাংলাশিক্ষার জন্যই উল্লেখযোগ্য।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির প্রচেষ্টায় অনেকগুলি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান শ্রীরামপুরে অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করেন এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য প্রচারে সক্রিয় হয়েছেন।

কিন্তু বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যথার্থ ইংরাজী-সাহিত্য প্রচারে হিন্দু কলেজের অবদানই অধিক। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী আপার চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে রামমোহনের চেষ্টা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে সরে দাড়াতে হয়। কিন্তু রামমোহনই প্রথম যথার্থ বুঝেছিলেন—এদেশে ইংরাজী শিক্ষাধারার প্রবর্তন ভিন্ন জাতীয় উন্নতির কোন আশা নেই। তাই তিনি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্ষ্টকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার সমর্থনে একটি চিঠি লেখেন। এই মতামতই পরে সরকারী আনুকূল্যে প্রযুক্ত হয়ে বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার

পথকে সুপ্রশস্ত করে। রামমোহন রায় ব্যক্তিগতভাবে 'এ্যাঙ্গলো-হিন্দু স্কুলে'র প্রতিষ্ঠা ক'রে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ইংবাজী শিক্ষার প্রসারে মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ সাহেবের কথাও উল্লেখ করতে হয়। তিনি প্রথমে সাতটি ছাত্র নিয়ে 'জেনারেল এসেম্বলি ইনষ্টিটিউশন' গড়ে তোলেন। পববর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা প্রায ১২০০-তে গিয়ে দাঁড়ায়। পরে অবশ্য ডাফ সাহেব এই প্রতিষ্ঠান থেকে সরে গিয়ে 'কলেজ অফ দি ফ্রি চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মিলিত রূপ গ্রহণ করে স্কটিশচার্চ কলেজ। এইসব প্রতিষ্ঠানে ডাফ সাহেব পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর মতে—"The English Language, I repeat it, is the leaver which, as the instrument of conveying the entire range of knowledge is destined to move all Hindusthan."

ইংরাজী শিক্ষাব বিস্তাবে হিন্দু কলেজের অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। আবার এই কলেজেব স'গে যুক্ত তিনজন বিদেশীব নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পাবে। তাঁরা হলেন—ডেভিড হেয়াব, ডিরোজিও ও রিচার্ডসন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেযাব হিন্দু কলেজেব অধ্যক্ষ সভাব সদস্য হন। তিনি নানা প্রতিষ্ঠানেব সংগে যুক্ত থেকে একদিকে যেমন ই'রাজী শিক্ষার প্রসাবে সাহায্য কবেছেন, অন্যদিকে তেমনি এদেশীয়দের মাতৃভাষা চর্চাতেও আগ্রহী কবে তুলে'ছিলেন।

হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও উনবি'শ শতাব্দীব সাংস্কৃতিক পটভূমিকায একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি মাত্র পাঁচ বছব হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা কবেন (১৮২৬—১৮৩১)। কিন্তু এই অল্পবযসী তরুণ অল্পদিনের মধ্যেই বেশ কিছু প্রতিভাবান ছাত্রদের মনে স্থায়ী আসন লাভ কবেন।

ডি. এল. রিচার্ডসনেব ইংবাজী সাহিত্য পডানোব, বিশেষ ক'রে সেক্সপীয়ব পডানোর খ্যাতি সেকালে প্রায় কিংবদন্তীর আকাব ধারণ কবেছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৯—এই চাব বছব তিনি কৃষ্ণনগব, হুগলী এবং হিন্দু কলেজে অধ্যক্ষের কাজ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই হিন্দু কলেজেরই ছাত্র। অবশ্য তিনি আইন পডার জন্য হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে প্রাইভেটে বি এ পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের সূত্রে তিনি ইংরাজী সাহিত্য-সমুদ্রের সংগে পরিচিত হন।

বাল্যকালে হুগলী কলেজেও ইংরাজী সাহিত্য তাঁকে পাঠ করতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত জ্ঞানার্জনস্পৃহাতেও ইংরাজী সাহিত্য ছিল তাঁর অন্যতম পাঠ্য বিষয়।

বাংলাদেশে ইংরাজী সাহিত্যচর্চায় প্রধানতঃ তিনটি প্রবণতা দেখা যায়। প্রথমদিকে ইংরেজী সাহিত্যের সংগে পরিচয়ের আত্যন্তিক অনুরাগে ইংরাজী সভ্যতার মত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ইংরাজী চর্চার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইয়ং বেঙ্গল-এর ইংরাজী চর্চা তার প্রমাণ। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত ছাত্রদের ইংরাজী শিক্ষা বিপরীত ধারায় প্রবাহিত। তাঁরা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও হিন্দুধর্মের প্রতি আকর্ষণ বশতঃ ইংরাজীশিক্ষিত মন নিয়ে হিন্দু সংস্কারগুলিকে মার্জিত করার চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিদের ইংরাজী শিক্ষা যথাযথ সমীকরণের ফলে নূতন সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'Rajmohans wife' দিয়ে উপন্যাস রচনা সুরু করলেও 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যথার্থ ইংরাজী রোমান্সের বাংলা রূপায়ণ করলেন।

প্রতিটি গ্রন্থের কোথায় কতটুকু ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব আছে তার মূল্যায়ণ স্বতন্ত্রভাবে করা সম্ভব নয়। তবুও বঙ্কিম-উপন্যাসের যে-যে স্থানে ইংরাজী সাহিত্যের বিবিধ গ্রন্থ ও লেখকদের নাম উল্লিখিত হয়েছে তার একটি তালিকা আমরা দিয়ে দিলাম।

কমেডি অফ এররস	(সেক্সপীয়র)	—	কপালকুণ্ডলা,	১৩৭ পৃ
কিং লিয়র	„	—	„	১৩৯ পৃ . সীতারাম ৯৩০ পৃ
ডন জুয়ান	(বায়রন)	—	„	১৪০ পৃ.
লেজ্ অফ এনসেণ্ট রোম	মকলে	--	„	১৪৭ পৃ
রোমিও এণ্ড জুলিয়েট	(সেক্সপীয়র)	-	„	১৪৭ পৃ.
ম্যানফ্রেড	(বায়রন)	—	„	১৫৩ পৃ
ম্যাকবেথ	(সেক্সপীয়র	—	„	১৭৩ পৃ
	কীটস্	—	„	১৭৫ পৃ
	বায়রন	—	„	১৭৮ পৃ
হ্যাম্লেট	(সেক্সপীয়র)	—	„	১৭৯ পৃ
ওথেলো	(„)	—	„	১৮০ পৃ
লুক্রেসিয়া		—	„	১৮৩ পৃ
ওয়ার্ডসওয়ার্থ		.	„	১৮৫ পৃ.

সিটিজেন অফ দি ওয়ার্ল্ড	—	বিষবৃক্ষ	২৬৮ পৃ,	
স্পেক্টেটর	—	„	২৬৮ পৃ.	
বেকন	—	রজনী	৫০৬ পৃ.	
সক্রেতিস	—	„	৫০৬ পৃ.	
সেক্সপীয়র	—	„	৫০৬ পৃ.	
টিণ্ডল	—	„	৫০৭ পৃ.	
হক্‌সলী	—	„	৫০৭ পৃ.	
ডার্বিন (ডারুইন)	—	„	৫০৭ পৃ,	চন্দ্রশেখর ৪৪২ পৃ
লায়ল	—	„	৫০৭ পৃ.	
ভিক্টর হ্যুগো	—	চন্দ্রশেখর	৪৩৯ পৃ	
মার্ক আন্তনি	—	রাজসিংহ	৬৮৫ পৃ.	

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে স্কটের 'আইভ্যান হো'র প্রভাব সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বিশ্বসাহিত্যের রত্নরাজির সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই এই গ্রন্থে ইংরেজী বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি থেকে উদ্ধৃতি দ্বারা কাহিনীজাল বয়ন করা হয়েছে। কপালকুণ্ডলা-চরিত্রেও সেক্সপীয়রের মিরন্দা ও দেসদিমনা চরিত্রের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

স্বাভাবিক কারণেই ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি সেক্সপীয়রের প্রতি বঙ্কিমের অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। সেক্সপীয়রের মতই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে অলৌকিক ঘটনাগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে স্থাপন করেছেন। নাট্যগুণ এবং কবিত্বশক্তিও বঙ্কিম-উপন্যাসে সুলভ।

তবে একথা ঠিক যে ইংরেজী সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রকে ইংরাজী সাহিত্যের অনুবাদ প্রণয়ণে উদ্বুদ্ধ করেনি, যথার্থ বাংলাসাহিত্য রচনা করতে সাহায্য করেছে। এর চেয়ে বড় প্রভাব আর কিছু হতে পারে না।

— • —

॥ সাত ॥

বঙ্কিম-উপন্যাসে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগ সুবিদিত। "বঙ্কিম-উপন্যাসে যে সমস্ত সংস্কৃত কবি ও গ্রন্থের উল্লেখ আছে সেগুলি হল এরূপ।—

কাদম্বরী	—দুর্গেশনন্দিনী	৬৪ পৃ
বাসবদত্তা (সুবন্ধুকৃত)	— „	৬৪ পৃ.
গীতগোবিন্দ	— „	৬৪ পৃ., চন্দ্রশেখর ৪০৮ পৃ রজনী ৪৯২ পৃ.
স্মৃতি	— „	৭০ পৃ.
কালিদাস	— „	৭০ পৃ.
রঘুবংশ	-- „	৭০ পৃ কপালকুণ্ডলা ১৪৩ পৃ. ১৮৭ পৃ.
কুমারসম্ভব	„	৭০ পৃ „ ১৫৯, ১৮৩ পৃ.
মেঘদূত	-- „	৭০ পৃ. কপালকুণ্ডলা ১৫৮ পৃ
শকুন্তলা	— „	৭০ পৃ
বাল্মীকি রামায়ণ	— „	৭০ পৃ
উত্তর রামচরিত (ভবভূতি	— „	৭০ পৃ
কিরাতার্জুনীয় (ভারবি)	-- „	৭১ পৃ
নৈষধ (শ্রীহর্ষ)	— „	৭০ পৃ
'দূরাদয়শ্চক ... ...' (রঘুবং)	— কপালকুণ্ডলা	১৩৭, ১৬১ পৃ
রত্নাবলী	-- „	১৪৪ পৃ.
উদ্ধবদূত	— „	১৪৪. ১৮৫ পৃ
বিষ্ণুপুরাণ	— মৃণালিনী	২০৫ পৃ.
ব্রহ্মসূত্র	— চন্দ্রশেখর	৪০৫ পৃ.
শঙ্কর ভাষ্য	-- „	৪০৬ পৃ.
মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর (স্মৃতি	— „	৪১২ পৃ.
ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য (দর্শন)	— „	৪১২ পৃ.
কল্পসূত্র	— „	৪১২ পৃ.

আরণ্যক — চন্দ্রশেখর ৪১২ পৃ.
উপনিষদ্ — „ ৪১২ পৃ
যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ,
শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নলরাজা,
বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ইন্দ্র — „ ৪২৯ পৃ.
কুরুবংশ — „ ৪৪২ পৃ.
বিরাট — „ ৪৪২ পৃ.
কুবের, কন্দর্প, উর্বশী-মেনকা-রম্ভা—রাজসিংহ ৬১৭ পৃ.
রুক্মিণী, যদুপতি — „ ৬২৯ পৃ
অগ্নিবর্ণ — „ ৬৮৫ পৃ.
মধুকৈটভ, হিরণ্যকশিপু ; 'স
দন্তবক্র, শিশুপাল — আনন্দমঠ ৭৪২ প.
পুরাণ — „ ৭৫০ পৃ
ভট্টিকাব্য, রঘু, কুমার, নৈষধ,
শকুন্তলা — দেবী চৌধুরাণী ৮১৬ পৃ.
সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, শ্রীমদ্ভাগবত— „ ৮১৬ পৃ.
শ্রীরাধিকা, চন্দ্রাবলী — সীতারাম ৮৯২ পৃ
উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত,
কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি,
কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল — „ ৮৯৩ প
বেদান্ত, বৈশেষিক
বাগ্‌ভট, চরকসংহিতা, সুশ্রুত — „ ৯৫৪ পৃ.

'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'উত্তরচরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে বঙ্কিমের সংস্কৃত সাহিত্যের সংগে গভীর পরিচয়ের স্বাক্ষর মিলবে।

'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির নাটকের দোষ-গুণ সবই আলোচনা করেছেন। তবে সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনারীতির বাহুল্য ও বৈশিষ্ট্য তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রসঙ্গক্রমে ভবভূতি ও কালিদাসের বর্ণনারীতির যে পার্থক্য তিনি নির্দেশ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য—

"কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তি উত্তম।

কালিদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনী-মুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া বসে। কালিদাস, একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন; সুন্দর সামগ্রীগুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া সকল সূচিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলি সুন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়া দেন। এজন্য তাঁহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধুর্য্যপরিপূর্ণ হয়; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেইজন্য সফল হয় না। ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘষেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।” (উত্তরচরিত)

বঙ্কিম-উপন্যাসে বর্ণনারীতির কিঞ্চিৎ আধিক্য আছে এবং সে বর্ণনা যে ভবভূতি অপেক্ষা কালিদাসের সমগোত্রীয় সেকথা স্বীকার করতেই হবে।

‘উত্তরচরিত’ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টির স্বরূপ প্রভৃতি সাহিত্যসৃষ্টির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন:—

“কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।” (উত্তরচরিত)।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসেও নীতিজ্ঞানকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তার সংগে এই চিন্তাধারার যথেষ্ট মিল আছে। ‘চন্দ্রশেখর’, ‘বিষবৃক্ষ’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ প্রভৃতি উপন্যাসে নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র অনেকক্ষেত্রে সমালোচিত হলেও, রূঢ় সমালোচকও স্বীকার করবেন যে সেই নীতি সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে রসাস্বাদনে সহযোগিতা করেছে।

জয়দেবের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। বঙ্কিম-উপন্যাসের প্রথমদিকের বর্ণনায় (দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী) জয়দেবের প্রভাব আছে।

'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমেনো' প্রবন্ধটিকে সংস্কৃত ও ইংরাজীসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা বলা যেতে পারে। এই প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে এসেছেন—'শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।'

আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—"সুতরাং দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিনী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।"

কালিদাসের শকুন্তলায় সেক্সপীয়রের দুই নায়িকারই সমাবেশ ঘটেছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন। এই প্রবন্ধেরই সূত্র অনুসারে রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে চরিত্রটির পূর্ণতাপ্রাপ্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

কপালকুণ্ডলা চরিত্রও অনেকাংশে শকুন্তলার অনুরূপ। শকুন্তলার মত সেও প্রকৃতিপালিতা। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই তার পতন।

বঙ্কিমচন্দ্র, ইংরাজী সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন সেক্সপীয়রের, সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি কালিদাসের অধিকতর অনুরাগী।

সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আগ্রহী ছিলেন। 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম' ও 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচিন্তারই পরিণত প্রতিফলন ঘটেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃতানুরাগের সার্থক উদাহরণ 'আনন্দমঠ'-এর 'বন্দেমাতরম্‌' মন্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়েই আমরা এই বিষয়ের আলোচনা শেষ করছি—

"বন্দে মাতরম্‌।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্‌
শস্যশ্যামলাং মাতরম্‌।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্‌,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্‌,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্‌
সুখদাং বরদাং মাতরম্‌॥

সপ্তকোটীকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈধৃর্তখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!
বাহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।"

॥ আট ॥

বঙ্কিম-উপন্যাসে ইতিহাসচেতনার স্বরূপ নির্ণয়

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান একটি প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছে। এই উপাদান তিনি তাঁর সময়ের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু ঘটনা নির্বাচন ও পরিবেশনে লেখকের বিশেষ মানসিক গঠনটি ধরা পড়ে। অই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ইতিহাস-চেতনার স্বরূপনির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছি।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র লোকমুখে প্রচলিত গল্প থেকে যেমন কিছুটা গ্রহণ করেছেন, তেমনি ইতিহাসের আগ্রহী পাঠক হিসেবে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের কাছ থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এ বিষয়ে স্টুয়ার্টের History of Bengal এবং ও' মেলি-র Gazetteer of Samtal Pargana তাঁকে সাহায্য করেছিল বলে মনে হয়।

দুর্গেশনন্দিনী

তাছাড়া, যদুনাথ সরকারের মতে 'ঐতিহাসিক নামজাদা একজন ঘোর কাল্পনিক' কাপ্তান এলেকজাণ্ডার ডাও (Alexander Dow)-এর প্রভাব আছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর ('দুর্গেশনন্দিনী'র ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম' গ্রন্থের পরিশিষ্ট 'খ' ও যদুনাথ সরকারের লিখিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য। অন্যান্য উপন্যাসের ঐতিহাসিক তথ্যবিষয়েও এই বিধি প্রযোজ্য।)

বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যেটুকু ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তাকে খুব যে একটা আক্ষরিক অর্থে পরিবেশন করতে চেয়েছেন তা নয়। আসলে তাঁর লক্ষ্য ছিল ইতিহাসের আবারে কাহিনীর রোমাণ্টিক রস পরিবেশন। যে-যুগে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রণয়কাহিনী লিখতে বসেছিলেন, সে-যুগে তাঁর পক্ষে ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়া ছিল অনেক নিরাপদ। কাহিনীর প্রয়োজনেই বঙ্কিমচন্দ্রকে জগৎসিংহের মদ্যপায়ী ঐতিহাসিক রূপ অপেক্ষা আদর্শ নায়কের কল্পনাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। ওসমানকে এই কাহিনীতে যেভাবে প্রত্যক্ষ ঘটনায় আনয়ন করা হয়েছে—কালানুক্রম মানলে তা সম্ভব নয়। তাই বলা চলে এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপকরণ নির্বাচনে বঙ্কিমের

রোমান্টিক মানসিকতাই কার্যকরী হয়েছে। তবে দূরদ্রষ্টা বঙ্কিমের কল্পনা যে সার্থক হয়েছে তা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ইতিহাসের অংশ অত্যন্ত ক্ষীণ। এখানে তিনি কাল্পনিক কাহিনীকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল পটভূমি পরিস্ফুটনে। আড়াইশো-বছর পূর্বের কাহিনী বলতে গিয়ে তাই পর্তুগীজ জলদস্যুদের কথা, আকবর হুমায়ুনের কথা এসে পড়ে। মেহের-উন্নিসার যে-ঘটনাটুকু আছে তা-ও মতিবিবি বা লুৎফুন্নেসা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই। কেবলমাত্র মতিবিবিই এই উপন্যাসে ইতিহাস ও কাল্পনিক কাহিনীর যোগসূত্র। তা'ও মতিবিবি ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, ইতিহাসের সম্ভাবনা মাত্র।

কপালকুণ্ডলা

'মৃণালিনী'কে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দু'টি সংস্করণে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বললেও পরবর্তী সংস্করণে 'ঐতিহাসিক' বিশেষণটি প্রয়োগ না করা লক্ষণীয়।

মৃণালিনী

'মৃণালিনী' উপন্যাসে একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। সে ইতিহাস হল যবনহস্তে বাংলাদেশে সেন রাজত্বের অবসানের ইতিহাস। মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহীর দ্বারা বঙ্গবিজয় সম্পন্ন হয়েছিল—এই ঘটনাকে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই কলঙ্ক অপনোদনের জন্য এই ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন 'মৃণালিনী' উপন্যাসে। ঘটনার কিছু বিকৃতিসাধন করলেও মোটামুটি তিনি ইতিহাসের কাঠামোটি ঠিক রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই ইতিহাস সংগ্রহ করেন আবু ওমার মিনহাজউদ্দীন-এর 'তাবাকৎ-ই-নসিরি' নামক গ্রন্থের স্টুয়ার্ট সাহেবের অনুবাদ থেকে। এতে আছে—

"In the year 600, Mohammed Bukhtyar Khulijy, having acquired sufficient information of the unguarded state of Bengal, secretly assembled his troops; and marching from Behar, proceeded with such expedition toward Nuddeah, that his approach was not even suspected.

On his arrival in the vicinity of the city, he concealed his troops in a wood, and, accompanied by only seventeen horsemen, entered the city. On passing the guards, he informed them that he was an envoy, going to pay his respects to their master.

He was permitted to approach the palace; and having passed through the gates, he and his party drew their swords, and commenced a slaughter of the royal attendants.

The Raja Luchmunyah, who was then seated at dinner, alarmed by the cries of his people, made his escape from the palace by a private door, and, getting on board a small boat, rowed with the utmost expedition down the river."

অবশ্য, নদীয়া কিছুদিন বখ্‌তিয়ারের অধীন থাকার পর আবার সেন-রাজাদের হস্তগত হয়। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকের মতে বঙ্গজয়ের প্রধান গৌরব বখ্‌তিয়ারের পুত্র ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন মহম্মদেরই প্রাপ্য।

যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র যে ইতিহাসকে অনুসরণ ক'রে 'মৃণালিনী' উপন্যাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হন, তাকে অধিকাংশ স্থলেই যথাযথ রেখেছেন। কিন্তু দেশপ্রেমের চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করতে তাঁকে বাধ্য করেছিল। তার মধ্যে প্রধান হল—পশুপতি কর্তৃক অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ। পশুপতি কাল্পনিক হতে পারে, কিন্তু তার উপস্থিতি ইতিহাস-সমর্থিত।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজ দূরদৃষ্টিবলে যে মিন্‌হাজউদ্দিন-এর বর্ণনাতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা তার সমর্থন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস মধ্যেই লিখেছেন—"ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজ-উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন, মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্র-ফলক!" (৪/৪)।

বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাসে ইতিহাসের যে-অংশ নির্বাচন করলেন তাতে তাঁর দেশাত্মবোধ প্রকাশের প্রথম সুযোগ ঘটল।

বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের ঐতিহাসিক ঘটনা নির্বাচনে 'সয়ের মতাক্ষরীণ' (Seir Mutaherin) নামক পারস্য গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের যে অনুসরণ করেছিলেন সেকথা তিনি 'বিজ্ঞাপন'-এ স্বীকার করেন।

চন্দ্রশেখর

'চন্দ্রশেখর'-এর ঐতিহাসিক পটভূমিকা অধিকতর নিকটবর্তী কালের। ইংরাজের সংগে মীরকাশেমের বিরোধই এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমি। ঐতিহাসিক অংশের যথেষ্ট প্রাধান্য আছে এই গ্রন্থে। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র যথাযথ ইতিহাসের অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন।

মীরকাশেমের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ইতিহাস-অনুগত। গুরগণ খাঁর চরিত্রটি ঐতিহাসিক এবং তিনি যে ইংরাজের সংগে ষড়যন্ত্রে মীরকাশেমের সর্বনাশ করতে চেয়েছিলেন তাও সত্য। আমিয়ট, জগৎশেঠ ও অন্যান্য চরিত্রগুলিও ইতিহাস-অনুগত। কেবলমাত্র তকি খাঁ-র চরিত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। যে তকি খাঁ ইংরাজের সংগে যুদ্ধে মীরকাশেমের সৈন্যরূপে বীরোচিত মৃত্যুবরণ করেন, তাঁকে বিশ্বাসঘাতক ও বেগমের প্রতি প্রণয়াসক্ত ক'রে গড়ে তোলা হয়েছে।

এর প্রয়োজন হয়েছে কাহিনীর প্রয়োজনে। দলনী কাহিনীকে উপন্যাসের আঙ্গিকে স্থাপন করতে হলে তার মধ্যে এ-জাতীয় কিছু ঘটনা সংস্থাপনের প্রয়োজন ছিল।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর প্রণয়বৃত্ত ইতিহাসের কাহিনীর সংগে আলগা ভাবেই লেগে রয়েছে। মূল কাহিনীটিকে তাই ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে খুব একটা অঙ্গহানি হয় না। এখানেও ইতিহাস পটভূমি মাত্র। তবে সেই পটভূমি তাদের জীবন জটিলতার মতই, এক যুগসন্ধির জটিল আবর্তের। এই দুই আবর্তের মধ্যে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

'রাজসিংহ'কে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে আখ্যাত করেছেন। বস্তুতঃ 'রাজসিংহে'র মত এমন সর্বব্যাপী ইতিহাসচেতনা বঙ্কিমের খুব কম উপন্যাসেই আছে। এখানে ইতিহাস-কাহিনীই প্রধান, ব্যক্তিগত কাহিনী অপ্রধান। রাজসিংহ-ঔরংজেবের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব যতটা প্রকাশিত হয়েছে, সে তুলনায় চঞ্চল-রাজসিংহের প্রণয়-কাহিনী অনেকটা সংযত। অথচ পাঠককে নতুন কাহিনী শোনাতেও বঙ্কিম কসুর করেননি। তাই মবারক-জেবউন্নিসা ও মানিকলাল-নির্মল-ঔরংজেব কাহিনীর এত বিস্তার।

রাজসিংহ

রূপনগরের রাজকুমারীর মূল কাহিনীটি বঙ্কিমচন্দ্র জেমস টডের 'The Annals and Antiquities of Rajasthan' নামক গ্রন্থ থেকে গ্রহণ

করেছেন। ইতিহাসে যা ছিল বীজস্বরূপ, উন্যাসে তার বিস্তার ঘটেছে। ফলে জেবউন্নিসা-উদিপুরীর কাহিনী, মানিকলাল-নির্মলকুমারীর কাহিনী বঙ্কিমকে সৃষ্টি ক'রে নিতে হয়েছে।

ছোটখাট ভুল অবশ্যই আছে। রূপনগরের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারী আসলে কিষণগড়ের রাজকুমারী চারুমতী। জেবউন্নিসার চরিত্র আসলে ঔরংজেবের কনিষ্ঠা ভগিনী কখর উন্নিসার অনুরূপ। কিন্তু কাল্পনিক অংশে বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে ইতিহাসের সম্ভাবনা ও সত্যের প্রকাশ দেখিয়েছেন, তাতে তাঁর প্রশংসাই করতে হয়।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুদের বাহুবল প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন। ভেতো বাঙালীর মনে বীরত্বের জাগরণ ঘটানই কি ছিল বঙ্কিমের উদ্দেশ্য? 'রাজসিংহ' উপন্যাসে 'ধর্ম' ব্যাপারটিও উপেক্ষণীয় নয়। ধর্ম বলতে এখানে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস নয়, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বোঝান হয়েছে। তাই সত্যের পক্ষে রাজসিংহ জয়ী হয়েছেন, প্রবল প্রতাপশালী মিথ্যাপন্থী ঔরংজেবের বিরুদ্ধেও।

'আনন্দমঠ'-এর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'র 'বিজ্ঞাপনে' লেখেন—"আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ

আনন্দমঠ

করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে আনন্দ-মঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসি-বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

ফলে, বঙ্কিম 'আনন্দমঠে'র তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে 'Gleig's Memoris of the Life of Warren Hasting এবং W. W. Hunter's Annals of Rural Bengal' থেকে উদ্ধৃতি দেন।

'আনন্দমঠে'র দু'একটি সামান্য ঐতিহাসিক ভ্রান্তির মধ্যে অন্যতম হ'ল—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলার নবাব মীরজাফর ছিলেন না। মন্বন্তরের সময় মসনদে আসীন ছিলেন যথাক্রমে মীরজাফরের পুত্র সৈয়েফুদ্দৌলা ও মুবারেকুদ্দৌলা।

তবে 'আনন্দমঠ'কে কেউ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত করতে চাইবেন না। ইতিহাস এখানে পটভূমিমাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজ রাজত্বে পরাধীনতার যে গ্লানি অনুভব করেছিলেন, ইতিহাসের সার্থক এক ঘটনার মধ্য দিয়ে তাকে প্রকাশ করেছেন। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণই ছিল বঙ্কিমের উদ্দেশ্য, কিন্তু ডেপুটী বঙ্কিমের পক্ষে প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত আশ্রয়ের।

'দেবী চৌধুরাণী'র কাহিনীতে কিছু ঐতিহাসিকতা আছে, কিন্তু সে ঐতিহাসিকতা কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি, পরিবেশ বা পটভূমি রচনায় সাহায্য করেছে। বঙ্কিম গ্রন্থমধ্যে বর্ণনা করেছেন—

দেবী চৌধুরাণী

"তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই - হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবী সিংহের ইজারা।...সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্র ভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয় গৃহে পর্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে?" (১,৮)

অন্যত্র—'.....কাছারির কর্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালিয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান [illegible] সকলের সমক্ষে তাও প্রাপ্ত করায়।" (১।১৬)

বঙ্কিম পাঠককে ইতিহাস দেখার জন্য যে গ্রন্থ দেখবার কথা বলেছেন এবং নিজেও দেখেছেন, সেই 'Statistical Account of Bengal'-এর বর্ণনা এরূপ —"Rangpur, as a frontier province bordering on Nepal, Bhutan, Kuch Behar, and Assam, was peculiarly liable to be infested by banditti, who ravaged the country in armed bands numbering several hundreds.....The tract of country lying south of the stations of Dinajpur and Rangpur and west of the present district of Bogra, towards the Ganges,

was a favourite haunt of these banditti, being far removed from any central authority. In 1787, Lieutenant Brenan was employed in this quarter against a notorious leader of dakāits (gang robbers), named Bhawāni Pathak. He despatched a native officer, with twenty-four sepoys, in search of the robbers, who surprised Pathak, with sixty of his followers, in their boats. A fight took place, in which Pathak himself and there of his lieutenants were killed, and eight wounded, besides forty-two taken prisoners. Pathak was a native of Bajpur.···We catch a glimpse from the Lieutenant's report of a female dakāit, by name Debi Chaudhrāni, also in league with Pathak. She lived in boats, had a large force of barkandāzs in her pay, and committed dakāitis on her own account, besides receiving a share of the booty obtained by Pathak. Her title Debi Chaudhurāni would imply that she was a Zamindār—probably a petty one, else she need not have lived in boats for fear of capture."

Hunter : A statistical Account of Bengal, Vol. VII, Pp. 158-59

ইতিহাসের এই পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র গার্হ্যস্থধর্মের মহিমাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। সেই সংগে যুক্ত হয়েছে গীতার অনুশীলনতত্ত্বের পরীক্ষা।

'সীতারাম' উপন্যাসের একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই অংশের তথ্যের জন্য Westland এবং Stewart-এর বর্ণনা দেখতে বলেছেন। স্টুয়ার্ট-বর্ণিত কাহিনীর অংশবিশেষ :—

সীতারাম

"···a person of an illustrious family, named Syed Aboo Turab, having, through the interest of one of the Viziers, obtained the office of Foujedar of Bhoosnah in Bengal, adjacent to which resided a refractory Zemindar, named Sittaram, who kept in his pay a band of robbers, with whom he used to infest the roads and plunder the boats on the rivers, and even carry off the cattle from the villages, setting at defiance the power of the Foujedar—to extirpate this public depradator, Aboo Turab applied for assistance to the Nawab ; but, instead of affording him the required aid

he was supposed, in an underhand manner, to countenance and encourage Sittaram.

At length the Foujedar, finding he had nothing to expect from the governor, took into his own pay an Afghan officer, named Peer Khan, with 200 of his followers, well-mounted and armed, and sent him to beat up the quarters of the depradator, but Sittaram, having intelligence of the circumstance, moved to another part of the country, where by chance he fell in with the Foujedar, who was amusing himself in hunting, and attended by a very small escort. The robbers immediately attacked the Foujdar and his party, and, before their chief came up, killed Aboo Turab. When Sittaram found that it was the Foujedar he had slain, he much regretted the circumstance, and told his followers that the Nawab would certainly revenge the insult offered to his government, by flaying them alive, and by desolating the Pergunnah of Mahmoodabad: he then respectfully delivered the body to the Foujedar's attendants, who carried it to Bhoosnah, and interred it in the vicinity of that town

When the Nawab received intelligence to the murder of Aboo Turab, he was greatly alarmed, being apprehensive of having incurred the displeasure of the emperor by his neglect of so respectable a person ; and who he knew had many friends about the court, who would not fail to represent the state of the case. He therefore appointed Bukhsh Aly khan to succeed the deceased ; and sent with him a considerable force, with instructions to seize Sittaram and all his party. Orders were also issued to all the neighbouring Zemindars, to assist in seizing the offender ;··· the Zamindars raised their pcsse comitatus and hemmed the robbers in one every side, until Bukhsh Aly Khan arrived, who seized Sittaram, his women, children and accomplices, and sent them in irons to Moorshidabad, where Sittaram and the robbers were impaled alive, and the women and children sold as slaves,"

Stewart : History of Bengal (Edited by Mouat), Pp. 239-40

বাংলা—"ভূষণার ফৌজদার ছিলেন সৈয়দ আবু তোরাব। নিকটে সীতারামের জমিদারি। সীতারামের অধীনে একদল ডাকাত থাকে। ডাকাত অনুচরদের সাহায্যে তিনি রাহাজানি করেন এবং নৌকার উপর চড়াও হন। গ্রাম হতে গরু-বাছুর নিয়ে কখনও পলায়ন করেন। জনগণের অনিষ্টকারী এই দস্যুসর্দার সীতারামকে দমন করার জন্য নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন তোরাব, কিন্তু সে সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হন না। অবশেষে ফৌজদার নবাবের নিকট সাহায্য না পেয়ে পীর খাঁ নামক এক আফগান সেনাপতিকে দুইশত সশস্ত্র সৈনিকসমেত সীতারামকে ধরার জন্য প্রেরণ করেন। এই খবর পেয়ে সীতারাম দেশের অন্যত্র গমন করেন। সেখানে ছোট একটি দল নিয়ে ফৌজদার নিজে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সীতারামের অনুপস্থিতিতে তাঁর দল তোরাবের উপর চড়াও হয় এবং তোরাবকে হত্যা করে। সীতারাম যখন দেখেন যে, ফৌজদার নিহত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। কারণ, নবাব এই সংবাদে সীতারামের উপর আক্রমণ করবেন। সীতারামের মহম্মদাবাদ পরগণা ধ্বংস ক'রে দেবেন। সীতারাম শ্রদ্ধাসহকারে তোরাবের মৃতদেহ তাঁর অনুচরদের হস্তে সমর্পণ করেন। তোরাবের অনুচররা সেই মৃতদেহ সম্মানসহকারে' ভূষণায় নিয়ে গিয়ে শহরের প্রান্তে কবরস্থ করেন। নবাব যখন আবু তোরাবের মৃত্যুসংবাদ পান, তখন তিনি বক্সী আলি খাঁকে তোরাবের স্থলে নিযুক্ত ক'রে সীতারামকে সদলবলে ধরার নির্দেশ দেন। সীতারাম তাঁর স্ত্রী-পুত্র এবং দস্যুদল সমভিব্যাহারে ধৃত হন। তাঁদের শৃঙ্খলিত অবস্থায় মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়। সীতারাম ও দস্যুদের জীবন্ত প্রোথিত করা হয়। স্ত্রী-পুত্রদের দাসদাসীতে রূপান্তরিত করা হয়।"

(শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়—"কথা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র")

ওয়েস্টল্যাণ্ড বর্ণিত কাহিনীর অংশবিশেষ :—

"The Zemindari of Bhusna came whether by heredity descent or by some other means, into the hands of Raja Sittaram Roy. The Zemindari he held for fourteen years, during which time he built Muhammadpur for his capital, and adorned it with many fine buildings and tanks,···Before his time Muhammadpur was not in existence, and its site was a mere rice plain, the capital being then probably Bhusna, on the other side of what is now the Madhumati,.

what was then only a small Khal, the Alangkhali. At the beginning of the century, Muhammadpur was one of the chief towns in the district, it was in fact only of late years, that is, since 1836, that it has fallen from its high estate,

Of the origin of Sittaram Roy more that one story is current. The first story I shall narrate runs this :—

On the other side the present Madhumati River there is a village, Hariharnagar. In this village Sittaram had a taluq. He held also a jumma in another village, Shyamnagar, close to the present Muhammadpur. One day he was riding across from his village, Hariharnagar, to see the jumma, when his horse's feet so stuck in the mud that it could not be got out. So he made some men dig up the ground so as to extricate the horse's feet, and in so doing they came upon a trishul or Hindu trident. Digging still further, they found it was the pinnacle of a temple which they accordingly proceeded to dig up. Inside the temple they found the idol Lakshmi Narayan.……

Lakshmi Narayan is the God of good fortune ; and when Sittaram was, in the manner just described, proclaimed the favourite of the gods, he was not long in finding adherents. He was himself an uttar rāre Kayath (an upcountry Kayath by caste), and ever so many upcountrymen flocked to him. He either received them, or he previously had in his service a certain giant, a mighty son of valour, named Menahati, from his elephantine strength ; and this Menahati was, or became, the leader of a troop of fighting men.

Sittaram, strengthened by this accession, now planted himself at the place where Lakshmi Narayan had appeared… With the aid of his little army he commenced a war of aggression upon the possessors of the Bhusna Zemirdari, and having obtained the Zemindari, fortified himself in it, refused to pay rents to the nawab and lived in magnificence on the produce of his lands.

……I consider the above story a mere dilution of the original legend, which I am about to relate, and which is probably nothing more than an embellishment of the truth.

In this part of the country there were twelve provinces, and the rajahs of these twelve provinces were (as was much the custom in those days) rather remiss in sending to the emperor, or his nawab at Dacca the revenues assessed upon their lands. Sittaram was accordingly deputed by the emperor of Delhi to "investigate" the matter by force of army, and this duty he performed with such effect that he not only turned the twelves rajahs out of possession, but installed himself as lord of their domains. The nawab now demanded from Sittaram the revenues due upon his lands, but Sittaram refused to ackowledge his authority. He held his land from the emperor above, and to the emperor alone would he pay his rents·· ···.

Of Sittaram's history after his acquisition of the Zemindari the legend has only one form. The nawab being refused his revenues, levied war against Sittaram ; but the latter, who had fortified himself in Muhammadpur, and gathered around him many soldiers and servants, chief of whom were Menahati,·· Bakhtyar Khan, Muchra Singh, and Ghabar Dalan, was able to hold his own against the nawab's men.

Then the nawab sent against him his son-in-law, Abu Tarab, and he had a battle with Sittaram's men ; but again the redoubtable Menahati was victorious having slain Abu Tarab with his own hand.

So the nawab now sent a more formidable force under his great general Singharam Sha ; and he came to Bhusna and established his camp there. Profiting by the experience of his predecessors, he resolved to get Menahati into his power first before making any attack. Watching for his opportunity he at last captured him as he was passing the dhol mandir in the morning······Another account says that, receiving information from a spy, he secretly crossed the river at night, and captured Menahati sleeping at the 'Lion gate' which was······the entrance to Sittaram's citadel, and close to the dhol mandir.

Menahati who was thus caught unarmed was bound by

his capturers, who kept him for seven days, belabouring him with sticks and hacking him, with swords. Menahati kept continually about him a wondrous drug which was bound under the skin in front of his right shoulder, and its virtue was such that though it could not prevent him from feeling the pain of blows, it rendered his body inpenetrable to stick and sword. Wearied, however, with the continual assaults...... and willing rather to suffer death than a life with such pain, he at last confessed the secret of the drug. The influence of it could be got rid of by taking him to the bank of the Ram Sagar......plucking it from his arm, and throwing it into the water of the tank. So they did, and so Menahati died.

When Sittaram heard of the capture and death of his faithful general, he knew that his time too was come. He accordingly went and surrendered himself, or, more likely, was carried captive, to the nawab of Dacca, who locked him up in prison. He lingered there for a little time, but at last, when an officer of the nawab came to him and told him that there was no hope, and he was sure to be hanged, he sucked poison from a ring which Hannibal-like, he kept against such emergencies, and so he died. The nawab sent for 'Sittaram to his darbar, but found that he had placed himself beyond his power.

There is some confusion here between the nawab at Dacca and the nawab at Moorshidabad. It is however excusable, seeing that these events occured at the very latest about 1712 or 1714 A. D. less than ten years after the transfer of the nawab's capital from Dacca to Moorshidabad."

J. Westland : A Report of the District of Jessore, Pp. 25-28

বাংলা—"ভূষণার জমিদারি উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা অন্য কোন উপায়ে রাজা সীতারাম রায় প্রাপ্ত হন। চৌদ্দ বৎসর ধরে তিনি জমিদারি রক্ষণ করেন, বহু অট্টালিকা সরোবরে সুশোভিত ক'রে মহম্মদপুরকে রাজধানী করেন। তাঁর পূর্বে মহম্মদপুরের কোন অস্তিত্ব ছিল না।..... সীতারামের উদ্ভব সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথম কাহিনীটি এইরূপ।

মধুমতী নদীর অপর পারে হরিহরনগর নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে সীতারামের তালুক ছিল। বর্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্তী শ্যামনগরে সীতারামের জমা ছিল। একদিন তিনি অশ্বারোহণে হরিহরনগর হতে জমার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর ঘোড়ার পা কাদায় আটকে যায়। ঘোড়ার পা কাদা হতে তুলতে না পারায় সেখানকার মাটি খোঁড়ার ব্যবস্থা করা হয়। খুঁড়তে খুঁড়তে একটি মন্দিরের মাথার ত্রিশূল এবং মন্দিরের লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ পাওয়া যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সীতারাম নিজেকে 'দেবকুলপ্রিয়' বলে উল্লেখ করেন। অবিলম্বে অনেকে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেন। সীতারাম নিজে উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। এখন নানা দিক হতে উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ তাঁর চতুর্দিকে এসে হাজির হন। অপরিসীম শক্তি-শালী মেনাহাতি (হাতির মত শক্তিশালী মেনা বা মৃন্ময়) তাঁর প্রধান সেনাপতি হন। সীতারাম তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্যদলের সাহায্যে ভূষণার জমিদারি অধিকার করেন। চারিদিক দৃঢ়ভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। নবাবকে কর দিতে অস্বীকার করেন।.......

ওয়েস্টল্যাণ্ড মনে করেন, "উদ্ধৃত ঘটনা আসল ঘটনার অলঙ্কৃত রূপমাত্র। আসল ঘটনাটি হল, তখনকার দিনে বাংলাদেশের এই অংশ বারোটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই বারোটি প্রদেশের রাজারা করদানের বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করায় দিল্লীর বাদশাহ সীতারামকে ক্ষুদ্র সৈন্যদলের অধিকর্তা ক'রে এই বিষয়ে তদারকির ভার দেন। সীতারাম তাঁর কার্য এরূপভাবে সম্পন্ন করেন যে, এই বারো রাজা কেবল উৎখাত হন না, সীতারাম নিজেকে সকলের ভূখণ্ডের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন। নবাব সীতারামের নিকট কর চান। কিন্তু সীতারাম তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। নবাব সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সীতারাম মহম্মদপুরকে সুরক্ষিত ক'রে অনেক সৈন্য এবং অনুচরের দ্বারা মহম্মদপুর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে মেনাহাতির নাম উল্লেখযোগ্য। নবাব যুদ্ধে সফল না হ'য়ে জামাতা আবু তোরাবকে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। দুর্ধর্ষ মেনাহাতি যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং আবু তোরাবকে স্বহস্তে হত্যা করেন। নবাব এইবার অনেক সৈন্য সমভি-ব্যাহারে বিখ্যাত সেনাপতি সিংহরাম শাকে প্রেরণ করেন। মেনাহাতি ধৃত হন এবং তাঁর মৃত্যু ঘটে। সীতারাম মেনাহাতির মৃত্যুতে ভগ্নহৃদয়ে আত্মসমর্পণ করেন অথবা খুব সম্ভবতঃ বন্দী অবস্থায় নবাবের নিকট নীত হন। নবাব

তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেন। বন্দী অবস্থায় বিষপূর্ণ অঙ্গুরীয়কের সাহায্যে সীতারাম আত্মহত্যা করেন।"

(সুধাকর চট্টোপাধ্যায় : কথা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র)

"এই কাহিনীর সহিত উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনীর নিম্নলিখিত সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয় :

১। শ্যামনগর গ্রাম উপন্যাসে শ্যামপুর নামে অভিহিত হইয়াছে এবং এই গ্রামই সমৃদ্ধিলাভ করিয়া সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুরে পরিণত হইয়াছে। ওয়েস্টল্যাণ্ডের কাহিনীতে মহম্মদপুর পূর্বে ধানের ক্ষেত ছিল।

২। উভয় কাহিনীতেই যুদ্ধক্ষেত্রে মেনাহাতির (উপন্যাসের 'মৃন্ময়') হস্তে আবু তুরাবের (উপন্যাসের তোরাব্ খাঁ) মৃত্যুর উল্লেখ রহিয়াছে।

৩। ওয়েস্টল্যাণ্ড সাহেবের কাহিনীতে মেনাহাতি অতর্কিতে শত্রু কর্তৃক ধৃত হন, বঙ্কিম এই কাহিনীর উপর ঈষৎ রং ফলাইয়া লিখিয়াছেন, 'প্রাতে উঠিয়াই মৃন্ময় সংবাদ শুনিলেন যে, মুসলমান সেনা মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে—আগতপ্রায়—প্রায় গড়ে পৌছিল। ··· সংবাদ পাইবামাত্র মৃন্ময় সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছুদূর গিয়া মুসলমান সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তিনি পলাইতে জানিতেন না, সুতরাং তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।' ওয়েস্টল্যাণ্ডের গ্রন্থে মেনাহাতির রক্ষাকবচের যে আজগুবী কাহিনী রহিয়াছে বঙ্কিম তাহা সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছেন।

৪। বঙ্কিমের সীতারাম শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। অথবা শত্রু কর্তৃক বন্দী হন নাই। তিনি শেষ মুহূর্তে তোপের সাহায্যে পথ করিয়া লইয়া 'নিজ মহিষী ও পুত্র কন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমানকটক কাটিয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ লইলেন।' বঙ্কিমের এই কাহিনী অনৈতিহাসিক এবং সম্পূণ কাল্পনিক।

৫। কাজীর আদালতে গঙ্গারামের বিচারের প্রহসন এবং ইহার সূত্র ধরিয়া ফৌজদারের সিপাহীর সহিত সীতারামের সজ্ঘর্ষ, সীতারাম ও শ্রীর প্রণয় কাহিনী, গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাহার বিচার সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী।"

(প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত : উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম)

আসল কথা, বঙ্কিম ইতিহাসকে কোথাও গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করেননি, কিন্তু ইতিহাসের উপাদানে জীবনকাহিনী বর্ণনাই ছিল তাঁর মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

'সীতারাম' মূলতঃ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রচনা। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় 'সীতারাম' প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যাতেই বঙ্কিমের দুটি প্রবন্ধ 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' ও 'হিন্দুধর্ম'-এর মধ্যে উপন্যাসের উদ্দেশ্যটিও প্রকাশিত। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর বাহুবলের অভাবের কলঙ্কের কথা আলোচনা করেছেন। সীতারমকে দিয়ে বাঙালীর বাহুবলের অভাব মোচন করা হল। 'হিন্দুধর্ম'-এ বলা হয়েছে—যাতে জীবনের "শরীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয় তাহাই ধর্ম।" সীতারামের মধ্যে ঐ মানসিক উন্নতির অভাবই তাঁকে সর্বনাশের পথে টেনে নামিয়েছে।

বঙ্কিম-উপন্যাসের এই যে ঐতিহাসিক উপকরণ চয়নের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হল, এ থেকে সিদ্ধান্ত সহজেই নেওয়া চলে যে বঙ্কিম ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন, তাঁর সমসাময়িক কালের মানসিকতাকেই প্রকাশ করতে। ইতিহাস তাই কম বেশি পটভূমিই রয়ে গেছে।

ইতিহাস নির্বাচনে বঙ্কিম ভুল করেন নি। তিনি এমন সব ঘটনা চয়ন করেছেন যা ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে বঙ্কিম-মানসের স্বরূপটি ধরিয়ে দেয়।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে যা ছিল নিছক রোমান্টিকতার আশ্রয়, 'মৃণালিনী'তে তা দেশাত্মবোধের সূচনা করল। 'রাজসিংহ' থেকে দেশাত্মবোধ ও ধর্মচেতনার (অল্প) মিশ্রণ ঘটল। কিন্তু 'আনন্দমঠ'-এ দেশাত্মবোধ যেমন উগ্র, 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' উপন্যাসে গীতোক্ত ধর্মচিন্তা তাঁকে অধিক প্রভাবিত করেছে।

তাই ইতিহাসচেতনা বঙ্কিম-প্রতিভার এক বিশেষ সরণি। এই পথ ধরেই তিনি পাঠকের হৃদয়ে আধুনিক উপন্যাসের আবেদন এনেছেন।

॥ নয় ॥

বঙ্কিম-উপন্যাসে পাঠান্তর প্রসঙ্গে বঙ্কিম-মানসের ক্রমবিকাশ

সচেতন শিল্পী সবসময়ই নিজের রচনাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে নিরীখ ক'রে থাকেন। তবে বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত সচেতন শিল্পীমন, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর চোখে পড়ে না। প্রতিটি সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন।

কেন করেছেন? না তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। কি সেই পরিবর্তিত মানসিকতা—একটু আলোচনা করলেই ধরা পড়বে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাঠান্তর অনেকক্ষেত্রে দু'ভাবে ঘটেছে। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে—গ্রন্থকারে প্রকাশের সময় একবার ও তার পরে সংস্করণভেদে বিভিন্নবার। এই দুই ধরণের পাঠভেদ সাহিত্যপরিষদ সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে ও প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের 'উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম' গ্রন্থে নির্দেশিত হয়েছে। আমরা এখানে সেগুলি সব উদ্ধৃত করব না। ছোটখাট পাঠভেদও আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য পাঠভেদে বঙ্কিম-মানসের পরিণতির স্তরটি লক্ষ্য করব।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখন বঙ্কিমের বয়স ২৭ বছর। তাঁর জীবিতকালে শেষ ১৩শ সংস্করণ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স ৫৫ বছর। বয়সের সংগে সংগে বঙ্কিমের রুচিবোধের কিরকম পরিবর্তন ঘটেছে তা তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী'র এই দুই সংস্করণের কয়েকটি পাঠান্তর আলোচনা করলেই ধরা পড়বে। কাহিনীতে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন তাঁকে করতে হয় নি। কিন্তু বর্ণনায় যেখানে আদিরসের বাহুল্য ছিল, সেগুলি বঙ্কিম নির্মম ভাবে বর্জন করেছেন।

দুর্গেশনন্দিনী

বর্তমান—"৯৯৬ সালে মানসিংহ পাটনা নগরীতে উপনীত হইয়া প্রথমে অপরাপর উপদ্রবের শান্তি করিলেন।" (১/৩) এর প্রথমে ছিল—"যখন নবধর্মানুরাগে মুসলমান সেনাতরঙ্গ হিমাদ্রিশিখরমালা হইতে বলদর্পে ভারতবর্ষে অবতরণ করে, তখন পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি রাজপুত বীরেরা অসাধারণ শৌর্য সহকারে সেই বেগের প্রতিরোধ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অধোগতি বিধাতার ইচ্ছায়

ছিল, সুতরাং রাজপুত সম্রাটেরা তৎকালে পরস্পর সংমিলিত না হইয়া, একে অন্যের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। মুসলমানেরা যত্নপৌনঃপুন্যে হিন্দু-রাজগণকে একে একে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়-কুল-সম্ভব রাজপুতগণকে একেবারে তেজোহীন করিতে পারিলেন না। অনেক রাজপুত ভূপাল স্বাধীন রহিলেন; ও অদ্যাবধি মুসলমান রাজ্য লোপ পর্যন্ত রাজপুতেরা পুনঃ পুনঃ যবনদিগকে রণক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, অনেকবার পরাঙ্মুখও করিয়াছিলেন। কালে অনেক রাজপুত বংশকে দিল্লীশ্বর চরণে করপ্রদ হইতে হইল। এবং বাহুবলের নির্যাতনে জাতিকুল-গৌরব ত্যাগ করিয়া দিল্লীর রাজবংশে কন্যা সম্প্রদানাদির দ্বারা নেতার পরিতোষ জন্মাইতে হইল। দিল্লীর অধিপতিগণও বীরবৈরিকে সখিত্ব কুটুম্বিতাদির দ্বারা বাধ্য করিতে যত্নবন্ত হইলেন। ক্রমে করপ্রদ রাজপুত রাজগণ দিল্লীর রাজকার্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন।"

এই বর্ণনাটি বাদ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর গতি বাড়াতে চেয়েছেন বলেই মনে হয়।

"বাঙ্গালার পাঠান সম্রাটদিগের শিরোভূষণ……… …এখানে বসতি করিতেন।" (১/৫)

এর পরিবর্তে ছিল—"এই কয়েক দুর্গ মধ্যে একবংশীয় কয়েক জন সম্পত্তি-শালী ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ বসতি করিতেন। কিন্তু প্রথম কথিত দুর্গ ব্যতীত অন্য গড়ের সহিত অত্র আখ্যায়িকার সংস্রব নাই।

যৎকালে দিল্লীশ্বর বালিন সসৈন্যে বঙ্গ জয় করিতে আইসেন, তখন জয়ধরসিংহ নামে একজন সৈনিক সম্রাটের সঙ্গে আসিয়াছিলেন; যে রাত্রে বালিনের জয়লাভ হয়, সেই রাত্রে ঐ সৈনিক অসম্ভব সাহস প্রকাশ করিয়া দিল্লীনাথের কার্যোদ্ধার করেন; দিল্লীশ্বর পুরস্কার-স্বরূপ তাহাকে এই গড়মান্দারণ গ্রামে এক জায়গীর দান করেন। জায়গীরদারের বংশ ক্রমে বলবন্ত হইয়া বঙ্গেশ্বরকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল, এবং স্বেচ্ছামত দুর্গ নির্মাণ করিল। যে দুর্গের বিস্তারিত বর্ণনা করা গিয়াছে, ৯৯৮ অব্দে তন্মধ্যে বীরেন্দ্র সিংহনামা জয়ধর সিংহের একজন উত্তর পুরুষ বসতি করিতেন।"

এই বর্ণনাটির মূল আখ্যায়িকার সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় বঙ্কিম এটিকে সংক্ষেপ করেছেন।

"বি। "তবে শুনুন"······বিমলা বেগে প্রস্থান করিল।" (১/১০) এর পরিবর্তে ছিল—

"আমার উপপতি আছে।"

"উপ-ছাই আছে ; কোথা যাবি বল্।"

"বলি।"

এই বলিয়া বিমলা এক বাহু,--স্পর্দ্ধা শুন পাঠক ! এক বাহু বীরেন্দ্রের গলদেশে দিলেন, অপর বাহু তাঁহার বক্ষোমধ্যে রোপণ করিলেন ; বীরেন্দ্রের হৃদয়ে কাঁচলিমুক্তা স্পর্শ হইল। একবার দ্বারের দিকে নেত্রপাত করিয়া নিজ রসাল ওষ্ঠাধর বীরেন্দ্রের ওষ্ঠে সংলিপ্ত করিলেন।

বিমলা প্রগাঢ় মুখচুম্বন করিয়া বেগে তথা হইতে পলায়ন করিলেন।"

এই অংশটি থাকিলে বিমলা-বীরেন্দ্রের চরিত্রমাহাত্ম্য যেমন ক্ষুণ্ণ হ'ত, তেমনি আদিরসেরও বাড়াবাড়ি ঘটত।

"তিনি সেই অবধি মাথায় বরফ দিয়া বসিয়া আছেন।" (১/১২) কথাগুলির পর ছিল—

"নিতম্ব ধরার অপেক্ষাও বৃহৎ, তাহাতে বিস্তর গাছপালা, গো, মনুষ্যাদি বাস করিতে পারে, কিন্তু নিতম্বে তৎস্বরূপ দুইটি কদলী গাছ ; কদলীগাছের আওতায় অন্য গাছ গজায় না, আর পাছে কলা গাছ খাইয়া ফেলে বলিয়া বিধাতা তাহাতে গো মনুষ্যাদি সৃষ্টি করেন নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই বর্ণনায় যদি কোন অরসিক পাঠক আশমানির স্বরূপ নিরূপণ করিতে না পারিয়া থাকেন তবে তাহাকে সোজা কথায় বলিয়া দিতে পারি। বিমলার অপেক্ষা আশমানির বয়স প্রায় সাত বৎসর ন্যূন ; মুখ, চোখ, নাক, কাণ সামান্য মত, বর্ণ শ্যামোজ্জ্বল, মুখখানি একটু হাসি হাসি, চক্ষুও সেই ভাব ; দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে, শ্রী আছে। আকারে খর্ব ; গঠন স্থূল, বেশ বিন্যাসের বড়ই পারিপাট্য। আশমানি বড় রসিকা ; ব্যঙ্গ ছলনা প্রভৃতিতে বড় ভক্তা। হিন্দুস্থানির কন্যা, ভাল বাঙ্গালা কহিতে পারিত না, তাহার অর্দ্ধেক হিন্দি, অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শুনিয়া দাস দাসী সকলেই হাসিত, আশমানি আপনিও হাসিত। আশমানি বিমলার ন্যায় বড় চতুরা বলিয়া খ্যাতা ছিল। বীরেন্দ্র জানিতেন সে বড় বিশ্বাসী। বিমলা জানিতেন সে সাধ্বী।"

আদিরসের বাহুল্যও এই বর্ণনা বর্জনের একটি কারণ। তাছাড়া বিমলা ও

আশ্‌মানির তুলনামূলক আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। চরিত্রবৈশিষ্ট্য এভাবে একেবারে প্রকাশ ক'রে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

"দি। তাও কি হয় ?" (১/১৩) এর পর থেকে এই পরিচ্ছেদের শেষাংশের পরিবর্তে ছিল।—

"খাও ; শোন," আশ্‌মানি গজপতির কাণে কাণে কি কহিল। ব্রাহ্মণ আসন হইতে অর্ধ হস্ত লাফাইয়া উঠিলেন।

"তবে খাই", বলিয়া দিগ্‌গজ উচ্ছিষ্ট অন্ন গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলেন। নিমেষ মধ্যে ভোজনপাত্র শূন্য করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি কই ?"

"মর্ এঁটো মুখে ?"

"হুম্ হুম্—আঁচাই আঁচাই" বলিয়া গজপতি আস্তে ব্যস্তে মুখে জল দিতে লাগিলেন ; কতক জল লাগিল কতক জল লাগিল না ; দন্তমধ্যে আধপোয়া চালের অন্ন, পান্তা হাঁড়িতে রহিল।

"কই সুন্দরি অধরসুধা কই ?"

"মর্ আগে হাত মুখ মোছ্।"

ব্রাহ্মণ ত্রস্ত হইয়া কোঁচায় হাত মুখ মুছিতে লাগিলেন। সাড়ে চারি হাত ধুতির কোঁচা তাঁহার মুখ পর্যন্ত তুলিলে কাপড় পরা বৃথা হয়,—তা কি করেন ?

"এখন সুন্দরি ?"

"এদিকে আইস।" দিগ্‌গজ আশ্‌মানির কাছে গিয়া বসিলেন।

"মুখের কাছে মুখ আন।" দিগ্‌গজ আশ্‌মানির মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

"হাঁ কর।" যা বলে তাই, দিগ্‌গজ আধ হাত হাঁ করিলেন। আশ্‌মানি রুমাল হইতে একটি তাম্বুল লইয়া চর্বণ করিতে লাগিল। দিগ্‌গজ হাঁ করিয়াই রহিলেন।

পান চিবাইয়া পানের পিক এক গাল পরিপূর্ণ হইলে আশ্‌মানি সেই সমুদায় ছোপ্ দিগ্‌গজের হাঁর ভিতর নিক্ষেপ করিল।

দিগ্‌গজ এক গাল থুতু মুখের মধ্যে পাইয়া মহা অকষ্ট বন্ধে পড়িলেন ; প্রেয়সী মুখে পান দিয়াছে, ফেলিতে পারেন না, পাছে অরসিক বলে ; গিলিতেও পারেন না, এই ভোজনের পর এক গাল থুতু কেমন করেই বা গেলেন, নীলকণ্ঠের বিষের ন্যায় গালের মধ্যেই রহিল।

এই অবকাশে আশ্‌মানি একটি খড়কা লইয়া দিগ্‌গজের বিপুল নাসিকার

মধ্যে প্রেরণ করিল; হাঁচি আসিল, আর মুখমধ্যস্থ সমুদয় অম্বুতরাশি বেগে নির্গত হইয়া দিগ্‌গজের ক্ষীণ বপুঃ প্লাবিত করিল।

ব্রাহ্মণ দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গাত্র ধৌত করিতে লাগিলেন, এই সময়ে একটি সরস কবিতা আওড়াইলেন।

"দক্ষিণে পশ্চিমে বাপি ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।"

গাত্র ধৌত হইলে পর পুনরপি আশ্‌মানির নিকটে আসিয়া বলিলেন, "প্রেয়সি, এ ত মুখসুধা পাইলাম; মুখচুম্বন কই? সুধা চ চুম্বনঞ্চৈব নরাণাং মাতৃলক্ষণঃ।"

আশ্‌মানি বলিল "আমি তোমার মুখচুম্বন করিব, না তুমি আমার মুখচুম্বন করিবে?"

দিগ্‌গজ মনে ভাবিলেন, "আশ্‌মানি বহুদর্শী, রসিকা, পাড়া গেঁয়ে মেয়ে নহে, আমি মুখচুম্বন করিলে পাছে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে ত আমাকে অরসিক বলিবে; অতএব যা শত্রু পরে পরে;" এই ভাবিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিকে, নায়িকার মান আগে; তুমিই আমার মুখচুম্বন কর।"

আশ্‌মানি বলিল "মুখের নিকট গাল দাও।"

দিগ্‌গজ আশ্‌মানির মুখের নিকট গাল দিয়া হাসপাতালের রোগীর ন্যায় আড় হইয়া বসিলেন।

আশমানি ডাক্তারের ন্যায় আঁটু গাড়িয়া এক হস্তে তাহার জানু; আর হস্তে চিবুক বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিল। কর্কশ, রোমশ, গণ্ড; তাহাতেই অবলীলাক্রমে আশ্‌মানি ছুরিকা অস্ত্রের ন্যায় দুয়খানি দাঁত বসাইয়া দিল। প্রথমে কোমল অধর পল্লব-স্পর্শে দিগ্‌গজের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, তার পরেই প্রাণ যায়। "উহুঃ উহুঃ বেশ, উম্‌, ভাল—ও—ও—ও, আর না, আর না, যাই যাই, বেশ, মাগো, ও—ও—ঙঁ"

আশ্‌মানি দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিল।

দিগ্‌গজ গালে হাত বুলাইয়া দেখেন রক্ত; বলিলেন "একি রক্ত যে?"

আশ্‌মানি বলিল "তুমি পাগল? ও যে পানের পিক্‌।"

এই অংশটুকুতে শুধু আদিরস নয়, বীভৎস রসেও প্রকাশ ঘটেছে। ১ম খণ্ড চতুর্দশ পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্তমান প্রচলিত গ্রন্থে গজপতির অড়হর ডালের হাঁড়ি মাথায় দেওয়ার দুরবস্থার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা পূর্বের সংস্করণে ছিল না। এই হাস্যরসও স্থূলরুচির পরিচায়ক।

"ওস্‌মান! ভাই বহিন বলিয়া তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করিলে, তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না" (২/২)

ওসমানের আত্মনিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আয়েষার এই উক্তির পরিবর্তে ছিল।—

"একথা আমার পিতার নিকট উত্থাপন করিও, তোমাকে অদেয় তাঁহার কিছুই নাই।"

"একথা আমি তাঁহার নিকট প্রস্তাবিত করিতে ত্রুটি করি নাই।"

"কি উত্তর পাইয়াছিলে?"

"তিনি বেগমের নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, তোমার মনোমত পাত্রে তোমাকে সমর্পণ করিবেন, তোমার মন আজও জানিতে পারিলাম না।"

আবার সেই সৌন্দর্যমহিম মুখে মনোমোহন হাস্য প্রকটিত হইল। আয়েষা হাসিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকের মন পুরুষে কবে জানিতে পারিয়াছে।"

"ইহাতে কি বুঝিব?"

"যে আমি তোমাকে ভালবাসি।"

ওসমানের শ্রীমতী মুখকান্তি হর্ষোৎফুল্ল হইল।

"ভবিষ্যৎ স্বামী ভাবিয়া স্নেহ কর?"

"আমার প্রিয়তম ভ্রাতা জানিয়া স্নেহ করি।"

এই অংশটি বজায় থাকলে আয়েষার মধ্যে যে দৃঢ়তা বা ওসমানের প্রতি তার যে মনোভাব সে সম্পর্কে দ্বিধা বা অস্থিরচিত্ততার পরিচয় থাকত। তাই আয়েষার চরিত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে বর্তমান অংশটির পরিবর্জন সার্থক হয়েছে।

'দুর্গেশনন্দিনী'র এই বড় পরিবর্তনগুলি থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে যে পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র স্থূল-রসিকতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই বিমলা-আশমানি-দিগগজের কাহিনীকেই তাঁকে বেশি ছাঁটকাট করতে হয়েছে। সংযোজন অপেক্ষা সংকোচনের ফলে কাহিনীর গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে কপালকুণ্ডলার ৮টি সংস্করণ হয়। ১ম সংস্করণ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ৮ম সংস্করণ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ ২৬ বছর এই উপন্যাসের ভাষাগত ও বর্ণনাগত উৎকর্ষসাধনে বঙ্কিমচন্দ্র যতটা প্রয়াসী হয়েছেন, কাহিনীর মৌলিক বিন্যাসের সেরকম কোন পরিবর্তন ঘটান নি। কেবলমাত্র উপন্যাসের শেষাংশে নবকুমারের

কপালকুণ্ডলা

পরিণাম ভিন্নতর ক'রে শিল্পসুষমা বাড়িয়ে তুলেছেন। পরিবর্তনগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ 'বিজনে' শীর্ষক অধ্যায়ে—"তখন নবকুমারের প্রীতীতি হইল যে, হয় জলোচ্ছ্বাসভূত তরঙ্গে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নচেৎ সঙ্গিগণ তাঁহাকে এই বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।"—এর পর নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি পরবর্তীকালে বাদ দেওয়া হয়েছে।

"পর্বততলচারী ব্যক্তির উপরে শিখরখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাহাকে যেমন একেবারে নিস্পেষিত করে, এ সিদ্ধান্ত জন্মমাত্র নবকুমারের হৃদয়, সেইরূপ একেবারে নিঃস্পেষিত হইল।

এ সময়ে, নবকুমারের মনের অবস্থা যেরূপ হইল, তাহার বর্ণনা অসাধ্য। সঙ্গিগণ প্রাণে নষ্ট হইয়া থাকিবেক, এরূপ সন্দেহে পরিতাপযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু আপনার বিপন্ন অবস্থার সমালোচনায় সে শোক শীঘ্র বিস্মৃত হইলেন। বিশেষ যখন মনে হইতে লাগিল যে, হয়ত সঙ্গীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন ক্রোধের বেগে শোক দূর হইতে লাগিল।"

এই অংশটি বজায় থাকিলে নবকুমারের ঔদার্য ও মহিমা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হত। নবকুমারকে আদর্শ নায়ক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কন করতে চেয়েছেন, পরোপকার প্রবৃত্তিই তার হৃদয়ে প্রবল।

১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ 'আশ্রমে'—'তাহা জান না।'—র পর ছিল—"স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ না করিলে যে তান্ত্রিক সিদ্ধ হয় না, তাহা তুমি জান না। আমিও তন্ত্রাদি পাঠ করিয়াছি। মা জগদম্বা জগতের মাতা। উনি সতীর সতী—সতী প্রধানা। উনি সতীত্বনাশসংযুক্ত পূজা কখনও গ্রহণ করেন না। এই জন্যই আমি মহাপুরুষের অনভিমত সাধিতেছি। তুমি পলায়ন করিলে কদাপি কৃতঘ্ন হইবে না। কেবল এ পর্য্যন্ত সিদ্ধির সময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়া তুমি রক্ষা পাইয়াছ। আজি তুমি যে কার্য্য করিয়াছ—তাহাতে প্রাণেরও আশঙ্কা। এই জন্য বলিতেছি পলায়ন কর। ভবানীরও এই আজ্ঞা। অতএব যাও। আমার এখানে রাখিবার উপায় থাকিলে রাখিতাম, কিন্তু সে ভরসা যে নাই, তাহা ত জান।"

এই ঘটনায় কপালকুণ্ডলার সতীত্ব সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করা হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের তা অভিপ্রেত ছিল না। এর দ্বারা কাপালিকের উদ্দেশ্যের যে রূপ দেখান হয়েছে তাতে চরিত্রটি আরও হীন হয়ে পড়ত। কাপালিকেরও

কপালকুণ্ডলাকে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যটিকে বঙ্কিম কিছুটা অনুমাননির্ভর ক'রে শিল্পসম্মত করতে চেয়েছেন।

১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ 'দেবনিকেতনে'—"কে কন্যা সম্প্রদান করিবে?"—র পর এই অংশটি ছিল—"পুরুষ পাঠক, আমাকে মার্জনা করিবেন। আপনি যদি কপালকুণ্ডলাকে সমুদ্রতীরে দেখিতেন, তবে এক দিনে তৎপ্রতি আসক্তচিত্ত হইতেন কিনা বলিতে পারি না। প্রাণরক্ষা মাত্র উপকারের অনুরোধে তাহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইতেন কিনা বলিতে পারি না। বোধ করি নহে, কেন না, কপালকুণ্ডলা রুক্ষকেশী সন্ন্যাসিনী মাত্র। কিন্তু নবকুমার পরের জন্য কাষ্ঠাহরণ করেন; —এ পৃথিবীর কাঠুরিয়ারা সন্ন্যাসিনীদিগের মর্ম বুঝে; কৃতঘ্ন সহযাত্রীদিগের জন্য নবকুমার মাথায় কাষ্ঠভার বহিয়াছিলেন,—কৃতোপকারিণী সন্ন্যাসিনীর জন্য যে অতুল রূপরাশি হৃদয়ে বহিতে চাহিবেন, তাহার বিচিত্র কি?

এখানে নবকুমারের পরোপকার প্রবৃত্তিই কপালকুণ্ডলাকে বিবাহের একমাত্র কারণরূপে দেখান হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে অংশটি বর্জন করে দেখাতে চেয়েছেন নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি ভালোবাসাও জাগরূক হয়েছিল। সেই ভালোবাসার আকর্ষণই তাকে বিবাহে প্রেরণা জুগিয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ 'শয়নাগারে'-র পূর্বে একটি পরিচ্ছেদ ছিল। সেটি এরূপ—

"Real Fatalism is of two kinds. Pure or Asiatic Fatalism, the Fatalism of OEdipus, holds that our actions do not depend upon our desires. Whatever our wishes may be, a superior power, or an abstract Destiny, will overrule them, and compel us to act, not as we desire, but in the manner predestined. The other kind, modified Fatalism. I will call it, holds that our actions are determined by our will, our will by our desires, and our desires by the joint influence of the motives presented to us and of our individual character."
J. S. Mill.

এত দূরে এ আখ্যায়িকা হৃদয়গ্রামিত্ব প্রাপ্ত হইল। চিত্রকর চিত্রপুত্তলী লিখিতে অগ্রে হস্ত পদাদির রেখানিচয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অঙ্কিত করে, শেষে তৎসমুদয় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া ছায়ালোকভিন্নতা লিখে। আমারা এ পর্য্যন্ত

এই মানসচিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ রেখাঙ্কিত করিয়াছি। এক্ষণে তৎসমুদায় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া তাহার ছায়ালোক সন্নিবেশ করিব।

রবিকরাকৃষ্ট বারিবাষ্পে মেঘের জন্ম। দিন দিন, তিল তিল করিয়া, মেঘ সঞ্চারের আয়োজন হইতে থাকে; তখন মেঘ কাহারও লক্ষ্য হয় না; কেহ মেঘ মনে করে না; শেষে অকস্মাৎ একেবারে পৃথিবী ছায়ান্ধকারময়ী করিয়া বজ্রপাত করে। যে মেঘে অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার জীবনযাত্রা গাহমান হইল, আমরা এত দিন তিল তিল করিয়া তাহার বারিবাষ্প সঞ্চয় করিতেছিলাম।

পাঠক মহাশয় "অদৃষ্ট" স্বীকার করেন? ললাট-লিপির কথা বলিতেছি না, সে ত অলস ব্যক্তির আত্মপ্রবোধ জন্য কল্পিত গল্পমাত্র। কিন্তু, কখন কখন যে, কোন ভবিষ্য ঘটনার জন্য পূর্বাবধি এরূপ আয়োজন হইয়া আইসে, তৎসিদ্ধিসূচক কার্য্য সকল এরূপ দুর্দমনীয় বলে সম্পন্ন হয় যে, মানুষিক শক্তি তাহার নিবারণে অসমর্থ হয়, ইহা তিনি স্বীকার করেন কিনা? সর্বদেশে সর্বকালে দূরদর্শিগণ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদৃষ্ট যুনানী নাটকাবলীর প্রাণ; সর্বজ্ঞ সেক্‌স্পীয়রের ম্যাক্‌বেথের আধার; ওয়ালটর স্কটের "ব্রাইড্ অব লেমার মূরে" ইহার ছায়াপাত হইয়াছে; গেটে প্রভৃতি জর্মান কবিগুরুগণ ইহার স্পষ্টতঃ সমালোচনা করিয়াছেন। রূপান্তরে, "ফেট্" ও "নেসেসিটি" নাম ধারণ করিয়া ইহা ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রধান মতভেদের কারণ হইয়াছে।

অস্মদ্দেশে এই "অদৃষ্ট" জনসমাজে বিলক্ষণ পরিচিত। যে কবিগুরু কুরুকুল-সংহার কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি এই মোহমন্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে দীক্ষিত; কৌরবপাণ্ডবের বাল্যক্রীড়াবধি এই করালছায়া কুরুশিরে বিদ্যমান; শ্রীকৃষ্ণ ইহার অবতারস্বরূপ।*

"যদাশ্রৌষং জাতুষাদ্বেশ্মনস্তান্" ইত্যাদি ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে কবি স্বয়ং ইহা প্রাঞ্জলীকৃত করিয়াছেন। দার্শনিকদিগের মধ্যে অদৃষ্টবাদীর অভাব নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই অদৃষ্টবাদে পরিপূর্ণ। অধুনা "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" ইতি কবিতার্ধ পাঠ করিয়া অনেকে অদৃষ্টের পূজা করেন। অপর সকলে "কপাল।" বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

*কবিদিগের "Destiny" দার্শনিকদিগের "Fate" এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি। ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি; ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিতেছি না।

অদৃষ্টের তাৎপর্য্য যে কোন দৈব বা অনৈসর্গিক শক্তিতে অস্মদাদির কার্য্য সকলকে গতিবিশেষ প্রাপ্ত করায়, এমন আমি বলিতেছি না। অনীশ্বরবাদীও অদৃষ্ট স্বীকার করিতে পারেন। সাংসারিক ঘটনাপরম্পরা ভৌতিক নিয়ম ও মনুষ্যচরিত্রের অনিবার্য্য ফল; মনুষ্যচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল; সুতরাং অদৃষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল; কিন্তু সেই সকল নিয়ম মনুষ্যের জ্ঞানাতীত বলিয়া অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে।*

কোন কোন পাঠক এ গ্রন্থশেষ পাঠ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। বলিতে পারেন, এরূপ সমাপ্তি সুখের হইল না; গ্রন্থকার অন্যরূপ করিতে পারিতেন।" ইহার উত্তর "অদৃষ্টের গতি। অদৃষ্ট কে খণ্ডাইতে পারে? গ্রন্থকারের সাধ্য নহে। গ্রন্থারম্ভে যেখানে যে বীজ বপন হইয়াছে, সেইখানে সেই বীজের ফল ফলিবে। তদ্বিপরীতে সত্যের বিঘ্ন ঘটিবে।"

এক্ষণে আমরা অদৃষ্টগতির অনুগামী হই। সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে; গ্রন্থিবন্ধন করি।"

পরিচ্ছেদটিতে কাহিনীর কোন বিস্তার নেই, কেবলমাত্র তত্ত্বের আলোচনা আছে। জন স্টুয়ার্ট মিলের দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে পরিচ্ছেদটির সুরু। তারপর মানুষ কিরূপ অদৃষ্টের ক্রীড়নক তা-ই উদাহরণ যোগে আলোচনা করা হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের পরিণাম যে সেই অদৃষ্টেরই পরিহাসমাত্র লেখক তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, পরিচ্ছেদটি বাদ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভালোই করেছেন। কারণ এই পরিচ্ছেদটি থাকলে—একটি প্রবন্ধ হ'ত, উপন্যাস হ'ত না। তা'ছাড়া কাহিনীর পরিণাম সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই এরকম স্পষ্ট ইঙ্গিত যুক্তিসঙ্গত হ'ত না।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ 'প্রেতভূমে'র শেষ দু'টি পংক্তি—"সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্ত বায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?" দিয়ে বর্তমান উপন্যাসের সমাপ্তি। কিন্তু এর বদলে পূর্বে ছিল—"কাপালিক আসনে বসিয়া দেখিলেন, ইহাদের প্রত্যাগমনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বাটী প্রত্যাগমন করিলেন, কি কি, এই আশঙ্কায় কাপালিক আসন ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া কূলে গমন করিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক পরে জলমধ্যে কোন পদার্থ ভাসিয়া ডুবিল দেখিলেন—বোধ হইল, যেন মনুষ্যমস্তক মনুষ্যহস্ত। লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট

পদার্থ কূলে তুলিলেন। দেখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলাও জলমগ্না আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না।

তীরে পুনরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্যবিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিশ্বাস সহকারে বাক্যস্ফূর্তি হইল। সে বাক্য কেবল "মৃণ্ময়ি! মৃণ্ময়ি!"

কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণ্ময়ি কোথায়?" নবকুমার উত্তর করিলেন, "মৃণ্ময়ি—মৃণ্ময়ি– মৃণ্ময়ি!"

এই অংশটিতে বঙ্কিমচন্দ্র দু'টি ভুল করেছিলেন—প্রথমতঃ ভগ্নহস্ত কাপালিকের দ্বারা নবকুমারকে সেই আলোড়িত জলরাশি থেকে তুলে আনা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার ভাগ্যবিড়ম্বনায় ঐ দুই চরিত্রের কোন ভ্রান্তি দায়ী নয়, দায়ী এক অমোঘ নিয়তি। তাই নবকুমারকে যদি দুঃখভোগের জন্য বাঁচিয়ে রাখা হত, তাহলে তা শিল্পসুষমা ক্ষুণ্ণ করত। বরং দু'জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে—একজোড়া প্রণয়ীর অতৃপ্ত কামনা-বাসনার যে সমাধি ঘটল তা' পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হেনে এক স্বর্গীয় বিষাদের সঞ্চার করেছে।

'মৃণালিনী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ১০ম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। ১ম সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২৪১, ১০ম সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫৮। 'মৃণালিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের বহুসংস্কৃত উপন্যাস। অনেকের মতে 'মৃণালিনী' 'কপালকুণ্ডলা'র পর প্রকাশিত হলেও,

মৃণালিনী

এর রচনারীতি লক্ষ্য করলে একে 'কপালকুণ্ডলা'-পূর্ববর্তীকালের অপরিণত উপন্যাস ব'লে গণ্য করতে হয়। 'মৃণালিনী'র দুর্বলতা সম্পর্কে বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র বেশি সচেতন ছিলেন বলেই পরিবর্তনে আগ্রহী ছিলেন বেশি। কাহিনীতে তিনি কোন পরিবর্তন করেননি, কিন্তু ভাষায় বহু পরিবর্তন করেছেন। প্রথমদিকের বর্ণনাভংগী ছিল কঠিন তৎসম শব্দসম্বলিত সাধুভাষা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মৃণালিনীর ভাষাকে বঙ্কিমচন্দ্র চলতি খাতে প্রবাহিত করেছেন।

কাহিনীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে 'মৃণালিনী' উপন্যাসের প্রথমে 'রঙ্গভূমি' এবং 'গজহস্তা' নামে যে-দু'টি পরিচ্ছেদ ছিল, তা পরবর্তী সংস্করণে

বাদ দেওয়া হয়। (দ্রঃ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃ. ১২২—১২৭)।

কুতুবউদ্দীনের সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি পূর্বভারতে আধিপত্য বিস্তার করলে তাঁর সম্মানার্থ তিনি এক উৎসবের আয়োজন করেন। সেই উৎসবে বখতিয়ারের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য মত্ত হস্তীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের ব্যবস্থা করা হয়। মত্ত হস্তী যখন বখতিয়ারের বুকে পা তুলে দিতে উদ্যত তখন একজন অজ্ঞাত পরিচয় হিন্দু যুবক তীর নিক্ষেপে হস্তীকে বধ ক'রে বখ্তিয়ারকে বাঁচান।

কুতুবউদ্দিনের সৈন্যরা সেই যুবককে ধরে নিয়ে আসে। কুতুবউদ্দীন তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এবং বলেন—বখ্তিয়ারকে তিনি যুদ্ধে স্বহস্তে বধ করবেন বলে এ যাত্রা বাঁচিয়েছেন। তিনি হলেন মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্র। তাঁর অনুপস্থিতিতে বখ্তিয়ার মগধ জয় করেন। তিনি এর প্রতিশোধ নেবেন। হেমচন্দ্রকে তখন বন্দী করা হল। কিন্তু তিনি কারাগারে প্রেরিত হবার পূর্বেই পলায়ন করতে সমর্থ হলেন।

এই ঘটনাটি বর্জন ক'রে মৃণালিনীসংক্রান্ত ঘটনা দিয়েই পরবর্তীকালে উপন্যাসের সূচনা করা হয়। বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাসের পরিণামের কথা ভেবেই এই পরিবর্তন করেছিলেন। 'মৃণালিনী' উপন্যাসের 'পরিশিষ্টে' হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর সুখী জীবনচিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের প্রতিশোধস্পৃহা অপেক্ষা প্রণয়ীরূপই প্রাধান্যলাভ করেছে। তাই উপন্যাসের উদ্দেশ্য ও বর্ণনার মধ্যে সংগতিরক্ষার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিবর্জন অনুমোদন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশের সংগে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসও ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ সালের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত মোট ১১টি সংখ্যায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের জীবিতকালে গ্রন্থটির ৮টি সংস্করণ হয়। প্রথম সংস্করণ ১২৮০ বঙ্গাব্দ (১৮৭৩ খ্রীঃ, ১লা জুন) পৃ. ২১৩, ৮ম সংস্করণ ১৮৯২ খ্রীঃ, পৃ ২৪৮। প্রথম সংস্করণে পত্রিকায় প্রকাশিত আখ্যানেরই পুনর্মুদ্রণ হয়। তারপর প্রতি সংস্করণে কিছু কিছু পাঠ বদল হয়েছে। কিন্তু তা নিতান্তই সামান্য। দেবেন্দ্র-হীরা সম্পর্কিত কাহিনীতেই বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। হীরার দুঃসাহসিকা বৃত্তি কিছুটা সংযত করা হয়েছে এবং কয়েকটি ছড়া ও গান বাদ

বিষবৃক্ষ

দেওয়া হয়েছে। (দ্রঃ—উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, পৃ. ৪০৫—৪১১, বঃ সা. প.-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৩৭-১৪৬)।

উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণতমনের রচনা বলেই বোধহয় পরিবর্তন এত কম। একটি পরিবর্তন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সপ্তদশ পরিচ্ছেদের শেষে—"সে গোপনে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া জানেলার কাছে দাঁড়াইয়া দেবেন্দ্রের কথাবার্তা শুনিয়াছিল।…হীরা তখন উঠিয়া পলাইল।"-র স্থলে ছিল—

"মনে মনে হীরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, জলে হউক, আগুনে হউক, সে অপরিহীন সতীত্বধর্ম রক্ষা করিবে, রাখিয়া উন্মত্ত দেবেন্দ্রের মনের কথা জানিয়া যাইবে। হীরা ভিন্ন এত সাহস আর কাহারও হইত না।

হীরা বলিল, "মনে কোরে আর কি, দত্তের বাড়ী এক ডাকাতে দিনে ডাকাতি করিয়া এসেছে, তাই ডাকাত ধর্‌তে এযেছি।"

শুনিয়া বাবু গান ধরিলেন।

"আমার আঁটা ঘরে সিঁধ মেরেছে, কোন্ ডাকাতের এ ডাকাতি।
যৌবনের জেলখানাতে রাখ্‌বো তারে দিবারাতি॥
মন বাক্স তার লজ্জাতালা,
কল কোরে তার ভাঙ্গলে ডালা,
লুটে নিলে প্রেমনিধি তার,
ভাঙ্গা বাক্সে মেরে নাতি॥

তা, ডাকাতি কর্‌তে গিয়ে থাকি; গিয়াছি বাপ—কিন্তু হীরা মতির জন্যে নয়, কেবল ফুলটা ফলটা খুঁজি।"

হীরা। কি ফুল—কুন্দ?

দে। Hurrah! কুন্দকলি!—Three Cheers for কুন্দনন্দিনী! বন্দাতে মন্দাক্রান্তিকং! কুন্দনন্দি-ন্দি-নন্দিনী! বলিয়াই গীত।—

কুন্দকলি মন্দ বলি নিন্দে করে কাল ভ্রমরা—

তবে—ঘেঁটু বনের মেঠো মালিনী মাসি, কি মনে কোরে?

হী। কুন্দনন্দিনীর কাছ থেকে।

দে। Hurrah! Hurrah! for কুন্দনন্দিনী! বল বল ত, কি বলিয়া পাঠ্‌য়েছে? মনে পড়েছে? না হবে কেন? আজ তিন বৎসরের পীরীতি!

হীরা বিস্মিত হইল। আরও বিশেষ শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিল ;—

"এত দিনের পীরীত, তাহা জানিতেম না। প্রথম পীরীত হোলো কেমন কোরে ?"

দে। আরে, ভারি নাকি শক্ত কথা ! তারার সহিত বন্ধুতা থাকাতে তাকে বলিলাম, বউ দেখা—তা সে বউ দেখালে। সেই অবধি পীরীত। কিন্তু এক গেলাস খাও বাপ, স্বধু মুখে আর ভাল লাগে না।

দেবেন্দ্র তখন একপাত্র ব্রাণ্ডি হীরার হাতে দিল। হীরা তাহা হাতে করিয়া আবার নামাইয়া রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর।"

দে। তার পর তোমাদের গিন্নীর জালায় দিন কত দেখা শুনা হয় নাই। তার পর এখন বৈষ্ণবী হয়ে যাতায়াত করিতেছি। ছুঁড়ি বড ভয় তরাসে ; কিছুতেই কথা কয় না। তবে আজি যে রকম ফুসলে এয়েছি, তাতে ছাডায় না—না হবে কেন—আমি দেবেন্দ্র ;—অহং দেবেন্দ্র বাবু—হেউ ! "শিখে হো ছল ভোলা নট নাগর"—তার পর মালিনী মাসি ? কি বলিয়া পাঠিয়েছে ? ভাল আছ ত, মালিনী মাসি ? প্রাতঃ প্রণাম।

হীরা প্রায়াবরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে দেবেন্দ্রের এই সকল কথা বাহির হইতে শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। পরে হাসি সম্বরণ করিয়া বলিল, "রাত্রি ঢের হইল, এখন প্রণাম হই।" এই বলিয়া হীরা মৃদুহাসি হাসিয়া, দণ্ডবৎ হইয়া, প্রস্থান করিল।"

কুন্দ সম্পর্কে এখানে যেরকম আভাষ দেওয়া হয়েছে তা মানতে গেলে কুন্দের মনোভাব সম্পর্কে একটু ভুল ধারণা জন্মাতে পারে। অর্থাৎ দেবেন্দ্রের আসক্তির কথা জেনেও কুন্দ প্রথমাবধি সচেতন হয়নি। এই অংশ বাদ দেওয়ায় কুন্দের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে।

১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শন' চৈত্রসংখ্যায় 'ইন্দিরা' ছোট গল্প আকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীঃ 'ইন্দিরা' প্রথম যখন পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়, তখনো বঙ্গদর্শনের পাঠটুকুই বর্তমান ছিল। তখন পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪৫। বঙ্কিমচন্দ্র, মৃত্যুর একবছর পূর্বে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, 'ইন্দিরা'কে সংস্কার ক'রে ১৭৭ পৃষ্ঠার পঞ্চম সংস্করণ বের করেন।

ইন্দিরা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয় বিভিন্ন সংস্করণ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"'ইন্দিরা'-র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের স্বতন্ত্র পুস্তক আমরা দেখি নাই।

অনুমান হয়, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'উপকথা' পুস্তকে মুদ্রিত 'ইন্দিরা'কে দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'উপকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত 'ইন্দিরা'কে তৃতীয় সংস্করণ হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। এই অনুমানের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' পুস্তকে 'ইন্দিরা'র চতুর্থ সংস্করণও (পৃ-৪৫) যোজিত হইয়াছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৭৭।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'ইন্দিরা'র প্রথম সংস্করণের পাঠ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত আছে।

'ইন্দিরা'র কলেবর-বৃদ্ধির কারণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখেন।—

"ইন্দিরা ছোট ছিল—বড় হইয়াছে। ইহা যদি কেহ অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তবে ইন্দিরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতে পারে যে, এমন অনেক ছোটই বড় হইয়া থাকে। ভগবানের ইচ্ছায় নিতান্তই ছোট বড় হইতেছে। রাজার কাজ ত এই দেখি, ছোট কাজ বড় করিয়া, বড়কে ছোট করেন। সমাজও দেখিতে পাই বড়কে ছোট, ছোটকে বড় করেন। আমিও যাহার অধীন, সে না হয়, আমাকে ছোট দেখিয়া বড় করিল। তার আর কৈফিয়ৎ কি দিব?

তবে দোষের কথাটা এই যে, বড় হইলে দর বাড়ে। রাজার কৃপায় বা সমাজের কৃপায় যাঁহারা বড় হয়েন, তাঁহারা বড় হইলেও আপনার আপনার দর বাড়াইয়া বসেন। এমন কি, পুলিসের জমাদার যিনি এক টাকা ঘুষেই সন্তুষ্ট, দারোগা হইলেই তিনি দুই টাকা চাহিয়া বসেন, কেন না, বড় হইয়া তাঁহার দর বাড়িয়াছে। গরীব ইন্দিরা বলিতে পারে আমি হঠাৎ বড় হইলাম, আমার কেন দর বাড়িবে না?

তবে, ইন্দিরা বড় হইয়া ভাল করিয়াছে, কি মন্দ করিয়াছে, সেটা খুব সংশয়ের স্থল। সেটার বিচার আবশ্যক বটে। ছোট, ছোট থাকিলেই ভাল। ছোট লোক বড় হইয়া কবে ভাল হইয়াছে? কিন্তু অনেক ছোট লোকই তাহা স্বীকার করিবে না। ইন্দিরা কেন তাহা স্বীকার করিবে?

পাঠক বোধ হয়, ইন্দিরার কলেবরবৃদ্ধির কারণ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহা বুঝাইতে গেলে আপনার পুস্তকের আপনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে অবিধেয় কার্য্যে আমার প্রবৃত্তি নাই। যিনি বোদ্ধা,

তিনি ছোট ইন্দিরাখানি মনঃসংযোগ দিয়া পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে, তাহাতে কি কি দোষ ছিল এবং এক্ষণে তাহা কি প্রকারে সংশোধিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, পুরাতন নামে এ একখানা নূতন গ্রন্থ। নূতন গ্রন্থ প্রণয়নে সকলেরই অধিকার আছে। গ্রন্থকারের ইহাই যথেষ্ট সাফাই।"

এ থেকে বোঝা যায়, বঙ্কিম কোন কৈফিয়ৎই দেননি। তবে কিছু কিছু কারণ অনুমান করা যেতে পারে।

'ইন্দিরা'কে প্রথমে বঙ্কিম 'উপকথা' আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা তাঁর মনঃপুত ছিল না। তাই উপকথাকে উপন্যাসে পরিবর্তিত করতে গিয়ে তাঁকে প্রায় নূতন গ্রন্থ লিখিতে হয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য কিছু কিছু দোষত্রুটিরও সংশোধন করা হয়েছে।

তবে, এই কলেবর-বৃদ্ধির ফলে উপন্যাসের যে কিছু ক্ষতি হয়নি এমন নয়। কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় ঘটনার বিস্তারিত সমাবেশ করতে হয়েছে। ব্রহ্মঠাকুরাণী ও বাড়ির গিন্নিকে নিয়ে ইন্দিরার বিস্তৃত রহস্যঘটনা মূলকাহিনীর সংগে যোগাযোগবিহীন। একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ 'সেকালে যেমন ছিল'— নিতান্তই যে অপ্রয়োজনীয়, তা বঙ্কিম নিজেই বুঝেছিলেন। তাই তিনি শেষে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—"এ পরিচ্ছেদটা না লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। তবে এ দেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের জীবনের এই ভাগটুকু এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। লোপ পাইয়াছে ভালই হইয়াছে; কেন না, ইহার সঙ্গে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, কদাচিৎ বা দুর্নীতি, আসিয়া মিশিত। কিন্তু যাহা লোপ পাইয়াছে, তাহার একটা চিত্র দিবার বাসনায় এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম।" বলা বাহুল্য, বঙ্কিমের এর জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখাই উচিত ছিল, উপন্যাসের গঠন শিথিল করার দরকার ছিল না।

এছাড়া, আরও অনেক দোষত্রুটি আছে উপন্যাসে। প্রথমতঃ, ইন্দিরার ডাকঘর সম্বন্ধে অজ্ঞতার ঘটনাটি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ইন্দিরার পিতৃগ্রামের কাছ থেকে আরো দূরে কোলকাতায় আসার ঘটনাটির পিছনে যে যুক্তি আছে, তা যথেষ্ট নয়।

তৃতীয়তঃ, ইন্দিরার বিদ্যাধরী হবার কি প্রয়োজন ছিল?

'ইন্দিরা'র প্রথম সংস্করণের সংগে পঞ্চম সংস্করণের পার্থক্যগুলি এরূপ—

"ইন্দিরা'র প্রথম সংস্করণে—

(১) পরিচ্ছেদের নামকরণ হয়নি। পঞ্চম সংস্করণে (যে সংস্করণ আজ প্রচলিত তাতে) পরিচ্ছেদের নামগুলি কৌতুক রসে উচ্ছল।

(২) প্রথম সংস্করণ আট পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। বর্তমান প্রচলিত সংস্করণ (৫ম সংস্করণ) দ্বাদশ পরিচ্ছেদে প্রসারিত।

(৩) প্রথম সংস্করণে (ক) ছড়াগুলি নাই, (খ) 'কালির বোতল' অনুপস্থিত, (গ) শাপভ্রষ্টা অশরীরী বৃত্তান্ত নাই, (ঘ) পরিশেষে পুনর্বিবাহে বাসরঘরের দৃশ্য ও তৎপ্রসঙ্গে বঙ্কিমের নীতি-উপদেশাবলী নাই। বর্তমান গ্রন্থের যে বিশেষ মাধুর্য তা বঙ্কিমের যত্নকৃত সুসংস্কারের ফলশ্রুতি।"

(ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়—কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র)

'ইন্দিরা'কে নতুন রূপ দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ সুভাষিণী উপাখ্যানকেই পরিবর্ধিত করেছেন, মূলকাহিনীর কোন পরিবর্তন ঘটাননি। তবে কাহিনীর সংক্ষিপ্ততার জন্য যে-সব ঘটনায় অবিশ্বাস করার সুযোগ ছিল, বিস্তারিত করার ফলে তা কিঞ্চিৎ দূর হয়েছে।

সর্বোপরি, উপন্যাসে রচনারীতি যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছে। 'বাজিয়ে যাব মল' প্রভৃতি অধ্যায়ে মধুর রস স্নিগ্ধ আবেশ ছড়িয়েছে। সুভাষিণী-ইন্দিরার সম্পর্কও মধুর। সুভাষিণীর শাশুড়িকে (কালির বোতল) নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। ইন্দিরার ভাগ্যবিপর্যয়ের গুরুতর ঘটনার পাশাপাশি এ ধরণের লঘুরসের পরিবেশ কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

বঙ্কিমের জীবতকালে 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র ৫টি সংস্করণ হয়। ১ম সংস্করণ ১২৮১ (পৃ. ৩৬), ২য় ও ৩য় সংস্করণ মনে হয় 'উপকথা' নামক পুস্তকের ১ম (১৮৭৭) ও ২য় (১৮৮১) সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৪র্থ সং—১৮৮৬ খ্রীঃ (পৃ. ৩৬), ৫ম সং—১৮৯৩ খ্রীঃ (পৃ. ৫০)।

যুগলাঙ্গুরীয়

বিভিন্ন সংস্করণে গ্রন্থটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হলেও তা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নয়।

১২৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'রাধারাণী' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি 'উপকথা—অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' নামক পুস্তকে স্থানলাভ করে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 'রাধারাণী'র প্রথম আবির্ভাব। এটিতে তৃতীয় সংস্করণ লেখা ছিল এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৮। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫। 'চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—"এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া, ইহার কলেবর বাড়াইতে হইয়াছে। কাজেই মূল্যও বাড়াইতে হইয়াছে।"

রাধারাণী

'বঙ্গদর্শনে'র পাঠের সংগে বর্তমান প্রচলিত সংস্করণের পাঠের মধ্যে পরিবর্তন বিশেষ গুরুতর নয়। তবে গল্পটিকে বঙ্কিমচন্দ্র আরও বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলার চেষ্টা করেছেন। রুক্মিণীকুমারের সংগে পরিচয়ের সময় রাধারাণীকে দিয়ে যেভাবে জাতি বর্ণ ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করান হয়েছে তাতে পরবর্তীকালের বঙ্কিমচন্দ্রের গোঁড়া মানসিকতাই প্রকাশ পায়।

'চন্দ্রশেখর' 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। "গ্রন্থকারে প্রকাশকালে কয়েকটি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ পরিবর্জিত হইয়াছে এবং কোন কোন পরিচ্ছেদ আংশিক পরিবর্জিত বা পরিবর্তিত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর

স্থানে স্থানে পরিচ্ছেদগুলি নূতনভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং সমগ্র উপন্যাসখানি উপক্রমণিকা ও ছয় খণ্ডে বিভক্ত ক'রা হইয়াছে।" (দ্রঃ প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, পরিশিষ্ট ক)

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই 'চন্দ্রশেখর' গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ হয়েছিল। ১ম সংস্করণ—১৮৭৫ খ্রীঃ (১৯৫ পৃ.), ২য় সং—১৮৮৩ খ্রীঃ (পৃ. ১৯৭), ৩য় সং—১৮৮৯ খ্রীঃ (পৃ. ২৩১)। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর বছর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তবে তৃতীয় সংস্করণই যথার্থভাবে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সংস্কৃত হয়েছিল। সেই অনুসারেই পরবর্তী সংস্করণগুলি মুদ্রিত হয়।

"তৃতীয় সংস্করণে বিভিন্ন খণ্ডের বিভিন্ন নাম ছিল—প্রথম সংস্করণে সেরূপ নাই। প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ বর্তমান সংস্করণের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইয়াছে ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি প্রথম সংস্করণে দুইটি পরিচ্ছেদ বিভক্ত ছিল, সুতরাং পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলির সংখ্যায় গরামল ঘটিয়াছে।"

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ 'পাঠভেদ')।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশের সময় প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের কাহিনী গ্রন্থের মধ্যভাগে 'পূর্ব-কথা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সেটিকে 'উপক্রমণিকা' অধ্যায়ে আলাদাভাবে সংযোজিত করে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর গতি বৃদ্ধি করেছেন ও কালগত ঐক্য সুনিবিড় করেছেন।

প্রথম সংস্করণে উপন্যাসের শেষে একটি 'পরিশিষ্ট' ছিল। সেটি এরূপ—

"লরেন্স্ ফস্টর, নবাবের তাম্বুর বাহিরে আসিয়া কি করিবেন, কোথা যাইবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, যবন এবং ইংরেজ উভয়েই তাঁহার শত্রু। বিহ্বলের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ইংরেজ

সেনা একদল যবনকে প্রহার করিয়া তাড়াইতে তাড়াইতে লইয়া যাইতেছিল। ফস্টর একজন মৃত যবনের বন্দুক কুড়াইয়া লইয়া সেই ইংরেজদিগের সঙ্গে মিশিলেন। কিন্তু পরিচ্ছেদে ধরা পড়িলেন। সেই রেজিমেণ্টের পোষাক, তাঁহার পরা ছিল না।

সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? পোষাক পর নাই কেন?" ফস্টর বলিল, "আমি লরেন্স্ ফস্টর—মুসলমানেরা আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল।"

সার্জেণ্ট বলিল, "দুই জন ইহাকে সেনাপতির নিকট লইয়া যাও। সেনাপতির আজ্ঞা আছে, বন্দী কেহ হস্তগত হইলে তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইবে।" যুদ্ধাবসানে লরেন্স্ ফস্টর, ইংরেজ সেনাপতির নিকটে আনীত হইলেন। সেনাপতি দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "জানি। লরেন্স ফস্টর, পলাতক, রাজবিদ্রোহী—যবনসেনামধ্যে পদগ্রহণ করিয়াছে উহাকে ফাঁসি দেওয়া যাইবে।"

বিচারান্তে যুদ্ধের পরে রীতিমত বিচার হইয়া ফস্টরের ফাঁসি হইল।

চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীকে লইয়া গৃহে আসিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীর সঙ্গে চারিটা কথা কহিয়াই জানিল যে শৈবলিনী রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। আহ্লাদে, সুন্দরী চন্দ্রশেখরকে সবিশেষ কহিল; আহ্লাদে চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীকে আলিঙ্গন করিতে যায় সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সেই দিনই, পুনর্বার সংসার পাতিয়া, শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন। রমানন্দ স্বামী আসিলে একটা লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত করিবেন স্থির করিলেন।

রমানন্দ স্বামী প্রতাপের মৃত্যুসংবাদ লইয়া আসিলেন। কেন, প্রতাপ মরিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলেন না। কিয়দ্দিবস প্রতাপের শোকে, এরূপ অধীর হইয়া রহিলেন যে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের কথা বিস্মৃত হইয়া রহিলেন। রমানন্দ স্বামী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আশ্রমে যাত্রা করিলেন।"

পূর্বের এই গ্রন্থসমাপ্তি অপেক্ষা বর্তমান প্রচলিত গ্রন্থসমাপ্তি অনেক বেশি শিল্পসম্মত ও পরিণত হয়ে উঠেছে।

'রজনী' বঙ্গদর্শনে ১২ মাস ধরে প্রকাশিত হয়। (১২৮১ সালের আশ্বিন—চৈত্র, ১২৮২ সালের বৈশাখ ও ভাদ্র—অগ্রহায়ন) তা থেকে গ্রন্থাকারে প্রথম

প্রকাশিত হয় ২রা জুন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮৪ সাল)। সাময়িকপত্র ও গ্রন্থকারে প্রকাশের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বিজ্ঞাপনে লেখেন—"রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ববৎ আছে, অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে।"

রজনী

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১২২। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৮৭ সালে (১৮৮১ খ্রীঃ)—পৃষ্ঠা ১২১। তৃতীয় ও বঙ্কিমের জীবিতকালের শেষ সংস্করণ ১৮৮৭ খ্রীঃ—পৃষ্ঠা ১৬২। এই তিনটি সংস্করণের পাঠভেদ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটেছে তাতে সর্বাপেক্ষা চোখে পড়ে অমরনাথের চরিত্র। 'বঙ্গদর্শনে' এই চরিত্রটি ছিল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। সেখানে রজনীর বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধারের পরই অমরনাথ তাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া, একটু বড়মানুষীর ভানও করেছেন। কারণ, তিনি ভেবেছিলেন, রজনী দরিদ্র, তাই বড়মানুষী চাল দেখে বোধ হয় একটু মুগ্ধ হবে। লবঙ্গের প্রতি অমরনাথের আচরণও বঙ্গদর্শনে মার্জিত ছিল না। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এই ত্রুটিগুলি সংশোধন ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র অমরনাথ চরিত্রটিকে যেমন মর্যাদা দিয়েছেন, তেমনি উপন্যাসেরও শ্রীবৃদ্ধি করেছেন।

১২৮২ সালের পৌষ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শনে' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ১২৮৪ সালে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় পুনরায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বৈশাখ থেকে মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে শেষ হয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' যখন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৭০। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৭১। তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের সম্পাদক লিখেছেন—"আমরা আখ্যাপত্রহীন তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়াছি; ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৭২।" বঙ্কিমের জীবিতকালে চতুর্থ সংস্করণ ৩০শে নভেম্বর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (পৃ. ১৯৬)।

কৃষ্ণকান্তের উইল

'বঙ্গদর্শন' থেকে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় অনেক সংশোধন করা হয়। কিন্তু সে সংশোধনও বঙ্কিমের বিশেষ মনঃপুত ছিল না। এ-সম্বন্ধে তিনি 'বঙ্কিমচন্দ্র'-র লেখক গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্রে জানিয়েছেন—

"…কৃষ্ণকান্তর উইল সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক কতক সংশোধন করা হইয়াছে। পুস্তকের অর্দ্ধেকমাত্র সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইলে, আমাকে কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে অতি দূরে যাইতে হইয়াছিল। অতএব অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকিতে পারে।…১১ই জ্যৈষ্ঠ [১২৯৩] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ।"

বিভিন্ন সংস্করণে পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রোহিণী চরিত্রকে অনেকটা মার্জিতকরণ। উদাহরণ হিসাবে বর্তমান প্রচলিত সংস্করণে ১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদে যেখানে হরলাল কর্তৃক রোহিণীকে উইল চুরির কাজে লিপ্ত করানর বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমানের এই অংশটি অত্যন্ত সতর্কতার সংগে রচিত। রোহিণীকে দিয়ে এরূপ হীন কাজ করানর পিছনে অনেক যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। বিশেষতঃ রোহিণীকে এককালে বদমাসের হাত থেকে বাঁচানোর কৃতজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছে হরলাল। আবার রোহিণীকে বিবাহ করার প্রলোভন দেখিয়ে তার মধ্যে সুপ্ত প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটান হয়েছে অত্যন্ত সংযতভাবে। বলাবাহুল্য এটি অনেকাংশে শিল্প-সম্মত। অথচ 'বঙ্গদর্শনে' অংশটি অশ্লীল পর্যায়ভুক্ত। সেটি এরূপ—

"দুই চারিটি মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কাকার কাছে যে জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?"

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জন্য আসিয়াছিলাম ?"

রোহিণী হাসিয়া মৃদু মৃদু শ্লোক বলিল,

যাও যাও আর কেলে সোনা, কাজ কি সোহাগ বাড়িয়ে।
শুনেছি সব মনের কথা, বেড়ার গোড়ায় দাঁড়িয়ে॥

হরলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

"বটে! তোমার অসাধ্য কর্ম নাই। এখন কি একটা নূতন রোজগারের পন্থা হইল ?"

রো। হইল বই কি ?

হর। কার কাছে—কর্তার কাছে এ কথা যাবে না কি ?

রো। রোজগার বড়বাবুর কাছেই হবে।

হর। কিরূপে ?

রো। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।"

(বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮২, ৪১৬ পৃ.)

১ম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কার ক'রে লিখলেন—

"এই কথার পর হরলাল বিদায় হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইলে পর একটি স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরলাল তাঁহাকে অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও ?"

স্ত্রীলোকটি দুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, "আমি রোহিণী।"

রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্কন্যা। তাহার যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছে—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পান খাইত, নির্জল একাদশী করিত না। পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে, সে মাছও খাইত। যখন পাড়ায় বিধবাবিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।

পক্ষান্তরে তাহার অনেক গুণও ছিল। রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয় ; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা, ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত, আবার আলপানা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। পল্লীর মেয়েরা যেখানে লুকিয়ে চুরিয়ে গানের মজলিষ করিত, রোহিণী সেখানে আখড়াধারী—টপ্পা, শ্যামাবিষয়ক, কীর্তন, পাঁচালি, কবি, রোহিণীর কণ্ঠাগ্রে। শুনা গিয়াছে, রোহিণী "ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র" অনেক জানিত। সুতরাং মেয়েমহলে রোহিণীর পশারের সীমা ছিল না। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত। ব্রহ্মানন্দের গৃহ শূন্য ; রোহিণী তাঁহার ঘরে গৃহিণী ছিল।

দুই চারিটি মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কাকার কাছে যে জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?"

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কিজন্য আসিয়াছিলাম?"

রোহিণী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, "সব শুনেছি। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।"

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জন্য আসিয়াছিলাম?"

রোহিণী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, "সব শুনেছি। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।"

হরলাল বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "সে কি রোহিণী?" পরে কহিলেন, "আশ্চর্য্যই বা কি? তোমার অসাধ্য কর্ম নাই। তা তুমি কি প্রকারে উইল বদলাইবে?"

রো। সে কথাটা আপনার সাক্ষাতে নাই বা বলিলাম। না পারি, আপনার টাকা আপনি ফেরৎ লইবেন।

হর। ফেরৎ? তবে কি টাকা আগামী দিতে হবে নাকি?

রো। সব।

হর। কেন, এত অবিশ্বাস কেন?

রো। আপনিই বা আমায় অবিশ্বাস করেন কেন?

হর। কবে এটা পারবে?

রো আজিকেই। রাত্র তৃতীয় প্রহরে এইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

হরলাল বলিলেন, "ভাল", এই বলিয়া তিনি রোহিণীর হাতে হাজার টাকার নোট গণিয়া দিলেন।" (১ম সংস্করণ/কৃষ্ণকান্তের উইল)।

পরবর্তীকালে গোবিন্দলালের পরিণামও অনুরূপ করা হয়েছে। 'বঙ্গদর্শনে' ছিল—

"গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরের মূর্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।

"পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।"

বর্তমানে গোবিন্দলালের পরিণামটি অতি নাটকীয় ব'লে মনে হয়। গোবিন্দলাল সন্ন্যাসী হয়ে ভ্রমরের স্মৃতি ভোলার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত

তিনি ঈশ্বরের পায়ে সমস্ত কামনা-বাসনা সমর্পণ ক'রে শান্তি পেয়েছেন। প্রথমটির অপেক্ষা শেষোক্ত পরিণামটি অনেকটা শিল্পসম্মত হলেও, ভ্রমরের মৃত্যু-শয্যায় গোবিন্দলালের হাহাকারে মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি হলেও বোধহয় সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর শেষে পাদটীকায় বঙ্কিম গ্রন্থ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য করেন—"...অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, —'রোহিনীকে মারিলেন কেন?...কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যাসকলের ব্যাখ্যামাত্র একথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।"

'রাজসিংহে'র 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রূপ ও ১ম সংস্করণের রূপের সংগে চতুর্থ সংস্করণের পার্থক্য অনেক। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য —চঞ্চলকুমারীকে মোগল সেনার হাত থেকে উদ্ধার ক'রেই কাহিনীর প্রথমে সমাপ্তি ঘটেছিল। ১ম সংস্করণের সমাপ্তিটি এইরূপ।—

রাজসিংহ

"বলা বাহুল্য যে, নির্মলকুমারী পরিণীতা হইয়া স্বামী কর্তৃক উদয়পুরে আনীতা এবং রাজপুরী মধ্যে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিতা হইলেন। ইহাও বলা বাহুল্য যে চঞ্চলকুমারী উদয়পুরের রাণার রাজমহিষী হইলেন। এবঞ্চ মাণিকলাল রাজদরবারে সম্মানিত হইয়া উচ্চ পদ লাভ করিলেন। তাঁহার কন্যাটি নির্মলকুমারীর জিম্মায় রহিল। পিসীমার সঙ্গে আর বড় সম্বন্ধ রহিল না।

"ঔরঙ্গজেব শিশুপালের দশা প্রাপ্ত হইয়া দেবীরের ক্ষেত্রে রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। সেখানেও শিশুপালের দশান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সকল কথা বলা হইল না।"

চতুর্থ সংস্করণে ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহের সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়ায় কাহিনীর কলেবর বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রথম প্রকাশিত কাহিনীকে বঙ্কিম অনেকস্থানেই অবিকৃত রাখেন।

দরিয়াবিবি পরবর্তী সংস্করণে নবাগতা। মবারক—জেবউন্নিসার কাহিনীও পল্লবিত রূপ লাভ করে।

মাণিকলাল-নির্মলকুমারীর কোর্টশিপ ও বিবাহকাহিনী পরবর্তী সংস্করণে নূতন সংযোজন।

প্রথম সংস্করণে যোধপুরী বেগমের ভূমিকা ছিল অল্পই।

'রাজসিংহে'র বৃহত্তর সংস্করণকে সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ আখ্যা দেওয়া চলে।

আনন্দমঠ

বঙ্কিমের জীবিতকালে 'আনন্দমঠে'র পাঁচটি সংস্করণ হয়। বিভিন্ন সংস্করণের তারিখগুলি হল—১ম সংস্করণ—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, ২য় সংস্করণ—১২৯০ বঙ্গাব্দ (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ), ৩য় সং —১২৯২ বঙ্গাব্দ (১৮৮৬, এপ্রিল), ৪র্থ সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৮৮৬ খ্রীঃ, ৫ম সংস্করণ—১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

'প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—"বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময়ে নয়। /সমাজ বিপ্লব, অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। /ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। /এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল। /"

বঙ্কিমচন্দ্র 'দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে' লেখেন—"প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার টীকাস্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা অপরপৃষ্ঠে উদ্ধৃত করিলাম।"

এই সমালোচনাটি 'The Liberal' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সমালোচনাটি এই—"The leading idea of the plot is this—should the national mind feel justified in harbouring violent thoughts against the British Government ? Or to present the question in another form, is the establishment of English supremacy providential in any sense ? Or to put it in a still more final and conclusive form, with what purpose and with what immediate end in view did providence send the British to this country ? The immediate object is thus briefly described in the preface—To put an end to Moslem tyranny and anarchy in Bengal ; and the mission is thus strikingly pictured in the last chapter ;—"this passage embodies the most recent and the most enlightened views of the educated Hindus, and happening as it does in a novel powerfully conceived and wisely executed, it will influence the whole race for good. The author's dictum we heartily accept as it is one which already forms the creed of English education. We may state in

this from: India is bound to accept the scientific method of the West and apply it to the elucidation of all truth. This idea beautifully expressed, forms a silver thread as it were, and runs through the tissue of the whole work."

'তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন'—এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন—"এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল।

"আরও দেখিবেন যে, দুইটি ঘটনা সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে। যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে ঘটে নাই উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল।

আর Captain Edwardes নামের পরিবর্তে Major Wood নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না—কেন না, উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।"

'পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন—"তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপনে যে অনৈক্যের কথা লেখা গিয়াছে, তাহা রাখিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই বিবেচনা করিয়া, এই সংস্করণে আবশ্যকীয় পরিবর্তন করা গেল। অন্যান্য বিষয়েও কিছু কিছু পরিবর্তন করা গিয়াছে। শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করা গিয়াছে। এবং তৎসম্বন্ধে যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল। মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যও পূর্বাপেক্ষা সুসম্পাদিত করা গেল।"

বিভিন্ন সংস্করণে পরিমার্জনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যে কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন, তা বিজ্ঞাপন-এর বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। পঞ্চম সংস্করণই বর্তমানে প্রচলিত 'আনন্দমঠ' গ্রন্থ। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের সংগে পঞ্চম সংস্করণের গুরুতর পার্থক্যগুলি এরূপ—

(ক) 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠের উপক্রমণিকায় ছিল— প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব" দানের কথা, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে "ভক্তি" দানের কথা বলা হয়েছে।

(খ) শান্তির পূর্বজীবনের কাহিনী পরবর্তী সংস্করণের সংযোজনা।

(গ) শান্তি চরিত্রের অতিরিক্ত পুরুষালিভাবও পরবর্তী সংস্করণে অনেক সংশোধিত করা হয়েছে।

(ঘ) ইতিহাসের ভুলভ্রান্তি যথাসম্ভব সংশোধন করা হয়েছে।

(ঙ) বর্তমানে যেখানে গ্রন্থ শেষ হয়েছে, 'বঙ্গদর্শনে' তার পরেও ছিল—

"বিষ্ণুমণ্ডপ শূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।"

দেবী চৌধুরাণী

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসটি 'বঙ্গদর্শনে'র ১২৮৯ সালের পৌষ থেকে চৈত্র পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বন্ধ থাকে। পুনরায় ১২৯০ সালের কার্তিক থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হলে 'দেবী চৌধুরাণী'ও যথারীতি প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু মাঘ মাসের পর 'বঙ্গদর্শন' আবার বন্ধ হ'য়ে গেলে 'দেবী চৌধুরাণী'ও দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়।

বঙ্কিমের জীবিতকালে গ্রন্থটির ছ'টি সংস্করণ হয়। ১ম সংস্করণ—১২৯১, বৈশাখ (১৮৮৪), ২য় সং—?, ৩য় সং—১৮৮৭ খ্রীঃ ২৫শে জানুয়ারি (পৃ. ২২৩), ৪র্থ সং—"চতুর্থ সংস্করণ সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হইয়াছিল, আমরা এই সংস্করণ একখানিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" (সা. পরি. গ্রন্থা.), ৫ম সং—১৮৮৮ খ্রীঃ (২৩১ পৃ.), ৬ষ্ঠ সং—১৮৯১ খ্রীঃ (২৩১ পৃ.)।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত আখ্যান ও বঙ্কিমের জীবিতকালের শেষ সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য খুব গুরুতর নয়। কেবলমাত্র—(ক) পরবর্তী সংস্করণে প্রফুল্লের প্রতি নয়নতারার ঝাঁটামারা প্রভৃতি উগ্র ব্যবহার সংযত করা হয়েছে। (খ) প্রফুল্ল-ব্রজেশ্বরের বিদায়দৃশ্য উভয়ের চরিত্রানুগ ক'রে তোলা হয়েছে। (গ) প্রথমদিকে প্রফুল্লর 'তিরোধান বৃত্তান্ত'-এ বাত-শ্লেষ্ম-বিকারে মরার কথা ছিল, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে মৃত্যুকাহিনী আরও সরস হয়েছে। (ঘ) প্রফুল্লর অর্থ-প্রাপ্তি এবং ভবানী পাঠক সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনার কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। (দ্রঃ প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত-উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম)।

সীতারাম

'সীতারাম' ১২৯১ সালের শ্রাবণ থেকে ১২৯৩ সালের মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত 'প্রচারে' প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের জীবিতকালে গ্রন্থটির তিনটি সংস্করণ হয়। ১২৯৫ সালে দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩০০-তে। এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—"সীতারামের কিয়দংশ পরিত্যক্ত এবং কিয়দংশ পরিবর্তিত হইল। গ্রন্থের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইল, এজন্য ইহার দামও কমান গেল।"

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৮৯৪, মে), পৃষ্ঠা ৩২২।

'প্রচারে' প্রকাশিত এবং বিভিন্ন সংস্করণে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তার মূল সূত্রগুলি এখানে প্রকাশিত হল।—

(ক) প্রচারের 'ভৈরবী' উপন্যাসে 'সন্ন্যাসিনী' হয়েছে।

(খ) গঙ্গারামের উদ্ধারকার্যে সীতারাম অনেক ক্ষিপ্র হয়েছেন এবং অনেক ঘটনারও পরিবর্তন করা হয়েছে।

(গ) 'প্রচারে' সীতারামের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ফকিরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

(ঘ) এছাড়া, ছোটখাট আরো অনেক পরিবর্তনে উপন্যাসটি সুন্দর হয়েছে। (দ্রঃ—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত—উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম।)

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন সংস্করণে যে পরিবর্তন সাধন করেছেন, তা তাঁর মানসিকতার ক্রমপরিণতির উৎকর্ষতারই পরিচায়ক।

॥ দশ ॥

বঙ্কিম-উপন্যাসে আঙ্গিকের মূল্যায়ণ ও তাতে তাঁর জীবন-বোধের বিশিষ্টতার প্রতিফলন।

রীতি বা style হল কবির নিজস্ব। সচেতন অনুকরণ দ্বারা অন্যের নকলনবীশি করা যায়, প্রকৃত সাহিত্যিক হওয়া যায় না। প্রকৃত সাহিত্যিকেরই একটি নিজস্ব রীতি গড়ে ওঠে। সেই রীতির বৈশিষ্ট্য তাঁর মানসিকতার বিশেষ রূপটিরও পরিপোষক। তাই ভারতচন্দ্রকে আমরা বলি নাগরিক রীতির কবি, জয়দেবকে বলি বিলাসের কবি।

বঙ্কিম-উপন্যাসের আঙ্গিক বিশ্লেষণে আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে তিনি বাংলাভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক। সুতরাং তাঁর সামনে বাংলা উপন্যাসের কোন সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত ছিল না। যা-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁকে নিজেই করতে হয়েছে।

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র কিরকম গদ্য লিখতেন তা' জানার কৌতূহল হ'তে পারে। একটি নমুনা—

"গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পাসংকাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহরহঃ বিষয়বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। যে লপনেন্দু শত শত শশধরসঙ্কাশ শোভা পাইতেছে সে বদন কদমমণ্ডিত হওত মৃন্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অনুরেণু আসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধররস পান না করিয়া অন্যরস পান করে না, সে কণ্ঠ নষ্ট হইয়া ক্ষুদ্রভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। অতএব হে মানবগণ অনিত্যযত্নে ক্ষান্ত হও।"

(সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ১২ই বৈশাখ, ১২৫৯)।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই গদ্যভাষাদর্শনে শঙ্কিত হয়ে তাঁর ছাত্রজীবনের সাহিত্যগুরু ঈশ্বরগুপ্তও শঙ্কাপ্রকাশ ক'রে লিখেছিলেন—"(বঙ্কিম) রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে কিন্তু ভাবগুলিন্ প্রকাশার্থে যেন বঙ্কিম-ভাষা ব্যবহার না করেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর নির্দেশ কতখানি মান্য করতে পেরেছেন তার পরিচয় নিতে হ'লে 'দুর্গেশনন্দিনী'র জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর এর ভাষা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় এর ভাষাকে 'শব পোড়া মড়া দাহ' আখ্যা দিলেন, অর্থাৎ গুরু-চণ্ডালী দোষে অভিহিত করলেন। আসলে সেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রাধান্যের যুগে বাংলাভাষার নূতন রূপ অনেকেরই মনঃপূত হয় নি। এ বিষয়ে বঙ্কিমের নিজের দ্বিধাও কম ছিল না। পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতে ধারণা ছিল যে, 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা ব্যাকরণ-দোষে দূষিত। সেজন্য তিনি গল্প পাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাষায় ব্যাকরণ-দোষ আছে—উঁহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন? ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন (সংস্কৃত কলেজের ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রীর পিতা) বলিলেন, 'গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হয়েছিলাম যে, আমাদের সাধ্য কি যে অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করি।' বিখ্যাত পণ্ডিত ৺ইন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলিলেন যে, 'আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ দোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে। দুর্গেশনন্দিনী প্রচারিত হইবার পূর্বে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ৺তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ভূদেববাবুর জামাতা) এবং সেকালের বিখ্যাত সমালোচক ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য উহা পাঠ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিয়াছিলেন, তোমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিবে, কিন্তু এই উপন্যাসটি যেমন সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিবে, তেমন তোমার অন্য উপন্যাস করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।" (বঙ্কিম-প্রসঙ্গ)।

দুর্গেশনন্দিনী

একাধারে নিন্দা ও প্রশংসা মাথায় নিয়ে বাংলা উপন্যাসের পথপরিক্রমায় বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রসর হলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে চরিত্রচিত্রণে কিছুটা আড়ষ্টতা থাকলেও, কাহিনীবয়নে দক্ষতা রয়েছে। অবশ্য কাহিনীবর্ণনায় জটিলতা অপেক্ষা সরাসরি গল্পরস সৃষ্টির মাধ্যমে রোমান্সরস সৃষ্টির চেষ্টাই বঙ্কিমচন্দ্র এখানে করেছেন।

বঙ্কিম-উপন্যাসের যে নাটকীয় গুণ অন্যতম আকর্ষণ 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসেই তার সূচনা। তবে প্রথম উপন্যাসে তা কোথাও কোথাও অতি-নাটকীয় হয়ে পড়েছে। আর নারীচরিত্রের রূপবর্ণনার মধ্যেও দোষ-গুণ উভয়ই রয়েছে। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য—'তিলোত্তমা বিমলা প্রভৃতি লেখকের প্রয়োজনে সুন্দর, রোহিণী সূর্যমুখী সুন্দর গল্পের প্রয়োজনে। দুর্গেশনন্দিনীর অন্যতম দোষ বলেছি রূপ বর্ণনার গতানুগতিকতা। সেই সঙ্গে এখন বলা আবশ্যক যে, দোষের মধ্যেই আছে সংশোধনের সার্থক চেষ্টা।"

(বঙ্কিম-সরণী)

বঙ্কিম-উপন্যাসে অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে গভীর বক্তব্য প্রকাশের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই তার সূচনা আছে। আয়েষা যখন ওসমানকে জগৎসিংহ সম্পর্কে জানায় যে 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' তখন আমরা চমকিত হই।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে পূর্ণ শিল্পী বঙ্কিমকে না পেলেও একটি প্রতিভাধর শক্তিমান শিল্পীর সাক্ষাৎ পেলাম। এই উপাদানগুলিকে তিনি ক্রমান্বয়ে মার্জিত ও পরিশীলিত ক'রে তুলতে লাগলেন পরবর্তী উপন্যাসে।

গঠনকৌশলের নূতনত্বে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের এক স্মরণীয় সৃষ্টি। গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদে পূর্ববর্তী লেখকদের রচনা উদ্ধৃত ক'রে কাহিনীর পূর্বাভাষ দান করা হয়েছে। কাহিনী বয়নে জটিলতার সৃষ্টি করলেও, সহজভাবেই লেখক কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কালগত ঐক্য দৃঢ়বদ্ধ। মাত্র এক বছরের কিছু বেশী সময়ের ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। পটভূমি-নির্বাচনেও বঙ্কিমচন্দ্র সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চল, সপ্তগ্রাম ও দিল্লীকেই গ্রহণ করেছেন।

কপালকুণ্ডলা

কপালকুণ্ডলার চরিত্র ও কাহিনীর সংগে সমুদ্র-তীরবর্তী বনভূমি ও সপ্তগ্রামের বনভূমি অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে নাটকীয় চমকদানও উল্লেখযোগ্য। সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আবর্ষণ করে এই গ্রন্থের ভাষাভঙ্গী। বঙ্কিমের কবি হৃদয়ের বাণীমূর্ছনা ঝরে পড়েছে 'কপালকুণ্ডলা'র প্রতিটি ছত্রে। তার ফলে কাব্যের পরিবেশের মতো সমস্ত কাহিনীটিই পাঠকের মনকে সুদূর স্বপ্নলোকে টেনে নিয়ে যায়।

সংহত বাক্যরচনায় বঙ্কিম এখানে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নির্জন সমুদ্রতীরে কপালকুণ্ডলার উক্তি—'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' সমগ্র পরিবেশটিকে কাব্যত্বমণ্ডিত করেছে। মতিবিবির কাছে নবকুমার পরিচয়দানের পরমুহূর্তেই —"প্রদীপ নিভিয়া গেল।" সংক্ষিপ্ত বাক্যটি ব্যবহার ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ নাটকীয় চমকসৃষ্টি ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

এই উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদটি বঙ্কিমচন্দ্রের কবিত্বশক্তি, নাটকীয় রস-পরিবেশনে দক্ষতা ও সংহত বাক্যপ্রয়োগে গভীর ভাব প্রকাশের সার্থক উদাহরণ।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কয়েকটি স্বপ্নবৃত্তান্ত আছে। চতুর্থখণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদর্শনটি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বপ্নে কপালকুণ্ডলা দেখেছে

যে এক ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলার নৌকা নিমজ্জিত করেছে। ঘটনাটি যে নিছক স্বপ্নমাত্র নয়, তার আভাস দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের প্রথমে বায়রণের উদ্ধৃতি দিয়ে—"I had a dream, which was not all a dream"। আসলে স্বপ্নবৃত্তান্তটিকে বঙ্কিমচন্দ্র মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের কাজে লাগিয়েছেন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা যখন ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের পত্র পেয়ে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করবে কিনা চিন্তা করছে, তখন সেই স্বপ্ন তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করল।

"সে স্বপ্নের তাৎপর্য্য কি? স্বপ্নে ব্রাহ্মণবেশী মহাবিপত্তিকালে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কার্যেও তাহাই ফলিতেছে। ব্রাহ্মণবেশী সকল কথা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন, "নিমগ্ন কর।" কার্য্যেও কি সেইরূপ বলিবেন? না—না—ভক্তবৎসলা ভবানী অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্নে তাঁহার রক্ষাহেতু উপদেশ দিয়াছেন, ব্রাহ্মণবেশী আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছেন; তাঁহার সাহায্য ত্যাগ করিলে নিমগ্ন হইবেন। অতএব কপালকুণ্ডলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কি না, তাহাতে সন্দেহ; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সংশ্রব নাই। কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তরূপরাশিদর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, নৈশবনভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসিপালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানীভক্তি-ভাববিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।" (৩/৪)

অপর স্বপ্নটি কাপালিক-কর্তৃক নবকুমারের নিকট বর্ণিত হয়েছে। —"প্রভাতকালে আমার সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পুনরাবির্ভূত হইল। তাহার অব্যবহিত পূর্বেই আমি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন ভবানী—" বলিতে বলিতে কাপালিকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। "যেন ভবানী আসিয়া আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। ভ্রূকুটি করিয়া আমায় তাড়না করিতেছেন; কহিতেছেন, 'রে দুরাচার' তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণীতে এত দিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্বকৃত্যফল বিনষ্ট হইল। আমি তোর নিকট আর কখনও পূজা গ্রহণ করিব না।' তখন আমি রোদন

করিয়া জননীর চরণে অবলুণ্ঠিত হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'ভদ্র! ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবে। সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যতদিন না পার, আমার পূজা করিও না।' (৪/৬)

এই স্বপ্নের দ্বারা কাপালিক নবকুমারকে তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। তাই কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের স্বপ্ন মনস্তাত্ত্বিক কারণেই প্রয়োগ করা হয়েছে।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কতকগুলি ঘটনা আছে যেগুলি আপাতঃদৃষ্টিতে অলৌকিক পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেগুলিকে অবলীলাক্রমে বর্ণনা করেছেন। কপালকুণ্ডলা পতিগৃহে যাত্রার পূর্বে দেবীর কাছে যখন সম্মতি প্রার্থনা করেছে তখন তার প্রদত্ত বিল্বপত্র প্রতিমাচরণচ্যুত হয়ে অশুভ ইংগিত দান করেছে।

বিষয়টি অলৌকিক কিনা এই বিংশ শতাব্দীতেও তা কেউ জোর ক'রে বলতে পারবেন না। কারণ এ-কালেও বহু মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কার তাদের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে-কারণেই বিল্বপত্র পতিত হোক না কেন, ধর্মসংস্কারাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পালিতা কপালকুণ্ডলার মনে তার প্রভাব পড়াই স্বাভাবিক। অপরদিকে, লেখকও এই অশুভ সংকেতের দ্বারা পাঠকমনে কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎজীবন সম্পর্কে একটি সংশয়যুক্ত কৌতূহলের সঞ্চার করেছেন।

আর একটি অলৌকিক ঘটনা হল কপালকুণ্ডলা কর্তৃক আকাশে দেবীদর্শন। এই ঘটনাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র পরিবেশ ও মানসিকতার দিক থেকে এমনই সামঞ্জস্যপূর্ণ ক'রে তুলেছেন যে অবিশ্বাস করার কোন কারণ ঘটে না। "যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্যসৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।" (৪/৮)

'মৃণালিনী' 'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্তী রচনা হলেও রচনারীতিতে দুর্বল। এ সম্পর্কে বঙ্কিম-মানসের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—"মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা 'কপালকুণ্ডলা'য় যে বিদ্যুৎদীপ্তির পরিচয় দিয়েছিল তার পরে তাঁর চিত্ত কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তাই 'মৃণালিনী' অজস্র দোষযুক্ত রচনা।" (কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র)

মৃণালিনী

'মৃণালিনী'র রচনারীতিতে এই নিকৃষ্টতা থাকার অন্য একটি কারণ থাকাও সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসের পরিকল্পনায় দ্বিধা ছিল—অর্থাৎ তিনি ইতিহাসের কাহিনীকে প্রাধান্য দেবেন, না হেমচন্দ্র-মনোরমার প্রণয়কাহিনীকে প্রাধান্য দেবেন তা স্থির করতে পারছিলেন না। তাই যে 'গজহস্তা' প্রভৃতি ঘটনা দিয়ে প্রথমদিকে 'মৃণালিনী' উপন্যাসের সূচনা ক'রেছিলেন, পরবর্তীকালে তা বর্জন করতে হয়েছে। কাহিনীগঠনেও যথেষ্ট শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়।

সংগীতের আধিক্য 'মৃণালিনী'র কাহিনীকে কিছুটা হাল্কা করেছে।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস রচনায় বঙ্কিম তাঁর শিল্পকর্মের জটিল কলাকৌশল প্রয়োগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত মন এই উপন্যাসের শিল্পরীতিতেও পরিণতির চিহ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। এখানে ইতিহাসের ঘটনার সংগে সাধারণ মানুষের ঘটনাকে তিনি সার্থকভাবে সংযুক্ত করেন। অনেকস্থানে তিনি পরবর্তী ঘটনাকে পূর্বে বর্ণনা ক'রে পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করেছেন এবং কাহিনীতে রহস্যময়তার সৃষ্টি করেছেন। 'চন্দ্রশেখরে'র পরিচ্ছেদ নামকরণে যেখানে শৈবলিনীর ঘটনা আছে, সেখানে বঙ্কিমের নীতি-শাসিত মনোভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছে; যেমন—পাপীয়সী, পাপের বিচিত্র গতি প্রভৃতি। কাহিনীর সূচনা এবং মূল ঘটনার মধ্যে আট বছরের ব্যবধান। এই কালগত শিথিলতাকে তিনি অনেক পরিমাণে ঢেকেছেন প্রথম অংশটিকে মূল কাহিনীর বহির্ভূত 'উপক্রমণিকা' অংশে রেখে।

চন্দ্রশেখর

'চন্দ্রশেখর'-এর ভাষা ও বর্ণনাভংগীর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। শৈবলিনী-ফষ্টরের কথোপকথন, নবাব-প্রতাপ-শৈবলিনীর কথোপকথন, প্রতাপের আকস্মিক মৃত্যুবরণ প্রভৃতি ঘটনা ও বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে অনেকাংশে নাটকের রীতিকে গ্রহণ করেছেন। এতে কাহিনীর চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য, বঙ্কিমের কথোপকথনের ভাষা সব সময়ে নাটকের সংলাপের ভাষা হয়ে ওঠেনি। অনেক স্থানে কথোপকথনের ভাষার মধ্যেও আলঙ্কারিক চমৎকৃতি প্রকাশিত হয়েছে। তবে বর্ণনার ভাষায় বঙ্কিম যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়ানুসারে ভাষারও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রতাপ-শৈবলিনীর গঙ্গাবক্ষে সন্তরণের ভাষা এক, শৈবলিনীর নরকদর্শনের বর্ণনা আর একরকমের, রামচরণের কীর্তিকলাপের ভাষাও অন্য। কখনো তৎসম-বহুল, সমাস-বদ্ধ, যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ; আবার কখনও অনলঙ্কৃত তদ্ভব ও দেশী-বিদেশী শব্দের প্রয়োগ।

তবে উপন্যাসের দু'একটি স্থানে পরিকল্পনাগত ত্রুটি ও কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি আছে। যেমন এক স্থানে প্রতাপ সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন—"চন্দ্রশেখর নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমিদার। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা এবং দেশবিখ্যাত নাম।" আবার সেই প্রতাপ শৈবলিনী-উদ্ধারকালে বলেছেন—"শুন আমার নাম প্রতাপ রায়। নবাবও আমাকে ভয় করেন।" আবার মীরকাশেম শৈবলিনীকে জিজ্ঞেস করেছেন—"প্রতাপ কে? তাহার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল?

শৈ। সরকারের চাকরি করিবেন বলিয়া।"

এই উদ্ধৃতিগুলি পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রকাশ করে। (এ ত্রুটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের 'কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনীর স্বপ্নকেও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকায় স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম স্বপ্নটির কেবলমাত্র উল্লেখ আছে, বর্ণনা নেই (২/৮)। 'শৈবলিনী শয়ন করিল। শয়ন করিয়া, সেইরূপ চিন্তাভিভূত রহিল। প্রভাতকালে তাহার নিদ্রা আসিল—নিদ্রায় নানাবিধ কুস্বপ্ন দেখিল।"

দ্বিতীয় স্বপ্নটি বর্ণিত হয়েছে চতুর্থখণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। স্বপ্নটি এরূপ—

"সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে, শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনন্ত-বিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—দু-কূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোতঃ বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নরদেহ, নৃমুণ্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। কুম্ভীরাকৃতি জীবসকল—চর্ম-মাংসাদি-বর্জিত—কেবল অস্থি, ও বৃহৎ, ভীষণ উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়বিশিষ্ট,—ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সেই সকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। শৈবলিনী দেখিল যে, যে মহাকায় পুরুষ তাহাকে পর্বত হইতে ধৃত করিয়া আনিয়াছে, সেই আবার তাহাকে ধৃত করিয়া সেই নদীতীরে আনিয়া বসাইল। সে প্রদেশে রৌদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোক মাত্র নাই—অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা যাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই—

তৎপরিবর্তে লৌহসূচী সকল অগ্রভাগ উর্দ্ধ করিয়া রহিয়াছে। শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সেইখানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিলেন। পারের কোন উপায় নাই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিলেন, সাঁতার দিয়া পার হ, তুই সাঁতার জানিস্—গঙ্গায়, প্রতাপের সঙ্গে অনেক সাঁতার দিয়াছিস্। শৈবলিনী এই রুধিরের নদীতে কি প্রকারে সাঁতার দিবে? মহাকায় পুরুষ তখন হস্তস্থিত বেত্র প্রহার জন্য উত্থিত করিলেন। শৈবলিনী সভয়ে দেখিল যে, সেই বেত্র জলন্ত লোহিত লৌহনির্মিত। শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া, মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিল। শৈবলিনী প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিল। অমনি অস্থিময় কুম্ভীর সকল তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। শৈবলিনী সাঁতার দিয়া চলিল; রুধিরস্রোতঃ বদনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাকায় পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রুধির-স্রোতের উপর দিয়া পদব্রজে চলিলেন—ডুবিলেন না। মধ্যে মধ্যে পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট গলিত শব ভাসিয়া আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রে লাগিতে লাগিল। এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল। সেখানে কূলে উঠিয়া চাহিয়া দেখিয়া, "রক্ষা কর। রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহার সীমা নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু এতাদৃশ উত্তপ্ত যে, তাহা চক্ষে প্রবেশমাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল—বিষসংযোগে যেরূপ জ্বালা সম্ভব, চক্ষে সেইরূপ জ্বালা ধরিল। নাসিকায় এরূপ ভয়ানক পূতিগন্ধ প্রবেশ করিল যে, শৈবলিনী নাসিকা আবৃত করিয়াও উন্মত্তার ন্যায় হইল। কর্ণে, অতি কঠোর, কর্কশ, শব্দ সকল এককালে প্রবেশ করিতে লাগিল—হৃদয়-বিদারক আর্তনাদ, পৈশাচিক হাস্য, বিকট হুঙ্কার, পর্বতবিদারণ, অশনিপতন, শিলাবর্ষণ, জল-কল্লোল, অগ্নিগর্জন, মুমূর্ষুর ক্রন্দন, সকলই এককালে শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সম্মুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে ভীমনাদে এরূপ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে, তাহাতে শৈবলিনীকে অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল—কখন বা শীতে শতসহস্র ছুরিকাঘাতের ন্যায় অঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। শৈবলিনী ডাকিতে লাগিল, "প্রাণ যায়। রক্ষা কর!" তখন অসহ্য পূতিগন্ধবিশিষ্ট এক বৃহৎ বৃহৎ কদর্য কীট আসিয়া শৈবলিনীর মুখে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৈবলিনী তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "রক্ষা কর! এ নরক! এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

এই স্বপ্ন 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের মত কাহিনীর ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত বা ইতিকর্তব্যনির্দ্ধারণের জন্য বর্ণিত হয়নি। এখানে স্বপ্ন বা মতিভ্রম দ্বারা শৈবলিনীর হৃদয়ের আলোড়নকেই প্রকাশ করা হয়েছে। চন্দ্রশেখরকে বিবাহের পরও প্রতাপকে ভুলতে না পেরে শৈবলিনীর হৃদয়ে যে দ্বিধা দেখা দিয়েছিল, তা সুন্দরভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন এই জাতীয় চিত্তবিকারের মধ্য দিয়ে। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র এই অলৌকিক ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলার জন্য পটভূমি রচনা করে নিয়েছেন।

তাই স্বপ্নবৃত্তান্তদানের পূর্বে তিনি লিখলেন—"মহান্ধকারময় পর্বতগুহা—পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু গুহামধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ। নয়ন মুদিলে অন্ধকার—চক্ষু চাহিলে তেমনই অন্ধকার। নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্বতস্থ রন্ধ্রপথে বিন্দু বিন্দু বারি গুহাতলস্থ শিলার উপরে পড়িয়া, ক্ষণে ক্ষণে টিপ টাপ্ শব্দ করিতেছে। আর যেন কোন জীব, মনুষ্য কি পশু—কে জানে?—সেই গুহামধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূতা হইলেন। ভয়? তাহাও নহে। মনুষ্যের স্থিরবুদ্ধিতার সীমা আছে—শৈবলিনী সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। শৈবলিনীর ভয় নাই—কেন না, জীবন তাঁহার পক্ষে অবহনীয়, অসহনীয় ভার হইয়া উঠিয়াছিল—ফেলিতে পারিলেই ভাল। বাকি যাহা—সুখ, ধর্ম, জাতি, কুল, মান, সকলই গিয়াছিল—আর যাইবে কি? কিসের ভয়?

কিন্তু শৈবলিনী আশৈশব, চিরকাল যে আশা হৃদয়মধ্যে সযত্নে, সঙ্গোপনে পালিত করিয়াছিল, সেই দিন বা তাহার পূর্বেই, তাহার উচ্ছেদ করিয়াছিল; যাহার জন্য সর্বত্যাগিনী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাও ত্যাগ করিয়াছে; চিত্ত নিতান্ত বিকল; নিতান্ত বলশূন্য। আবার প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, পর্বতারোহণশ্রান্তি; বাত্যাবৃষ্টিজনিত পীড়াভোগ; শরীরও নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য; তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার—দৈব বলিয়াই শৈবলিনীর বোধ হইল—মানবচিত্ত আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে? দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃতচেতনা হইয়া অর্ধনিদ্রাভিভূত, অর্ধজাগ্রতবস্থায় রহিল। গুহাতলস্থ উপলখণ্ডসকলে পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত হইতেছিল।" (৩/২)।

এই পরিস্থিতিতে শৈবলিনীর মনে বিচিত্র ভাবের উদয় হওয়া অসম্ভব নয়।

শৈবলিনীর তৃতীয় স্বপ্ন বর্ণিত হয়েছে ৪র্থ খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদে। সেখানেও স্বপ্নবৃত্তান্তের উপযোগী পটভূমি প্রস্তুত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

"মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে। শৈবলিনী পঞ্চম দিবসে আহরিত ফল মূল খাইল না—ষষ্ঠ দিবসে ফল মূল আহরণে গেল না—সপ্তম দিবসে প্রাতে ভাবিল, স্বামিদর্শন পাই না পাই—অদ্য মরিব। সপ্তম রাত্রে মনে করিল, হৃদয়মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন; শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদপদ্মে গুণগুণ করিতেছে।

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে, একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইল। সে নানা বিষয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কখন দেখিল, সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত, শতহস্তপরিমিত, সর্পগণ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে; অযুত মুণ্ডে মুখব্যাদন করিয়া শৈবলিনীকে গিলিতে আসিতেছে। সকলের মিলিত নিশ্বাসে প্রবল বাত্যার ন্যায় শব্দ হইতেছে। চন্দ্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন সর্প সকল বন্যার জলের ন্যায় সরিয়া গেল। কখন দেখিল, এক অনন্ত কুণ্ডে পর্বতাকার অগ্নি জ্বলিতেছে। আকাশে তাহার শিখা উঠিতেছে; শৈবলিনী তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে; এমত সময়ে চন্দ্রশেখর আসিয়া সেই অগ্নিপর্বতমধ্যে এক গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ করিলেন, অমনি অগ্নিরাশি নিবিয়া গেল; শীতল পবন বহিল, কুণ্ডমধ্যে স্বচ্ছসলিলা তরতরবাহিনী নদী বহিল, তীরে কুসুম সকল বিকশিত হইল, নদীজলে বড় বড় পদ্মফুল ফুটিল—চন্দ্রশেখর তাহার উপর দাঁড়াইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। কখন দেখিল, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া শৈবলিনীকে মুখে করিয়া তুলিয়া পর্বতে লইয়া যাইতেছে; চন্দ্রশেখর আসিয়া পূজার পুষ্পপাত্র হইতে একটি পুষ্প লইয়া ব্যাঘ্রকে ফেলিয়া মারিলেন, ব্যাঘ্র তখনই ভিন্ন শিরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, শৈবলিনী দেখিল, তাহার মুখ ফষ্টরের মুখের ন্যায়।

রাত্রিশেষে শৈবলিনী দেখিলেন, শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে অথচ জ্ঞান

আছে। দেখিলেন, পিশাচে তাহার দেহ লইয়া অন্ধকারে শূন্যপথে উড়িতেছে। দেখিলেন, কত কৃষ্ণমেঘের সমুদ্র, কত বিদ্যুদগ্নিরাশি পার হইয়া তাহার কেশ ধরিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। কত গগনবাসী অপ্সরা কিন্নরাদি মেঘতরঙ্গ মধ্য হইতে মুখমণ্ডল উত্থিত করিয়া, শৈবলিনীকে দেখিয়া হাসিতেছে। দেখিলেন, কত গগনচারিণী জ্যোতির্ময়ী দেবী স্বর্ণ-মেঘে আরোহণ করিয়া, স্বর্ণকলেবর বিদ্যুতের মালায় ভূষিত করিয়া, কৃষ্ণকেশাবৃত ললাটে তারার মালা গ্রথিত করিয়া বেড়াইতেছে,—শৈবলিনীর পাপময় দেহস্পৃষ্ট পবনস্পর্শে তাহাদের জ্যোতিঃ নিবিয়া যাইতেছে। কত গগনচারিণী ভৈরবী রাক্ষসী, অন্ধকারবৎ শরীর প্রকাণ্ড অন্ধকার মেঘের উপর হেলাইয়া ভীম বাত্যায় ঘুরিয়া ক্রীড়া করিতেছে,—শৈবলিনীর পূতিগন্ধবিশিষ্ট মৃতদেহ দেখিয়া তাহাদের মুখের জল পড়িতেছে, তাহারা হাঁ করিয়া আহার করিতে আসিতেছে। দেখিলেন, কত দেব দেবীর বিমানের কৃষ্ণতাশূন্যা উজ্জ্বলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে; পাছে পাপিষ্ঠা শৈবালিনীশবের ছায়া বিমানের পবিত্র ছায়ায় লাগিলে শৈবালিনীর পাপক্ষয় হয়, এই ভয়ে তাঁহারা বিমান সরাইয়া লইতেছেন। দেখিলেন, নক্ষত্রসুন্দরীগণ নীলাম্বরমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি বাহির করিয়া সকলে কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে—বলিতেছে—"দেখ, ভগিনী, দেখ, মনুষ্য-কীটের মধ্যে আবার অসতী আছে!" কোন তারা শিহরিয়া চক্ষু বুজিতেছে; কোন তারা লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে, কোন তারা অসতীর নাম শুনিয়া ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে। পিশাচেরা শৈবলিনীকে লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, তার পর আরও ঊর্দ্ধে, আরও মেঘ, আরও তারা পার হইয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। অতি ঊর্দ্ধে উঠিয়া সেইখান হইতে শৈবলিনীর দেহ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া উঠিতেছে। যেখানে উঠিল, সেখানে অন্ধকার, শীত,—মেঘ নাই, তারা নাই, আলো নাই, বায়ু নাই, শব্দ নাই। শব্দ নাই—কিন্তু অকস্মাৎ অতি দূরে অধঃ হইতে অতি ভীম কলকল ঘরঘর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল—যেন অতিদূরে, অধোভাগে, শত সহস্র সমুদ্র এককালে গর্জ্জিতেছে। পিশাচেরা বলিল, ঐ নরকের কোলাহল শুনা যাইতেছে, এইখান হইতে শব ফেলিয়া দাও। এই বলিয়া পিশাচেরা শৈবলিনীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া শব ফেলিয়া দিল। শৈবলিনী ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, পড়িতে লাগিল। ক্রমে ঘূর্ণগতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। শবের মুখে, নাসিকায়, রক্তবমন হইতে লাগিল।

ক্রমে নরকের গর্জন নিকটে শুনা যাইতে লাগিল, পূতিগন্ধ বাড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ সজ্ঞানমৃতা শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইল। তাহার পরেই তাহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল, তখন সে মনে মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিল, মনে মনে ডাকিতে লাগিল,—"কোথায় তুমি, স্বামী! কোথায় প্রভু! স্ত্রীজাতির জীবনসহায় আরাধনার দেবতা, সর্বে সর্বমঙ্গল! কোথায় তুমি চন্দ্রশেখর! তোমার চরণারবিন্দে সহস্র, সহস্র, সহস্র, সহস্র প্রণাম! আমায় রক্ষা কর। তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া, আমি এই নরককুণ্ডে পতিত হইতেছি—তুমি রক্ষা না করিলে কোন দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পারে না—আমায় রক্ষা কর। তুমি আমায় রক্ষা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া চরণযুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।"

এই বর্ণনাটিকে স্বপ্ন না ব'লে মানসিক বিকার বলা যেতে পারে। এইজন্যই চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে যখন শৈবলিনী সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ তখন 'চন্দ্রশেখর দেখিলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে।'

একে কি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাগীশ মনের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করব? না মানবহৃদয়ের পাপ-পুণ্য বোধ সম্পর্কে যে দোলাচাল চিত্তবৃত্তি বিরাজমান তার প্রতীকরূপে গ্রহণ করব? আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ এই নীতি থেকে কতটা সরে আসতে পারেন—সেটা চিন্তার বিষয়।

'যুগলাঙ্গুরীয়' 'রাধারাণী' ও 'ইন্দিরা' (ছোট)-কে বঙ্কিমচন্দ্র একত্রে 'উপকথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সেদিক থেকে এই তিনটি গ্রন্থের রচনারীতির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সহজ-সরল গল্পকথনরীতিকেই গ্রহণ করেছেন।

যুগলাঙ্গুরীয় রাধারাণী ইন্দিরা

'যুগলাঙ্গুরীয়'তে রূপকথার একটি রাজ্যকে তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। 'রাধারাণী'তে আছে রোমান্সের প্রাচুর্য। সরল ও কোমল বর্ণনা-রীতি যেন রাধারাণীর কোমল-মাধুর্যময় চরিত্রের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'রাধা-রাণী'র পাঠক সম্বোধনটি লক্ষ্য করার মত। যেহেতু এখানে নারীর কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে সেজন্য পাঠকসম্বোধনে নারীসুলভ ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছে।

'ইন্দিরা' উপন্যাসের রচনারীতিতে বঙ্কিম নূতনত্ব এনেছেন। ইংরেজী

সাহিত্যে তখন এ ধরণের উপন্যাস ছিল। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমই প্রথম গল্পের পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে ঘটনা বর্ণনা করালেন। এই উপন্যাসের নায়িকা ইন্দিরাই গল্পকথক। এই ধরণের উপন্যাসে কিছু অসুবিধা আছে। একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ করা হয় বলে, অন্য চরিত্রগুলি তত পরিস্ফুট হতে পারে না। 'ইন্দিরা' উপন্যাসে অবশ্য ইন্দিরা যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। তবুও বলা যায় যে, ইন্দিরার বর্ণনার জন্যই তার স্বামীর কোন কৈফিয়ৎ বা চিন্তাধারা পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়নি।

'ইন্দিরা'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ও বৃহৎ সংস্করণের আকৃতিগত পার্থক্যের সংগে সংগে কিছু রীতিগত পার্থক্যও ঘটেছে। সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পরিচ্ছেদের নামকরণ ছিল না। পঞ্চম সংস্করণের নামকরণের অনেকগুলির মধ্যে স্নিগ্ধ কৌতুক-রস প্রকাশিত। এই সংস্করণে ছড়াগুলি সংযোজিত হয়ে এক নূতন শ্রী দান করেছে। 'ইন্দিরা'র ভাষার মধ্যে একটি সারল্য ও পরিচ্ছন্ন রূপ প্রকাশিত।

'রজনী' উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর রচনারীতি। বঙ্কিম যেমন বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত স্রষ্টা, তেমনি তিনি বাংলা উপন্যাসের জগতে নূতনতর রীতিরও প্রবর্তক। অবশ্য, এই রীতি তিনি ইংরেজী উপন্যাস থেকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, উইল্‌কি কলিন্স-এর "Woman in White" নামক গ্রন্থে এই রীতি প্রথম ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই রীতি ব্যবহৃত হয়। এতে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মুখের কথায় কাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এই প্রথার উপযোগিতা সম্বন্ধে বঙ্কিম দুটি যুক্তি দিয়েছেন। প্রথমতঃ, এর দ্বারা যার মুখে যে কথা শুনতে ভাল লাগে, তার মুখ দিয়ে সে-কথা বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, 'রজনী' উপন্যাসের অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপারের জন্য তিনি পাত্র-পাত্রীদের উপরেই দোষারোপ করতে চেয়েছেন।

রজনী

বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদত্ত প্রথম যুক্তিটি সার্থক। রজনীর বর্ণনার রীতি এক, আবার লবঙ্গলতার বর্ণনার রস অন্য, অমরনাথের হতাশাব্যঞ্জক জীবনের আবেদনও স্বতন্ত্র। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর দ্বারা বর্ণনার ফলে 'রজনী'র একই আধারে বহু রসের প্লাবন দেখা গেছে। তবে এর মধ্যে 'রজনীর কথা'ই উৎকৃষ্ট ও শচীন্দ্রের বর্ণিত অংশ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্বন্ধে বলা চলে যে, অলৌকিকে বিশ্বাসস্থাপনের দায় হয়তো

বিশিষ্ট চরিত্রের উপর চাপানো যায়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এর জন্য লেখককেই দায়ী হতে হয়।

এই রীতির দোষও একটু আছে। বিভিন্ন চরিত্র, ঘটনা বর্ণনা করায় মনে হয় তারা কি যুক্তি ক'রে পর পর কাহিনী বর্ণনা করেছে? তা নইলে শৃঙ্খলা বজায় রেখে কি করে বিভিন্ন চরিত্র পর পর কাহিনী বলে যাচ্ছে! এ বিষয়ে 'রজনী'তে বঙ্কিম যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয়, ঘটনাটি ঘটে যাবার পর রজনী-লবঙ্গলতা-অমরনাথ ও শচীন্দ্র যুক্তি করে কাহিনীটি রচনা করেছে। কিন্তু শেষাংশে অমরনাথ যেভাবে আবার উধাও হলেন, তাতে পাণ্ডুলিপির সন্ধানে তার পশ্চাতে কাকে দৌড়াতে হয়েছিল কে জানে? তবে এরূপ চিন্তা, লেখক কর্তৃক ঘটনা বর্ণিত হলেও, জাগা স্বাভাবিক ছিল।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিষয় নির্বাচনে যেমন নূতনত্ব দেখিয়েছেন, তেমনি রচনারীতিতেও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। বিষয় এখানে বাস্তবের মাটি যেমন স্পর্শ করেছে, বর্ণনাতেও তেমনি বাস্তবতার স্পর্শ রয়েছে। (দ্রঃ ১ম পরিচ্ছেদ)। অনাড়ম্বর শব্দযোজনা ও বর্ণনার স্বাভাবিকতা দ্বারা তিনি বর্ষার নিম্নলিখিত চিত্রটি কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা লক্ষ্য করা যেতে পারে—"বর্ষাকাল। বড় দুর্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা।"

বিষবৃক্ষ

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের পত্রগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিকবৈচিত্র্য দান করেছে। এই উপন্যাসে মোট ১৪টি পত্র স্থান পেয়েছে। এর পূর্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কিছু পত্র ব্যবহার করেছেন এবং পরেও করেছেন। যেমন 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি কপালকুণ্ডাকে পত্র লিখে তার সংগে সংকেতস্থানে দেখা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এবং সেই পত্র কপালকুণ্ডলার ভাগ্য বিপর্যয়ের একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে দালনীবেগম নবাবের উদ্দেশ্যে পত্র লিখেছে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে চঞ্চলকুমারীও রাণা রাজসিংহকে পত্র মারফৎ তাঁর মর্যদারক্ষার জন্য তাঁকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের মত আর কোনও উপন্যাসে পত্রগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেনি।

পত্রের মাধ্যমে মনের ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়। তাই পত্র গুলিকে মানসিক আলোড়নের স্বরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র উপযুক্তভাবে

ব্যবহার করেছেন। এই পত্রগুলি সংশ্লিষ্ট লেখকের চরিত্রের উপর আলোকপাত করতে সাহায্য করে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে পত্রগুলি লিখেছেন—নগেন্দ্রনাথ, হরদেব ঘোষাল, সূর্যমুখী, কমলমণি ও ব্রহ্মচারী।

নগেন্দ্রনাথ কর্মোপলক্ষে কলকাতায় যাবার পথে কুন্দকে দেখতে পেয়েছেন। তাকে নিয়েই উঠলেন ভগিনী কমলমণির গৃহে। সেখান থেকে নগেন্দ্র তাঁর প্রবাসী বন্ধু হরদেব ঘোষালকে লিখছেন (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। এই পত্রে নগেন্দ্র রসিকতার সংগে কুন্দের বালিকাবয়সের রূপের প্রশংসা করলেও, তাঁর মনে যে কুন্দের রূপের প্রভাব সঞ্চারিত হচ্ছিল তার ইংগিত পাওয়া যায়। ঐ পরিচ্ছেদেই ২নং পত্রটি এসেছে সূর্য্যমুখীর কাছ থেকে নগেন্দ্রনাথের চিঠির প্রত্যুত্তর স্বরূপ। বোঝা যায় নগেন্দ্রনাথ হরদেব ঘোষালের মত সূর্যমুখীকেও চিঠিতে রসিকতার ছলেই কুন্দের কথা লিখেছিলেন। তার উত্তরে সূর্যমুখীর পত্র—

"দাসী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় যদি তোমার এত দিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা নিকটে গিয়া পদসেবা না করি? এ বিষয়ে আমার বিশেষ মিনতি; হুকুম পাইলেই ছুটিব।

"একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিষের কাঁচারই আদর। নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কেবল কাঁচামিঠে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?

"তামাসা যাউক, তুমি কি মেয়েটি একেবারে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া বিলাইয়া দিয়াছ? নহিলে আমি সেটি তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়া লইতাম। মেয়েটিতে আমার কাজ আছে। তুমি কোন সামগ্রী পাইলে তাহাতে আমার অধিকার হওয়াই উচিত, কিন্তু আজি কালি দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই পুরা অধিকার।

"মেয়েটিতে কি কাজ? আমি তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। তারাচরণের জন্য একটি ভাল মেয়ে আমি কত খুঁজিতেছি তা ত জান। যদি একটি ভাল মেয়ে বিধাতা মিলাইয়াছেন, তবে আমাকে নিরাশ করিও না। কমল যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আসিবার সময়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও। আমি কমলকেও অনুরোধ করিয়া লিখিলাম। আমি গহনা গড়াইতে ও বিবাহের আর আর উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কলিকাতায়

বিলম্ব করিও না, কলিকাতায় না কি ছয় মাস থাকিলে মনুষ্য ভেড়া হয়। আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।"

এই চিঠির মাধ্যমে সূর্যমুখীর স্বামীপ্রেম ও সরলতা যেমন প্রকাশিত, তেমনি কুন্দকে তারাচরণের সংগে বিবাহ দেবার জন্য নিয়ে আসতে বলে সে নিজের জীবনের বিড়ম্বনার ভবিষ্যৎ বীজ বপন করেছে। সর্বোপরি—স্বামীকে রসিকতার ছলে কুন্দকে বিবাহ করার বিষয়টির মধ্য দিয়ে সূর্যমুখীর ভবিষ্যৎ ভাগ্য বিড়ম্বনার (Irony of fate) ইংগিত দান করা হয়েছে।

একাদশ পরিচ্ছেদে কমলমণিকে লেখা সূর্যমুখীর পত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারলাম—কুন্দ ধীরে ধীরে কিভাবে নগেন্দ্রকে আচ্ছন্ন করছে।—

"...আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়া মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম?

তুমি সে হতভাগিনীকে' যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইয়াছে। সে যে সুন্দরী, তাহা স্বীকার করিতেছি। সেই সৌন্দর্য্যই আমার কাল হইয়াছে।

পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী, কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।

তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সেদিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভর্ৎসনা করিতেও শুনিয়াছি।

তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়া মরি? পুরুষে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝান বড় ভার হইত; কিন্তু তুমি মেয়েমানুষ, এতক্ষণে বুঝিয়াছ। যদি কুন্দনন্দিনী অন্য স্ত্রীলোকের মত তাঁহার চক্ষে সামান্যা হইত, তবে তিনি কেন তাহার প্রতি না চাহিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন? তাহার নাম মুখে না আনিবার জন্য কেন এত যত্নশীল হইবেন? কুন্দনন্দিনীর জন্য তিনি আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন। এ জন্য কখন কখন তাহার প্রতি অকারণ ভর্ৎসনা করেন। সে রাগ তাহার উপর নহে—আপনার উপর। সে ভর্ৎসনা তাহাকে নহে, আপনাকে। আমি ইহা বুঝিতে পারি। আমি এতকাল পর্য্যন্ত অনন্যব্রত হইয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম—তাঁহার ছায়া দেখিলে তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি—তিনি আমাকে কি লুকাইবেন? কখন কখন অন্যমনে তাঁহার চক্ষু এদিক্ ওদিক্ চাহে কাহার সন্ধানে, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন কেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? কাহার কণ্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহারের সময় গ্রাস হাতে করিয়াও কাণ তুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? হাতের ভাত হাতে থাকে, কি মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কাণ তুলিয়া থাকেন,—কেন? আবার কুন্দের স্বর কাণে গেলে তখনই বড় জোরে হাপুস হুপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন কেন, তা কি বুঝিতে পারি না? আমার প্রাণাধিক সর্বদা প্রসন্নবদন—এখন এত অন্যমনা: কেন? কথা বলিলে কথা কাণে না তুলিয়া, অন্যমনে উত্তর দেন 'হুঁ',—আমি যদি রাগ করিয়া বলি, "আমি শীঘ্র মরি," তিনি না শুনিয়া বলেন 'হুঁ'। এত অন্যমনা: কেন? জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "মোকদ্দমার জ্বালায়।" আমি জানি, মোকদ্দমার কথা তাঁহার মনে স্থান পায় না। যখন মোকদ্দমার কথা বলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া কথা বলেন। আর এক কথা—এক দিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথা কহিতেছিল, তাহার বালবৈধব্য, অনাথিনীত্ব এই সকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল। তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু জলে পুরিয়া গেল—তিনি সহসা দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

এখন একজন নূতন দাসী রাখিয়াছি। তার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। আর কত অপ্রতিভ হন! অপ্রতিভ কেন?

এ কথা বলিতে পারিব না যে, তিনি আমাকে অযত্ন বা অনাদর করেন। বরং পূর্বাপেক্ষা অধিক যত্ন, অধিক আদর করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমি তাঁহার মনে স্থান পাই না। যত্ন এক, ভালবাসা আর, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি—আমরা স্ত্রীলোক সহজেই বুঝিতে পারি। ...."

এই পত্রের মধ্যে নগেন্দ্রের জন্য সূর্যমুখীর উদ্বেগ, ভালোবাসা ও কুন্দকে নিয়ে শংকা যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা অন্যভাবে বর্ণনা করা যেত না।

এর উত্তরে চতুর্থসংখ্যক পত্রটি লিখেছে কমলমণি। পতিপরায়ণা কমলমণি সূর্যমুখীর এই শংকাকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয়নি। তাই সে সূর্যমুখীকে পরামর্শ দিয়েছে স্বামীর প্রতি বিশ্বাস না রাখতে পারলে সে যেন ডুবে মরে।

(দ্রঃ বিষবৃক্ষ। একাদশ পরিচ্ছেদ)।

ইতিমধ্যে যে ক'দিন অতিবাহিত হয়েছে তাতে নগেন্দ্রের মানসিক পরিবর্তন বা চাঞ্চল্য আরও বেশী প্রকাশিত। তার উল্লেখ রয়েছে ৫ম পত্র হরদেব ঘোষালের অনুযোগের মধ্যে যে নগেন্দ্র কেন চিঠির উত্তর দেয় না।

৬ষ্ঠ পত্রে নগেন্দ্র সংক্ষেপে হরদেবকে লিখেছেন—"আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।"

৭ম পত্র সূর্যমুখীর কমলমণির কাছে আকুল প্রার্থনা—"একবার এসো !"

৮ম পত্রটিও সূর্যমুখী কমলমণিকে লিখেছে কুন্দের সংগে স্বামীর বিবাহের প্রস্তাব জানিয়ে। এই চিঠির মধ্যে সূর্যমুখীর বুকভাঙা আর্তনাদ লঘুছন্দের মাধ্যমে অত্যন্ত তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

(দ্রঃ বিষবৃক্ষ, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ)

৯ম পত্রটির উল্লেখমাত্র আছে। সেটি শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন। বিষয়—নিঃসন্দেহে বিধবা কুন্দকে বিবাহ।

১০ম পত্র নগেন্দ্রের উত্তর। এতে বিধবাবিবাহ ও কুন্দকে বিবাহের পক্ষে নগেন্দ্রনাথ যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন তা তাঁর মনোবাসনাকে বাস্তব রূপদানের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(দ্রঃ বিষবৃক্ষ, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ)

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদটির নামই 'আশীর্বাদ-পত্র'। এটি উপন্যাসের একাদশ সংখ্যক চিঠি। এই চিঠিতে কমলমণিকে সূর্যমুখী, কুন্দের সংগে নগেন্দ্রের বিবাহ ও তার গৃহত্যাগের সংকল্পের কথা জানিয়েছে। এই চিঠির মধ্যে স্বামীর প্রতি

সূর্যমুখীর ভালবাসা ও সেই ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবার বেদনা অপরূপ কাব্য-সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য—

"যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনই মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব; কেন না, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

"কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম। কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনি বধ করিলাম, সে সুখ দুই এক দিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। আর তোমাকে আর একবার দেখিয়া যাইব সাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম—তুমি অবশ্য আসিবে, জানিতাম। এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন ইহা দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

"তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে যে বলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ এই যে, তাহা হইলে তুমি আসিতে দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার সন্ধান করিও না।

"আর যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমত ভরসা নাই। কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এ দেশে আসিব না—এবং আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভিখারিণীবেশে দেশে দেশে ফিরিব—ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব—আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা কড়ি সঙ্গে লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোণা-রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?

"তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম

না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম—আবার ছিঁড়িলাম—আবার ছিঁড়িলাম—কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না। কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া, তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া আমার এ সংবাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখনও তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখনও করিব না। যাঁহাকে মনে হইলেই আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি তাহাই রহিল, যত দিন না মাটিতে এ মাটি মেশে, তত দিন থাকিবে। কেন না, তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখন ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্বত্যাগিনী হইতেছি।

"তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হইলাম, আশীর্বাদ করি, তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্বাদ করি যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ আশীর্বাদ কেহ করে নাই।"

দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদে তিনটি চিঠি আছে। প্রথমটি হরদেব ঘোষালের প্রতি নগেন্দ্র দত্তের পত্র। এই চিঠিতে নগেন্দ্রনাথের কুন্দের প্রতি মোহভঙ্গ ও সূর্যমুখীর প্রতি ভালবাসার প্রকাশ আছে। বিবাহের পনেরো দিনের মধ্যেই নগেন্দ্র বুঝতে পেরেছেন সূর্য্যমুখী সূর্য্যমুখীই, কুন্দ তার অভাব পূরণ করতে পারে না।

এই চিঠির উত্তরে হরদেব ঘোষাল দীর্ঘ পত্রের দ্বারা অত্যন্ত গভীর বিশ্লেষণের দ্বারা ভালবাসার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের ভালোবাসা রূপমোহ। কিন্তু রূপমোহও যে কালক্রমে ভালোবাসায় পরিণত হয় এ সত্য তিনি জানিয়েছেন। নগেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর যথার্থ বন্ধুজনোচিত উপদেশ।—"তুমি নিরাশ হইও না। সূর্যমুখী অবশ্য পুনরাগমন করিবেন—তোমাকে না দেখিয়া তিনি কতকাল থাকিবেন? যত দিন না আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে স্নেহ করিও। তোমার পত্রাদিতে যতদূর বুঝিয়াছি,

তাহাতে বোধ হইয়াছে, তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে, কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভালবাসেন। ভালবাসায় কখন অযত্ন করিবে না; কেন না, ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।"

এই পত্রের উত্তর নগেন্দ্রনাথ দিয়েছেন কিছুদিন পরে। কিন্তু হরদেবের উপদেশ তিনি মানতে পারেন নি, অর্থাৎ কুন্দকে আর মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি।

সর্বশেষ পত্রটি সূর্যমুখীর নির্দেশে ব্রহ্মচারীকর্তৃক লিখিত (৩৫ পরিচ্ছেদ)। এতে মধুপুর গ্রামে সঙ্কটাপন্ন সূর্যমুখীর সংবাদ দিয়ে নগেন্দ্রনাথকে সেখানে যেতে বলা হয়েছে।

শ্রীশচন্দ্রের উল্লিখিত পত্রটিকে বাদ দিলে মোট ১৪টি পত্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কাহিনীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেও অলৌকিক ঘটনা স্থান পেয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর কুন্দ পরলোকগতা জননীর জ্যোতির্ময়ী মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছে। তিনি তাকে এক 'দেবকান্ত' পুরুষ এবং 'শ্যামাঙ্গী পদ্মপলাশলোচনা যুবতী'র কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক ক'রে দিয়েছেন। এই দু'জনকে কুন্দ পরবর্তীকালে নগেন্দ্র ও হীরা ব'লে সনাক্ত করেছে। যাকে কোনদিন সে দেখেনি তার হুবহু রূপ কিভাবে তার মনে পূর্বাহ্নে জাগা সম্ভব, বঙ্কিম তার ব্যাখ্যা করেন নি। ব্রুটাসের যুদ্ধারম্ভের পূর্বে সীজারের প্রেতমূর্তি দর্শন অথবা হ্যামলেট কর্তৃক তাঁর পিতার অশরীরী মূর্তি প্রত্যক্ষ করার সংগে এর তুলনা করা চলে না। কারণ এ ক্ষেত্রে কুন্দর দেখা মূর্তি তার কাছে অদৃষ্টপূর্ব ছিল। মৃত্যুর আগে পুনরায় কুন্দ যখন তার মাতার মূর্তি দেখতে পেয়েছে তখন তাঁর কাছে সে আশ্রয় চেয়েছে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াবার জন্য। এই ঘটনাটিকে কুন্দের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপরই ছেড়ে দিতে হয়।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ঘটনাটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত, মোট ৫৬টি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে আছে ৩১টি পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ২৫টি পরিচ্ছেদ। ভ্রমরের চূড়ান্ত সর্বনাশ, অর্থাৎ গোবিন্দলালের গৃহত্যাগ এবং

রোহিণীর রূপরাশির ধ্যান প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। এখানেই ঘটনার Doing, অর্থাৎ কাজ শেষ হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় খণ্ডে শুরু হয়েছে Suffering, অর্থাৎ ফলভোগ। প্রায় কুড়ি বছরের দীর্ঘ কাহিনী উপন্যাসে বর্ণিত হওয়ায়, ঘটনায় কিঞ্চিৎ শিথিলতা এসে গেছে, কিন্তু কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনায় তার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

কৃষ্ণকান্তের উইল

কাহিনী-বর্ণনায় কিঞ্চিৎ ত্রুটিও আছে। উপন্যাসের প্রথমে কৃষ্ণকান্তের স্ত্রী, পুত্রদ্বয়—হরলাল ও বিনোদলাল, বিনোদলালের স্ত্রী ও শিশুপুত্র এবং কন্যা শৈলবতীর উল্লেখ আছে। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে বা শেষে তাদের আর কোন উল্লেখ নেই। উপন্যাসের আয়তনে তাদের সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ স্বরূপ কিছু বলার প্রয়োজন ছিল।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ কাহিনী-বর্ণনার প্রধান গুণ হল এর সরলতা। বঙ্কিম কোন আড়ম্বর না করে সোজাসুজি সরল ভাষায় বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন। তাই এর ট্র্যাজিক আবেদন সোজাসুজি এত তীক্ষ্ণভাবে পাঠকের হৃদয়ে এসে বেঁধে।

বঙ্কিমের চিরাচরিত রীতি—পাঠক-সম্বোধন ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের দ্বারা পরবর্তী ঘটনার পূর্বাভাষ সূচিত করা এ উপন্যাসেও বর্তমান। একটি ইঙ্গিতের তাৎপর্য এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। বারুণীর উদ্যানে যখন গোবিন্দলাল রোহিণীর অধরে অধর স্থাপন করে ফুঁ দিয়ে তাকে সচেতন করার চেষ্টা করছিল, তখন বঙ্কিম লিখছেন—"সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।" এর চেয়ে ভালভাবে বোধ হয় ভ্রমরের কপাল-ভাঙার ব্যঞ্জনা দেওয়া যেত না।

'রাজসিংহ' বঙ্কিমের মতে তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাই এর রচনারীতিতেও নূতনত্ব ও অনন্যতা থাকবে আশা করা যায়। সেই অনন্যতা রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে আবিষ্কার করেছেন, সেটি হল কাহিনীর গতিময়তা। এই গতির জন্য 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কাহিনী অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আবার এই গতির স্রোতে রাজসিংহের অনেককিছু অসম্পূর্ণতা চাপা পড়ে গেছে।

রাজসিংহ

'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'—বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের

রচনা। বয়সের পরিণতির সংগে সংগে রচনারীতিতেও পরিণত মনের ছাপ পড়েছে। বয়সের সংগে সংগে জীবনের মত রচনা-রীতিতেও অলংকারের আধিক্য খসেপড়ে। তাই ভাষা হয় সহজ-সরল অথচ গভীর ভাবোদ্দীপক। রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের রচনাতেও আমরা দেখেছি ঋষিসুলভ সরল অথচ গভীর বাক্যবিন্যাস।

আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম

'আনন্দমঠ'-এ সংক্ষিপ্ত বাক্যপ্রয়োগে কিভাবে ভাবগাম্ভীর্য আনা হয়েছে তার উদাহরণ হিসাবে 'উপক্রমণিকা' অংশটি পাঠ করে নিতে অনুরোধ করি। 'আনন্দমঠ'-এর গান ও সর্বোপরি 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্র এর রচনারীতিকে এক আশ্চর্য সুষমায় মণ্ডিত করেছে।

'দেবী চৌধুরাণী'তে ধর্মচেতনা প্রকাশিত হলেও কিছু ঐতিহাসিকতা ও সমাজচেতনা প্রকাশিত। তাই এর ভাষা অনেকটা গার্হস্থ্যজীবনের ধূলি-মাটি স্পর্শ করেছে। উদাহরণ হিসাবে প্রথম খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদটি আর একবার পাঠ করতে বলি।

'সীতারাম' উপন্যাসে ধর্মতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক চেতনার অতিরেক কাহিনীতে আবার কিছু জটিলতা এনেছে। তাই ভাষা সর্বাংশে সরল নয়।

বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে ভাষা ও রীতি সম্বল ক'রে যাত্রা করেছিলেন, 'সীতারাম'-এ এসে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অবশ্য এই ক্রমবিকাশের স্তর ঠিক ক্রমপর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু পরিবর্তন যে ঘটেছে তা উপলব্ধির জন্য আমরা কয়েকটি বিষয় ক্রম-পর্যায়ে সাজিয়ে দিলাম।

প্রথমেই বিভিন্ন উপন্যাসের কাহিনীর সূচনাংশটি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

(১) ৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল-গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীল-নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার

দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।"

(দুর্গেশনন্দিনী)

(২) "প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল, কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্-নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ, এই দুই জন মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতে-ছিলেন। বারেক কথাবার্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কত দূর যেতে পারিব?" মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।" (কপালকুণ্ডলা)।

(৩) "একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব প্রাবৃট্‌দিনান্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃট্‌কাল, কিন্তু মেঘ নাই, অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ পশ্চিম গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্যদেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গা যমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন দুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমালা পবনতাড়িত হইয়া কূলে প্রতি-ঘাত করিতেছিল।" (মৃণালিনী)।

(৪) "নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, তুফানের সময়; ভার্য্যা সূর্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, দেখিও নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না। নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন, নহিলে সূর্যমুখী ছাড়িয়া দেন না। কলিকাতা না গেলেও নহে, অনেক কাজ ছিল।" (বিষবৃক্ষ)।

(৫) "অনেক দিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্যন্ত শ্বশুরঘর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, শ্বশুর দরিদ্র।" (ইন্দিরা)।

(৬) "দুই জনে উদ্যানমধ্যে লতামণ্ডপতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন প্রাচীন নগর তাম্রলিপ্তের চরণ ধৌত করিয়া অনন্ত নীল সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ করিতেছিল।" (যুগলাঙ্গুরীয়)।

(৭) "ভাগীরথীতীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ নদী বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম প্রতাপ—বালিকার শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন সাত আট বৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোর বয়স্ক।" (চন্দ্রশেখর)।

(৮) "রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভাল ছিল—বড়মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়; সর্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি; ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, প্রিবিকৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।" (রাধারাণী)।

(৯) "তোমাদের সুখদুঃখ আমার সুখদুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আমি ভিন্নপ্রকৃতি। আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না—আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না—আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব; আর ষোলকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যস্থ হইয়া বিকশিত হইলেও আমি সুখী হইব না—আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয় শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।" (রজনী)।

(১০) "হরিদ্রাগ্রামে এক ঘর বড় জমীদার ছিলেন। জমীদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী; তাঁহার জমীদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া ধনোপার্জন করেন। উভয় ভ্রাতার পরম সম্প্রীতি

ছিল, একের মনে এমত সন্দেহ কস্মিন্ কালে জন্মে নাই যে, তিনি অপর কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমীদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল—তাহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি, রামকান্ত রায়ের মনে মনে সংকল্প হইল যে, উভয়ের উপার্জিত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়া কর্তব্য। কেন না, যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে, কৃষ্ণকান্ত কখনও প্রবঞ্চনা অথবা তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার সম্ভাবনা নাই, তথাপি কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে, তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না—আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজনবশতঃ তালুকে গেলেন সেইখানে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।" (কৃষ্ণকান্তের উইল)।

(১১) "রাজস্থানের পার্বত্যপ্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই—রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ। বিক্রমসিংহের আরও সবিশেষ পরিচয় পশ্চাৎ দিতে হইবে।" (রাজসিংহ)।

(১২) "অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোক-প্রবেশের পথমাত্রশূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে অন্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।" (আনন্দমঠ)।

(১৩) "ও পি—ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী।"

"যাই মা।"

মা ডাকিল—মেয়ে কাছে আসিল। বলিল, "কেন মা?"

মা বলিল, "যা না—ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে নিয়ে আয় না।"

প্রফুল্লমুখী বলিল, "আমি পারিব না। আমার চাইতে লজ্জা করে।"

(দেবী চৌধুরাণী)।

১৪) "পূর্বকালে, পূর্ববাঙ্গালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। এখন উহার নাম "ভুষ্‌নো"। যখন কলিকাতা নামে ক্ষুদ্র গ্রামের কুটীরবাসিরা বাঘের ভয়ে রাত্রে বাহির হইতে পারিত না, তখন সেই ভূষণায় একজন ফৌজদার বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গবর্ণর ছিলেন; এখানকার স্থানীয় গবর্ণর অপেক্ষা তাঁদের বেতন অনেক বেশী ছিল। সুতরাং ভূষণা স্থানীয় রাজধানী ছিল।"

(সীতারাম)।

এবার বিভিন্ন উপন্যাসের কাহিনীর সমাপ্তি অংশটুকু ক্রমপর্যায়ে অনুধাবন করা যেতে পারে।

(১) "আয়েষা বাতায়নে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একবার মনে করিতেছিলেন, "এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি।" আবার ভাবিতেছিলেন, "এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন?"

আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন। আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন, "এ লোভ সংবরণ করা রমণীর অসাধ্য; প্রলোভনকে দূর করাই ভাল!"

এই বলিয়া আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।"

(দুর্গেশনন্দিনী)।

২) "না—মৃন্ময়ি!—না!—"এইরূপ উচ্চ শব্দ করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না। চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটধোভাগে প্রহত হইল; অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলাসহিত ঘোর রবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।

সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?" (কপালকুণ্ডলা)

(৩) "শান্তশীল যখন দেখিল যে, হিন্দুর আর রাজ্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন সে আপন চতুরতা ও কর্মদক্ষতা দেখাইয়া যবনদিগের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা শীঘ্রই সে মনস্কাম সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইল।" (মৃণালিনী)

(৪) দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর, কত দিন তাহার উদ্যানমধ্যে নিশীথ সময়ে রক্ষকে ভীতচিত্তে শুনিয়াছে যে, স্ত্রীলোক গায়িতেছে—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।" (বিষবৃক্ষ)

(৫) "গৃহিণী ও রামরাম দত্ত অনেক দিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু আর যাওয়া ঘটে নাই। আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই। ইহজন্মে ভুলিব না। সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।" (ইন্দিরা)

(৬) "পুরন্দর কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেমন আমার চিরকালের মনোরথ পূর্ণ করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন। অদ্য আমি যেমন সুখী হইলাম, এমন সুখী কেহ আপনার রাজ্যে কখন বাস করে নাই।" (যুগলাঙ্গুরীয়)

(৭) "তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও! যেখানে, রূপ অনন্ত প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না!" (চন্দ্রশেখর)

(৮) "এই বলিয়া রাধারাণী যে হীরকহার রুক্মিণীকুমারকে পরাইতে গিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন।

তার পর শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ হইয়া গেল।" (রাধারাণী)

(৯) "আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে এটি?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "আমার ছেলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার নাম কি রাখিয়াছেন ?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "অমরপ্রসাদ।"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।" (রজনী)

(১০) "শচীকান্ত বিনীতভাবে বলিলেন, "সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায় ?" গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার এ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি –তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।" (কৃষ্ণকান্তের উইল)

(১১) "ঔরঙ্গজেবের উত্তম ঐতিহাসিক তুলনার স্থল স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ। উভয়েই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি; উভয়েই ঐশ্বর্য্যে, সেনাবলে, গৌরবে আর সকল রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উভয়েই শ্রমশীলতা, সতর্কতা প্রভৃতি রাজকীয় গুণে বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু উভয়েই নিষ্ঠুর, কপটাচারী, ক্রূর, দাম্ভিক, আত্মমাত্রহিতৈষী এবং প্রজাপীড়ক। এজন্য উভয়েই আপন আপন সাম্রাজ্য-ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। উভয়েই ক্ষুদ্র শত্রু দ্বারা পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন;—ফিলিপ ইংরেজ (তখন ক্ষুদ্রজাতি) ও ওলন্দাজের দ্বারা, ঔরঙ্গজেব মারহাট্টা ও রাজপুতের দ্বারা। মারহাট্টা শিবাজী ও ইংলণ্ডের তৎকালিক নেত্রী এলিজাবেথ পরস্পর তুলনীয়। কিন্তু তদপেক্ষা ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয়। উভয়ের কীর্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে দেশহিতৈষী ধর্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন—এ দেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।" (রাজসিংহ)

(১২) "এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্তি শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছে। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন।

বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।" (আনন্দমঠ)

(১৩) এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(দেবী চৌধুরাণী)

(১৪) "রাম। তুমিও যেমন! ও সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাস মাত্র।

শ্যাম। তা এটা উপন্যাস, না ওটা উপন্যাস, তার ঠিক কি? ওটা না হয় মুসলমানের রচা। তা যাক্ গিয়ে—আমরা আদাব ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এসেছি, এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক ঢালিয়া সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি।" (সীতারাম)

বঙ্কিম-উপন্যাসে নায়িকা প্রতিনায়িকার রূপবর্ণনা একটি বিশেষ পরিচিত বিষয়। উপন্যাসের সেই প্রাথমিক যুগে এইজাতীয় রূপবর্ণনার একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল। সবসময় রূপ যে বাহ্যিক বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, এমন নয়। অনেকক্ষেত্রে এই রূপবর্ণনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটিকেও ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আমরা পর-পর বঙ্কিম-উপন্যাসের কিছু নায়িকা বা প্রতিনায়িকার রূপের ডালি সাজিয়ে দিলাম, পাঠকগণ এ থেকে হয়তো নতুন কিছু চিন্তার খোরাক পাবেন।

(১) "তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহায়তন প্রগল্ভবয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতিপ্রশস্তও নহে, নিশীথ-কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাব-প্রকাশক; তৎপার্শ্বে অতি নিবিড়-বর্ণ কুঞ্চিতালক সকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড়-বর্ণ, চিত্রকর-লিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার; আর এক সূতা স্থূল হইলে নির্দোষ

হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস ? তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরঞ্জিনী হইতে পারিবে না। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত ; তাহাতে "বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ-চকিত" কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না। চক্ষু দুটি অতি প্রশস্ত, অতি সুঠাম, অতি শান্তজ্যোতিঃ আর চক্ষুর বর্ণ, উষা কালে সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে, চন্দ্রাস্তের সময়ে আকাশের যে কোমল নীলবর্ণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ ; সেই প্রশস্ত পরিষ্কার চক্ষে যখন তিলোত্তমা দৃষ্টি করিতেন, তখন তাহাতে কিছুমাত্র কুটিলতা থাকিত না ; তিলোত্তমা অপাঙ্গে অর্দ্ধদৃষ্টি করিতে জানিতেন না, দৃষ্টিতে কেবল স্পষ্টতা আর সরলতা ; দৃষ্টির সরলতাও বটে, মনের সরলতাও বটে ; তবে যদি তাঁহার পানে কেহ চাহিয়া দেখিত, তবে তৎক্ষণাৎ কোমল পল্লব দুখানি পড়িয়া যাইত ; তিলোত্তমা তখন ধরাতল ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টি করিতেন না। ওষ্ঠাধর দুখানি গোলাবী, রসে টলমল করিত ; ছোট ছোট, একটু ঘুরান, একটু ফুলান, একটু গলি হাসি, সে ওষ্ঠাধরে যদি একবার হাসি দেখিতে, তবে যোগী হও, মুনি হও, যুবা হও, বৃদ্ধ হও, আর ভুলিতে পারিতে না। অথচ সে হাসিতে সরলতা ও বালিকাভাব ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

তিলোত্তমার শরীর সুগঠন হইয়াও পূর্ণায়ত ছিল না ; বয়সের নবীনতা প্রযুক্তই হউক বা শরীরের স্বাভাবিক গঠনের জন্যই হউক, এই সুন্দর দেহে ক্ষীণতা ব্যতীত স্থূলতাগুণ ছিল না। অথচ তন্বীর শরীর মধ্যে সকল স্থানই সুগোল আর সুললিত। সুগোল প্রকোষ্ঠে রত্নবলয় ; সুগোল বাহুতে হীরকমণ্ডিত তাড় , সুগোল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ; সুগোল ঊরুতে মেখলা ; সুগঠন অংসোপরে স্বর্ণহার, সুগঠন কণ্ঠে রত্নকণ্ঠী , সর্বত্রের গঠন সুন্দর।" (তিলোত্তমা)

(২) "আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবেক। আয়েষা দেখিতে পরমা সুন্দরী, কিন্তু সে রীতির সৌন্দর্য্য দুই চারি শব্দে সেরূপ প্রকটিত করা দুঃসাধ্য। তিলোত্তমাও পরম রূপবতী, কিন্তু আয়েষার সৌন্দর্য্য সে রীতির নহে , স্থিরযৌবনা বিমলারও এ কাল পর্যান্ত রূপের ছটা লোক-মনোমোহিনী ছিল , আয়েষার রূপরাশি তদনুরূপও নহে। কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায় ; নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায় ; নির্বাণ মুদিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকসিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য নব-রবিকর-ফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়; সুবিকাশিত সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত ;

না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক ; কোমল, অথচ প্রোজ্জল ; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না। পাঠক মহাশয়, "রূপের আলো" কখন দেখিয়াছেন ? না দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকিবেন। অনেক সুন্দরী রূপে "দশ দিক্ আলো" করে। শুনা যায়, অনেকের পুত্রবধূ "ঘর আলো" করিয়া থাকেন। ব্রজধামে আর নিশুম্ভের যুদ্ধে কালো রূপেও আলো হইয়াছিল। বস্তুতঃ পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন, "রূপের আলো" কাহাকে বলে ? বিমলা রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের আলোর মত ; একটু একটু মিট্‌মিটে, তেল চাই, নহিলে জ্বলেনা ; গৃহকার্য্যে চলে ; নিয়ে ঘর কর, ভাত রান্ধ, বিছানা পাড়, সব চলিবে, কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন—সে বালেন্দু-জ্যোতির ন্যায় ; সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল ; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য্য হয় না, তত প্রখর নয়, এবং দূরনিঃসৃত। আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্বাহ্নিক সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ; প্রদীপ্ত, প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে।

যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আয়েষা ; এজন্য তাঁহার অবয়ব পাঠক মহাশয়ের ধ্যান-প্রাপ্য করিতে চাহি। যদি চিত্রকর হইতাম, যদি এইখানে তুলি ধরিতে পারিতাম, যদি সে বর্ণ ফলাইতে পারিতাম ; না চম্পক, না রক্ত, না শ্বেতপদ্মকোরক, অথচ তিনই মিশ্রিত, এমত বর্ণ ফলাইতে পারিতাম ; যদি সে কপাল তেমনই নিটোল করিয়া আঁকিতে পারিতাম ; নিটোল অথচ বিস্তীর্ণ, মন্মথের রঙ্গভূমি—স্বরূপ করিয়া লিখিতে পারিতাম ; তাহার উপরে তেমনই সুবঙ্কিম কেশের সীমারেখা দিতে পারিতাম ; সে রেখা তেমনই পরিষ্কার, তেমনি কপালের গোলাকৃতির অনুগামিনী করিয়া আকর্ণ টানিতে পারিতাম ; কর্ণের উপরে সে রেখা তেমনই করিয়া ঘুরাইয়া দিতে পারিতাম ; যদি তেমনই কালো রেশমের মত কেশগুলি লিখিতে পারিতাম ; কেশমধ্যে তেমনই করিয়া কপাল হইতে সিঁথি কাটিয়া দিতে পারিতাম—তেমনই পরিষ্কার, তেমনই সূক্ষ্ম, যদি তেমনই করিয়া কেশ রঞ্জিত করিয়া দিতে পারিতাম ; যদি তেমনই করিয়া লোল কবরী বাঁধিয়া দিতে পারিতাম ; যদি সে অতি নিবিড় ভ্রূযুগ আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম ; প্রথমে যথায় দুটি ভ্রূ পরস্পর সংযোগাশয়ী হইয়াও মিলিত হয় নাই, তথা হইতে যেখানে যেমন বর্দ্ধিতায়তন হইয়া মধ্যস্থলে না আসিতে আসিতেই যেরূপ স্থূলরেখ হইয়াছিল, পরে আবার যেন ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মাকারে কেশবিন্যাসরেখার নিকটে গিয়া সূচ্যগ্রবৎ সমাপ্ত

হইয়াছিল, তাহা যদি দেখাইতে পারিতাম; যদি সেই বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ মেঘবৎ, চঞ্চল, কোমল, চক্ষুঃপল্লব লিখিতে পারিতাম; যদি সে নয়নযুগলের বিস্তৃত আয়তন লিখিতে পারিতাম; তাহার উপরিপল্লব ও অধঃপল্লবের সুন্দর বঙ্ক ভঙ্গী, সে চক্ষুর নীলালক্তকপ্রভা, তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ স্থূল তারা লিখিতে পারিতাম; যদি সে গর্ববিস্ফারিত রন্ধ্রসমেত সুনাসা, সে রসময় ওষ্ঠাধর, সে কবরীস্পৃষ্ট প্রস্তরশ্বেত গ্রীবা, সে কর্ণাভরণস্পর্শপ্রার্থী পীবরাংস, সে স্থূল কোমল রত্নালঙ্কারখচিত বাহু, যে অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয় হীনভাস হইয়াছে, সে অঙ্গুলি, সে পদ্মারক্ত, কোমল করপল্লব, সে মুক্তাহার-প্রভানিন্দী পীবরোন্নত বক্ষঃ, সে ঈষদ্দীর্ঘ বপুর মনোমোহন ভঙ্গী, যদি সকলই লিখিতে পারিতাম, তথাপি তুলি স্পর্শ করিতাম না। আয়েষার সৌন্দর্য্যসার, সে সমুদ্রের কৌস্তুভরত্ন, তাহার ধীর কটাক্ষ! সন্ধ্যাসমীরণকম্পিত নীলোৎপলতুল্য ধীর মধুর কটাক্ষ! কি প্রকারে লিখিব?" (আয়েষা)

(৩) "...অপূর্ব মূর্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি! কেশভার—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না, অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাঁহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।" (কপালকুণ্ডলা)

(৪) "যদি এই রমণী নির্দোষ সৌন্দর্যবিশিষ্টা হইতেন, তবে বলিতাম, "পুরুষ পাঠক! ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠকারিণি! ইনি আপনার দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় রূপবতী।" তাহা হইলে রূপবর্ণনার একশেষ হইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সর্বাঙ্গসুন্দরী নহেন, সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল।

ইনি যে নির্দোষ সুন্দরী নহেন, তাহা বলিবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ ইঁহার শরীর মধ্যমাকৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ; দ্বিতীয়তঃ অধরোষ্ঠ কিছু চাপা; তৃতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে ইনি গৌরাঙ্গী নহেন।

শরীর ঈষদ্দীর্ঘ বটে, কিন্তু হস্তপদ হৃদয়াদি সর্বাঙ্গ সুগোল, সম্পূর্ণীভূত। বর্ষাকালে বিটপীলতা যেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইঁহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল; সুতরাং ঈষদ্দীর্ঘ দেহও পূর্ণতাহেতু অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্রকৌমুদীর ন্যায়, কাহারও কাহারও ঈষদারক্তবদনা উষার ন্যায়। ইঁহার বর্ণ এতদুভয়বর্জিত, সুতরাং ইঁহাকে প্রকৃত গৌরাঙ্গী বলিলাম না বটে, কিন্তু মুগ্ধকরী শক্তিতে ইঁহার বর্ণও ন্যূন নহে। ইনি শ্যামবর্ণা। "শ্যামা মা" বা "শ্যামসুন্দর" যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে। তপ্ত কাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম। পূর্ণচন্দ্রকরলেখা, অথবা হেমাম্বুদকিরীটিনী উষা, যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণপ্রতিমা হয়, তবে বসন্তপ্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গীর বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কিন্তু যদি কেহ এরূপ শ্যামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন, তবে তাঁহাকে বর্ণজ্ঞানশূন্য বলিতে পারিব না। এ কথায় যাঁহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচূতপল্লববিরাজী ভ্রমরশ্রেণীর তুল্য সেই উজ্জ্বলশ্যামললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন; সেই সপ্তমীচন্দ্রাকৃতি-ললাটতলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ মনে করুন; সেই পক্বচূতোজ্জ্বল কপোলদেশ মনে করুন; তন্মধ্যবর্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন, তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া অনুভব হইবে। চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে, কিন্তু সুবঙ্কিম পল্লবরেখাবিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়, চক্ষু সুকোমল স্নেহময় রসে গলিয়া যায়। আবার কখনও বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তিপ্রকাশ মাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখনও বা লালসাবিস্ফরিত, মদনরসে টলটলায়মান। আবার কখনও লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম। মুখকান্তিমধ্যে দুইটি অনির্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা

বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, তিনি রমণী কুলরাজ্ঞী।

সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর—ভাদ্র মাসের ভরা নদী। ভাদ্র মাসের নদীজলের ন্যায়, ইহার রূপরাশি টলটল করিতেছিল—উছলিয়া পড়িতেছিল। বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্য্যের পরিপ্লব মুগ্ধকর। পূর্ণযৌবনভরে সর্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল; বিনা বায়ুতে শরতের নদী যেমন ঈষচ্চঞ্চল, তেমনি চঞ্চল; সে চাঞ্চল্য মুহুর্মুহুঃ নূতন নূতন শোভাবিকাশের কারণ।' (মতিবিবি)

'মৃণালিনী' উপন্যাসে মৃণালিনীর কোন রূপবর্ণনা নেই, কিন্তু মনোরমার রূপবর্ণনা এরূপ –

(৫) "মনোরমা নিতান্ত খর্বাকৃতি নহে তবে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, তাহার হেতু এই যে, মুখকান্তি অনির্বচনীয় কোমল, অনির্বচনীয় মধুর, নিতান্ত বালিকা বয়সের ঔদার্য্যবিশিষ্ট; সুতরাং হেমচন্দ্র যে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় হয় নাই। মনোরমার বয়ক্রম যথার্থ পঞ্চদশ, কি ষোড়শ, কি তদধিক কি তনূন, তাহা ইতিহাসে লেখে না, পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।

মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাঁহার রূপরাশি অতুল—চক্ষুতে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, সর্বকালে সে রূপরাশি দুর্লভ। একে বর্ণ সোনার চাঁপা, তাহাতে ভুজঙ্গশিশুশ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে; এক্ষণে বাপীজলসিঞ্চনে সে কেশ ঋজু হইয়াছে; অর্ধচন্দ্রাকৃত নির্মল ললাট, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল, লোচনযুগল; মুহুর্মুহু আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত সুগঠন নাসা; অধরোষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত প্রাতঃসূর্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন রক্তকুসুমাবলীর স্তরযুগল তুল্য; কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জ্বল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাম্বুবিস্তারবৎ প্রসন্ন; শাবকহিংসাশঙ্কায় উত্তেজিতা হংসীর ন্যায় গ্রীবা—বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার উপরে আবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশসকল আসিয়া কেলি করে। দ্বিরদ-রদ যদি কুসুম-কোমল হইত, কিম্বা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিম্বা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত,—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ সকলই অন্য সুন্দরীর আছে। মনোরমার রূপরাশি অতুল কেবল তাঁহার সর্বাঙ্গীণ সৌকুমার্য্যের জন্য।

তাঁহার বদন সুকুমার ; অধর, ভ্রূযুগ, ললাট সুকুমার ; সুকুমার কপোল ; সুকুমার কেশ। অলকাবলী যে ভুজঙ্গশিশুরূপী সেও সুকুমার ভুজঙ্গশিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে, সৌকুমার্য্য ; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে, সৌকুমার্য্য ; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই সৌকুমার্য্য ; সুকুমার চরণ, চরণবিন্যাস সুকুমার। গমন সুকুমার ; বসন্তবায়ুসঞ্চালিত কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য ; বচন সুকুমার, নিশীথসময়ে জলরাশিপার হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুল্য ; কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্র জন্য মেঘমালামুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্য ; আর ঐ যে মনোরমা দেবীগৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন,—পশুপতির মুখাবলোকন জন্য উন্নতমুখী, নয়নতারা ঊর্দ্ধস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্দ্র, আবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ এক হস্তে ধরিয়া, এক চরণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্ত্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছেন, ও ভঙ্গীও সুকুমার ; নবীন সূর্য্যোদয়ে সদ্যঃ প্রফুল্লদলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার। সেই মাধুর্য্যময় দেহের উপর দেবীপার্শ্বস্থিত রত্নদীপের আলোক পতিত হইল।" (মনোরমা)

(৬) কুন্দের রূপবর্ণনা করা হয়েছে নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে। নগেন্দ্রনাথ বন্ধু হরদেব ঘোষালকে পত্রের মাধ্যমে কুন্দের নিম্নলিখিত রূপবর্ণনা করেছেন—

"বল দেখি, কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী ? তুমি বলিবে, চল্লিশ পরে, কেন না, তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই এক বৎসর হইয়াছে। কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম—তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সরলতা চমৎকার ; সে কিছুই বুঝে না। আজিও রাস্তার বালকদিগের সহিত খেলা করিতে ছুটে ; আবার বারণ করিলেই ভীতা হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হয়। কমল তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখাপড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি শরতের পদ্মের মত সর্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে ; কিছু বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। তুমি আমার মতিস্থৈর্য্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে, বিশেষ তুমি বাতিকের গুণে গাছ কয় চুল পাকাইয়া ব্যঙ্গ করিবার পরওয়ানা হাসিল করিয়াছ ; কিন্তু যদি তোমাকে সেই দুইটি চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারি, তবে তোমারও মতি-

স্থৈর্য্যের পরিচয় পাই। চক্ষু দুইটি যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার এক রকম দেখিলাম না; আমার বোধ হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোখ নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না; অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত মাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটি, তাহার সর্বাঙ্গীণ শান্তভাবব্যক্তি—যদি, স্বচ্ছ সরোবরে শরৎচন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে ভাবব্যক্তি, তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।"

(কুন্দ)

সূর্যমুখীর সেরকম কোন রূপবর্ণনা নেই। ইন্দিরা, হিরণ্ময়ী (যুগলাঙ্গুরীয়), শৈবলিনী, রাধারাণী ও রজনীর স্বতন্ত্রভাবে রূপ বর্ণনা করা হয় নি।

(৭) "এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে। অতএব তাহার রূপ গুণ কিছু বলিতে হয়, কিন্তু আজি কালি রূপ বর্ণনার বাজার নরম—আর গুণ বর্ণনার—হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই। তবে ইহা বলিলে হয় যে, রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এ দিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয়, ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলেপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন।"

(রোহিণী)

ভ্রমরের রূপবর্ণনা না থাকলেও সে যে কালো একথা বলা হয়েছে।

(৮) চঞ্চলকুমারীর রূপদর্শনে বৃদ্ধা চিত্রবিক্রেত্রী কিভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র—

"বৃদ্ধা অনিমেষলোচনে সেই সর্বশোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্মিতপ্রায় প্রতিমা

পানে চাহিয়া রহিল—কি সুন্দর! বুড়ী বয়োদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে পায় না—তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ ত প্রস্তরের বর্ণ নহে; নির্জীবের এমন সুন্দর বর্ণ হয় না। পাথর দূরে থাকুক, কুসুমেও এ চারুবর্ণ পাওয়া যায় না। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল যে, প্রতিমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। পুতুল কি হাসে! বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ বুঝি পুতুল নয়—ঐ অতিদীর্ঘ কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।" (চঞ্চলকুমারী)

(৯) "সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিকবয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিন, গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন, গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোন গাছের কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল; বোধ হইল যেন, কোথায় গোলাপজলের কার্বা মুখ আঁটা ছিল, কে কার্বা ভাঙিয়া ফেলিল। যেন কে প্রায় নিবান আগুনে ধূপ-ধূনা গুগ্গুল ফেলিয়া দিল।" (শান্তি)

(১০) দুখিনী প্রফুল্লের রূপবর্ণনার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নি বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু দেবীচৌধুরাণীর রূপের বর্ণনা না দিলে নয়। তাই তিনি লিখেছেন—

"ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি দুই আঙ্গুল পুরু—বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার উপর বসিয়া একজন স্ত্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স যাই হউক—সে স্ত্রীলোক পরম সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে—অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্বত্র ষোল কলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পুরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পুরিয়াছে। তার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন-বর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পুরিয়া টলটল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে; নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী।

সেই নদীর মত, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত মর্য্যাদা নাই—কিন্তু এক শত বৎসর আগে কাপড়ও ভাল হইত; উপযুক্ত মর্য্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরা-মুক্তা-খচিত থাকিত কাঁচলি ঝকমক্ করিতেছে। হীরা, পান্না, মতি, সোণায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত; জ্যোস্নার আলোকে বড় ঝকমক্ করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির নদীজলের মত—সেই শুভ্র বসন; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি চিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে। কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে, তাহার সুগন্ধি-চূর্ণ-গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে। এক ছড়া যূঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে।"

(প্রফুল্ল)

(১১) শ্রী সুন্দরী হলেও সীতারামের চোখে প্রথমে তা ধরা পড়েনি। কারণ—"সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয় দিন দেখা—সে দেখাই নয়—শ্রী তখন বড় বালিকা। তার পর সীতারাম ক্রমশঃ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি শ্রীর খেদ মিটে নাই—তাই তাঁর পিতা আবার হিমরাশিপ্রতিফলিত কৌমুদী-রূপিণী রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। আজ একজন বসন্তনিকুঞ্জ প্রহ্লাদিনী অপূর্ণা কল্লোলিনী; আর একজন বর্ষা বারিরাশিপ্রমথিতা পরিপূর্ণা স্রোতস্বতী। দুই স্রোতে শ্রী ভাসিয়া গেল। তার পর আর শ্রীর কোন খবর নাই।"

পাঠক-সম্বোধন বঙ্কিম-উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি উপন্যাসের পাঠক-সম্বোধন পরপর সাজিয়ে দেওয়া গেল, বৈচিত্র্য অনুসন্ধানের আশায়।

(১) "তিলোত্তমা সুন্দরী। পাঠক! কখন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা, কোমল-প্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন?"

(দুর্গেশনন্দিনী ১/৭)

(২) "পুরুষ পাঠক! ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠকারিণি! ইনি আপনার দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় রূপবতী।"

(কপালকুণ্ডলা ২/২)

(৩) "পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু এত দূরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। এত দূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।" (বিষবৃক্ষ, ৮ম পরি.)

(৪) "এখন হইতে এই ইতিবৃত্তমধ্যে পাঁচ শত বার আমার স্বামীর নাম করা আবশ্যক হইবে। এখন, তোমরা পাঁচ জন রসিকা মেয়ে একত্র কমিটীতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া বলিয়া দাও, আমি কোন্ শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার নাম করিব? পাঁচ শত বার "স্বামী" "স্বামী" করিয়া কাণ জ্বালাইয়া দিব? না জামাই বারিকের দৃষ্টান্তানুসারে স্বামীকে "উপেন্দ্র" বলিতে আরম্ভ করিব? না, "প্রাণনাথ" "প্রাণকান্ত" "প্রাণেশ্বর" "প্রাণপতি" এবং "প্রাণাধিকে"র ছড়াছড়ি করিব? যিনি আমাদিগের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সম্বোধনের পাত্র, যাঁহাকে পলকে পলকে ডাকিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাকে যে কি বলিয়া ডাকিব, এমন কথা পোড়া দেশের ভাষায় নাই। আমার এক সখী, (দাসদাসীগণের অনুকরণ করিয়া) স্বামীকে "বাবু" বলিয়া ডাকিত—কিন্তু শুধু বাবু বলিতে তাহার মিষ্ট লাগিল না—সে মনোদুঃখে স্বামীকে শেষে "বাবুরাম" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। আমারও ইচ্ছা করিতেছে, আমি তাই করি।" ইন্দিরা/দ্বাদশ পরিঃ)

(৫) "হাঁ গা, এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা? যাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, প্রাণেশ্বর! দুঃখিনীর সর্বস্ব! চিরবাঞ্ছিত! বলিয়া যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে; আবার যাকে সেই সঙ্গে "হাঁ গা, সেই রাধারাণী পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা" বলিয়া তামাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে—তার সঙ্গে আপনি, মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই সকল কথা নিয়ে কি কথা কহা যায় গা? তোমরা পাঁচ জন রসিকা, প্রেমিকা, বাক্‌চতুরা, বয়োধিকা ইত্যাদি ইত্যাদি আছ, তোমরা পাঁচ জন বল দেখি, ছেলেমানুষ রাধারাণী কেমন করে এমন করে কথা কয় গা?" (রাধারাণী/৫ম পরিচ্ছেদ)

বঙ্কিম-উপন্যাসে বেশ কিছু সংক্ষিপ্ত ও সফল বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাক্যগুলির দ্বারা গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে।

বর্ণনারীতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণনার বিষয় অনুসারে ভাষাও ভিন্নতর। কিন্তু আমরা অধিকাংশ উপন্যাসেই নদী বা জল সম্পর্কিত বর্ণনার পরিচয় পাই। প্রায় একই বিষয় নিয়ে বর্ণনা

কিভাবে বৈচিত্র্য আনয়ন করে'ছে, তা উপলব্ধি করার জন্য আমরা এই জাতীয় বর্ণনা সাজিয়ে দিলাম।

(১) "দুর্গের যে ভাগে দুর্গমূল বিধৌত করিয়া আমোদর নদী কলকল রবে প্রবহণ করে, সেই অংশে এক কক্ষবাতায়নে বসিয়া তিলোত্তমা নদীজলাবর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সায়াহ্নকাল উপস্থিত, পশ্চিমগগনে অস্তাচলগত দিনমণির ম্লান কিরণে যে সকল মেঘ কাঞ্চনকান্তি ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত নীলাম্বর প্রতিবিম্ব স্রোতস্বতীজলমধ্যে কম্পিত হইতেছিল; নদীপারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবর সকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল; দুর্গমধ্যে ময়ূর সারসাদি কলনাদি পক্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে রব করিতেছিল; কোথাও রজনীর উদয়ে নীড়ান্বেষণে ব্যস্ত বিহঙ্গম নীলাম্বরতলে বিনা শব্দে উড়িতেছিল; আম্রকানন দোলাইয়া আমোদর-স্পর্শ-শীতল নৈদাঘ বায়ু তিলোত্তমার অলককুন্তল অথবা অংসারূঢ় কম্পিত করিতেছিল।" (দুর্গেশনন্দিনী ১/৭)

(২) "ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যত দূর চক্ষু যায়, তত দূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদাম গ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিকজাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।" (কপালকুণ্ডলা ১/৫)

(৩) "সান্ধ্য গগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল। সভামণ্ডলে পরিচারকহস্তজ্বালিত দীপমালার ন্যায়, অথবা প্রভাতে উদ্যানকুসুমসমূহের ন্যায়, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণী-

হৃদয়ে নায়কসংস্পর্শজনিত প্রকম্পের ন্যায়, নদীবক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। কূলে তরঙ্গাভিঘাতজনিত ফেনপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বহু লোকের কোলাহলের ন্যায় বীচিরব উত্থিত হইল। নাবিকেরা নৌকাসকল তীরলগ্ন করিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একখানি ছোট ডিঙ্গি অন্য নৌকা হইতে পৃথক্ এক খালের মুখে লাগিল। নাবিকেরা আহারাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল।' (মৃণালিনী ২/৩)

(৪) "...নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজ্জা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘসিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন—মধ্যবয়স্কারা শিবপূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক-বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদ্রিতনয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালমানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠ-নিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে শাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া, রাজমন্ত্রীর মত চারি দিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া

বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে,—পরের প্রয়োজনে।"

(বিষবৃক্ষ—১ম পরিচ্ছেদ)।

(৫) "আমি গঙ্গা কখনও দেখি নাই। এখন গঙ্গা দেখিয়া, আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল। আমার এত দুঃখ, মুহূর্তজন্য সব ভুলিলাম। গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়। তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ—ছোট ঢেউর উপর রৌদ্রের চিকিমিকি —যত দূর চক্ষু যায়, ততদূর জল জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়াছে—তীরে কুঞ্জের মত সাজান বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী; জলে কত রকমের কত নৌকা; জলের উপর দাঁড়ের শব্দ, দাঁড়ি-মাঝির শব্দ, জলের উপর কোলাহল, তীরে ঘাটে ঘাটে কোলাহল; কত রকমের লোক, কত রকমে স্নান করিতেছে। আবার কোথাও সাদা মেঘের মত অসীম সৈকত ভূমি—তা'তে কত প্রকারের পক্ষী কত শব্দ করিতেছে। গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী। অতৃপ্ত নয়নে কয়দিন দেখিতে দেখিতে আসিলাম।" (ইন্দিরা—৫ম পরিচ্ছেদ)।

(৬) "হিরণ্ময়ী বিমনা হইলেন। কোন কথা কহিলেন না, অনিমেষ-লোচনে সম্মুখবর্তী সাগরতরঙ্গে সূর্যকিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃ-কাল, মৃদুপবন বহিতেছে,—মৃদুপবনোত্থিত অতুঙ্গ তরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—সাগরজলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে। হিরণ্ময়ী সব দেখিলেন,—নীলজল দেখিলেন, তরঙ্গশিরে ফেনমালা দেখিলেন, সূর্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন,—দূরবর্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কৃষ্ণবিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন।"

(যুগলাঙ্গুরীয়—১ম পরিচ্ছেদ ।

(৭) "ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারি ধারে ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কাল জলে পড়িয়াছে; কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে, তালগাছের কাল ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। একটি ঘাটের পাশে, কয়েকটি লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতায় লতায় একত্র গ্রথিত হইয়া, জল পর্যন্ত শাখা লম্বিত করিয়া দিয়া, জলবিহারিণী কুলকামিনীগণকে আবৃত করিয়া রাখিত। সেই আবৃত অল্পান্ধকারমধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী ধাতুকলসীহস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না, আমরা জল নই।

যিনি কখন রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন, তিনিই বলিতে পারিবেন, কেমন করিয়া জল কলসীতাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া, বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার শিঞ্জিতের তালে, তালে তালে নাচে। হৃদয়োপরে গ্রথিত জলজপুষ্পের মালা দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। সন্তরণকুতূহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমটিকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি মারিয়া, জল তরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে। আবার যুবতী কেমন কলসী ভাসাইয়া দিয়া, মৃদুবায়ুর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া, চিবুক পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া, বিম্বাধরে জলস্পৃষ্ট করে, বক্তমধ্যে তাহাকে প্রেরণ করে; সূর্যাভিমুখে প্রতিপ্রেরণ করে; জল পতনকালে বিম্বে বিম্বে শত সূর্য ধারণ করিয়া যুবতীকে উপহার দেয়। যুবতীর হস্তপদসঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলেরও হিল্লোলে যুবতীর হৃদয় নৃত্য করে। দুই সমান। জল চঞ্চল; এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি?

পুষ্করিণীর শ্যাম জলে স্বর্ণরৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে সব শ্যাম হইল—কেবল তালগাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।” (চন্দ্রশেখর—১/২)

(৮) “জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুই পার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে; সিকতা-শ্রেণী অধিকতর ধবলশ্রী ধরিয়াছে; গঙ্গার জল, চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজী ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতি জ্ঞানে কখন কখন মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত; যতদূর দেখিতেছি, নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে। নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত; উপরে আকাশ অনন্ত; তন্মধ্যে তারকামালা অনন্তসংখ্যক। এমন সময়ে কোন্ মনুষ্য আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূলে যে বালুকাভূমে তরণীর শ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকাকণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?”

(চন্দ্রশেখর—৩/৪)।

(৯) “দুই জনে সাঁতরিয়া, অনেক দূরে গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাগরে সাঁতার! এই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া, ক্ষুদ্রবীচিমালিনী,

নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকরসাগর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই ঊর্ধ্বস্থ অনন্ত নীলসাগরের দৃষ্টি পড়িল! তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্য-অদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার? জন্মিয়া অবধি এই দুরন্ত কাল-সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি, তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি? শৈবলিনী ভাবিল, এ জলের তল আছে,—আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি।

তুমি গ্রাহ্য কর না কর, তাই বলিয়া ত জড় প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য্য ত লুকাইয়া রয় না। তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দেও না কেন, জল-নীলিমার মাধুর্য বিকৃত হয় না—ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়ে না—তারা তেমনি জলে—তীরে বৃক্ষ তেমনি দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনি খেলে। জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম্য! স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, সকল সময়েই আদর করিতে চায়।

এ সকল কেবল প্রতাপের চক্ষে। শৈবলিনীর চক্ষে নহে। শৈবলিনী নৌকার উপর যে রুগ্ন শীর্ণ, শ্বেত মুখমণ্ডল দেখিয়াছিল, তাহার মনে কেবল তাহাই জাগিতেছিল। শৈবলিনী কলের পুত্তলির ন্যায় সাঁতার দিতেছিল। কিন্তু শ্রান্তি নাই। উভয়ে সন্তরণ-পটু। সন্তরণে প্রতাপের আনন্দ সাগর উছলিয়া উঠিতেছিল।" (চন্দ্রশেখর—৩/৬)

(১০) "এই এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম—মরিব! গঙ্গার তরঙ্গরব কাণে বাজিতে লাগিল—বুঝি মরা হইল না—আমি মিষ্ট শব্দ বড় ভালবাসি! না, মরিব। চিবুক ডুবিল! অধর ডুবিল! আর একটু মাত্র। নাসিকা ডুবিল! চক্ষু ডুবিল! আমি ডুবিলাম!

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।

আমি সেই প্রভাতবায়ুতাড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।"

(রজনী ১/৮)

(১১) "বারুণী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম—আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ—নীল কাচের আয়না মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের

পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারিপাশে বাবুদের বাগান—উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল—লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলা এক একখানা বড় বড় হীরার মত অস্তগামী সূর্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপর আকাশ—সেও সেই বাগান ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিলটা ডাকিতেছিল। এ সকল একরকম বুঝান যায়, কিন্তু সেই আকাশ, আর সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোহিণীর মনের কি সম্বন্ধ, সেটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে, এই বারুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।" (কৃষ্ণকান্তের উইল ১/৭)

(১২) "বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে, আঁধারে, সে বিশালজলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ, আবর্তের ঘোর গর্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জন; সর্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।" (দেবী চৌধুরাণী ২/৩)

(১৩) "এই ত বৈতরণী! পার হইলে না কি সকল জ্বালা জুড়ায়! আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"

খরবাহিনী বৈতরণী-সৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল। পশ্চাৎ অতি দূরে নীলমেঘের মত নীলগিরির শিখরপুঞ্জ দেখা যাইতেছিল; সম্মুখে নীলসলিলবাহিনী বক্রগামিনী তটিনী রজতপ্রস্তরবৎ বিস্তৃত সৈকতমধ্যে

বাহিতা হইতেছিল ; পারে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত সোপানাবলীর উপর সপ্ত মাতৃকার মণ্ডপ শোভা পাইতেছিল ; তন্মধ্যে আসীনা সপ্ত মাতৃকার প্রস্তরময়ী মূর্তিও কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল ; রাজ্ঞীশোভাসমন্বিতা ইন্দ্রাণী, মধুর রূপিণী বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রাহ্মণী, সাক্ষাৎ বীভৎসরসরূপধারিণী যমপ্রসূতি ছায়া, নানালঙ্কার-ভূষিতা বিপুলোরুকরচরণোরসী কম্বুকণ্ঠান্দোলিতরত্নহারা লম্বোদরা চীনাম্বরা বরাহবদনা বারাহী, বিশুষ্কাস্থিচর্মমাত্রাবশেষা পলিতকেশা নগ্নবেশা চণ্ডমুণ্ডধারিণী ভীষণা চামুণ্ডা, রাশি রাশি কুসুম চন্দন বিল্বপত্রে প্রপীড়িতা হইয়া বিরাজ করিতেছে। তৎপশ্চাৎ বিষ্ণুমণ্ডপের উচ্চ চূড়া নীলাকাশে চিত্রিত ; তৎপরে নীলপ্রস্তরের উচ্চস্তম্ভোপরি আকাশমার্গে খগপতি গরুড় সমাসীন। অতিদূরে উদয়গিরি ও ললিতগিরির বিশাল নীল কলেবর আকাশপ্রান্তে শয়ান। এই সকলর প্রতি শ্রী চাহিয়া দেখিল ; বলিল, "হায় ! এই ত বৈতরণী ! পার হইলে আমার জ্বালা জুড়াইবে কি ?" (সীতারাম ১/১১)

বঙ্কিমের সচেতন শিল্পীমন নিরন্তর রচনার উৎকর্ষসাধনে ব্রতী ছিল। মনের পরিণতি সংগে সংগে তাঁর রচনারীতিও পরিণত হয়েছে। অল্পবয়সের রঙীন তুলি ক্রমে এনে দিয়েছে প্রৌঢ় ভাস্করের শিল্পষমা।

॥ এগার ॥

উপসংহার

বঙ্কিম-উপন্যাসের উপাদান বিচার প্রসঙ্গে আমরা বিভিন্ন বিষয়-অনুসারে আলোচনা করলাম। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এই উপাদানগুলিই বঙ্কিম-উপন্যাসের একমাত্র সত্য। উপাদানগুলি উপন্যাসের উপকরণ মাত্র। সেই উপকরণের দ্বারা বঙ্কিমের 'অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষমা' প্রতিভার মাধ্যমে যে রসসৃষ্টি হয়েছে, সেটিই আসল সত্য। সেই রসের আস্বাদ বঙ্কিম-আবির্ভাবের অব্যবহিত পর থেকে অদ্যাবধি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে সমালোচনার যে বিভিন্ন সুর অনুরণিত হয়েছে তাতে কেবলমাত্র প্রশংসাই হয়নি, যথেষ্ট নিন্দাও যুক্ত হয়েছে। তাঁকে একদিকে যেমন গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমানবিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ইতিহাসের বিকৃতিকারক ও রক্ষণশীল বলেও অভিহিত করা হয়েছে। আবার তাঁর সম্বন্ধে নীতিবাগীশ ও নীতিবিগর্হিত—উভয়বিধ অভিযোগই করা হয়েছে। আসল কথা বঙ্কিমচন্দ্র আজ পর্যন্ত বিতর্কিত মূল্যায়নের লেখক।

সার্থক লেখকের পাঠকরা যুগে যুগে তাঁর রচনার নবমূল্যায়ণ ক'রে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রও সেই মূল্যায়নের মর্যাদা পাবেন। কারণ তিনি শুধু বাংলাভাষার প্রথম ঔপন্যাসিকই নন, বাংলাভাষার অন্যতম সার্থক ঔপন্যাসিক।

বঙ্কিম-উপন্যাসের উপাদানের খুঁটিনাটি তথ্যের সত্যাসত্য নিয়ে সাধারণ পাঠক বিশেষ মাথা ঘামাবেন না। তাঁরা অবগাহন করবেন রসের সাগরে। তিলোত্তমা-আয়েষা-জগৎসিংহের প্রণয়কাহিনী তাঁদের আনন্দ দেবে। কপালকুণ্ডলার রোমান্সরস যেমন আনন্দ দেবে, তেমনি নবকুমার কপালকুণ্ডলার অকালপ্রয়াণে পাঠকের হৃদয়ে নিরবধি কাল ধরে জাগবে হাহাকার। মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের প্রণয়কাহিনীই মুখ্য হয়ে উঠবে ইতিহাসের আবর্ত ছাড়িয়ে। প্রতাপ-চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর প্রণয়কাহিনী মানুষের চিরন্তন প্রেমসমস্যার প্রতীক হয়ে থাকবে। রজনী-ইন্দিরা-রাধারাণী তিনজন নারী চিরকাল পুরুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে থাকবে। কৃষ্ণকান্তের উইল ও বিষবৃক্ষ গৃহস্থ মানুষকে দেবে সতর্ক ক'রে। রাজসিংহ-সীতারাম-আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীমানসের নবজাগ্রত দেশচেতনার প্রতীক হয়ে থাকবে।

বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন কিভাবে বাস্তব উপাদানকে স্বীকরণ ক'রে সাধারণীকরণ করতে হয়। তাঁর বিরুদ্ধে যেমন অভিযোগ থেকেই যাবে যে তিনি সমসাময়িক দেশ ও কাল, ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করেছেন, তেমনি প্রশংসা-বাণীও উচ্চারিত হবে এই কারণে যে তাঁকে কেবল সমসাময়িক দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যাবে না। বঙ্কিমচন্দ্র শাশ্বত কালের, তাঁর উপন্যাস চিরন্তন রসসৃষ্টির উপাদান।

॥ বার ॥

গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—অক্ষয়-সাহিত্য সম্ভার ১ম খণ্ড।

অজরচন্দ্র সরকার—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য—বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন।

অরবিন্দ পোদ্দার—বঙ্কিম-মানস।

অলোক রায়—প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-সমাজমন।

অশোক কুণ্ডু—বঙ্কিম-অভিধান (উপন্যাস খণ্ড)।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—আধুনিক বাংলাসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য—বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—স্বর্ণলেখা।

এককড়ি দে—শিল্পী বঙ্কিম।

ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার—বাংলাকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব।

কমলা দেবী—ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ।

ক্ষীরোদকুমার দত্ত—বঙ্কিমসাহিত্যের ধারা।

ক্ষেত্র গুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পরীতি—উপন্যাস।

ক্ষেত্র গুপ্ত ও জ্যোৎস্না গুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ।

গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—বঙ্কিমচন্দ্র ৩ খণ্ড।

গোপালচন্দ্র রায়—বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গল্প।

" —বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ।

" —বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র।

" —আলাপ আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র।

ডঃ জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত—A critical Study of the Life and Novels of Bankim Chandra.

জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়—প্রবন্ধলহরী।

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা।

তারকনাথ বিশ্বাস—তারকনাথ গ্রন্থাবলী ৩য় খণ্ড।

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন—বঙ্কিমদর্শনের দিগদর্শন।

দীপক দে—বঙ্কিম-মূল্যায়ণ।

দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বঙ্কিমচন্দ্র।

নবীনচন্দ্র সেন—আমার জীবন ৫ খণ্ড।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী—২ খণ্ড।

পূর্ণচন্দ্র বসু—কাব্যসুন্দরী।

প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত—উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র।

প্রমথনাথ বিশী—বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা।

„ —বঙ্কিম-সরণী।

„ —বাংলাসাহিত্যে নরনারী।

প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়—বঙ্কিম-সাহিত্য সমাজ ও সাধনা।

প্রিয়রঞ্জন সেন—Western Influence in Bengali Literature।

প্রেমেন্দ্র মিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র জীবন ও সাহিত্য।

বঙ্কিম-পরিচয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।

বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা—ওরিয়েণ্ট বুক কোং প্রকাশিত।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—মুক্তিপাগল বঙ্কিমচন্দ্র।

বিপিনবিহারী গুপ্ত—পুরাতন প্রসঙ্গ ১ম ও ২য়।

বিপিনচন্দ্র পাল—চরিতচিত্র।

„ —নবযুগের বাংলা।

বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত—বঙ্কিম-প্রতিভা।

বিমলচন্দ্র সিংহ—বঙ্কিম-কণিকা।

বিমানবিহারী মজুমদার—History of Political Thought from Rammohun to Dayananda.

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত—সাহিত্যসাধক চরিতমালা ২২।

বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য—বঙ্কিমবাণী।

ভবতোষ দত্ত—চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র।

ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কপালকুণ্ডলা চরিত্র সমালোচনা।

„ —দুর্গেশনন্দিনী চরিত্র সমালোচনা।

মণীন্দ্রমোহন বসু—কৃষ্ণকান্তের উইল (চরিত্রালোচনা)।

মতিলাল দাস—Bankim Chandra : Prophet of the Indian Ranaissance, His life and Art.।

মনোরঞ্জন জানা—বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারী।

মণি বাগচী—বঙ্কিমচন্দ্র।

মাখনলাল রায়চৌধুরী—কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা।

মুকুট রায়—লিপিকৌশল বৈশিষ্ট্য।

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়—আমার দেখা লোক।

মোহিতলাল মজুমদার—বঙ্কিমবরণ।

—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস।

মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীশচন্দ্র দাস সম্পাদিত—বঙ্কিমস্মৃতি।

মৌলভী একরামউদ্দিন—'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বঙ্কিমচন্দ্র।

যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী—বঙ্কিমসাহিত্য-পরিচিতি।

যদুনাথ সরকার—বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ।

যোগেশচন্দ্র বসু—বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন (কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনাক্ষেত্রে)।

" —মেদিনীপুরের ইতিহাস।

রাধারমণ চক্রবর্তী ও সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়—চন্দ্রশেখর-তত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্ররচনাবলী ১, ৩, ৯, ১০, ১১, ১৭, ১৮।

রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী—বঙ্কিমচিত্র।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—চরিতকথা।

রেজাউল করিম—বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—কাব্যসুধা।

" —সখী।

" —'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর আলোচনা।

" কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব।

লালমোহন বিদ্যানিধি—সম্বন্ধনির্ণয়।

শঙ্করপ্রসাদ নস্কর—বঙ্কিম বিচার।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম জীবনী।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

শ্রীশিবানন্দ—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস (সমালোচনা)।

শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

সীতা ব্যানার্জি—The Bankim Controversy।

ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস।

ডঃ সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব (বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণচরিত্রের" প্রতিবাদ)।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত—বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

সোমেন্দ্রনাথ বসু—কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র।

সুনীলকুমার ব্যানার্জি—Bankimchandra (A study of His craft).

হরপ্রসাদ মিত্র—বঙ্কিমসাহিত্য পাঠ।

হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্র।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র।

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মানবপ্রকৃতি (স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ অবলম্বনে রচিত)।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—বঙ্কিমচন্দ্র।